শিক্ষণ সঞ্চিতা

প্রথম খণ্ড

শ্রীজগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
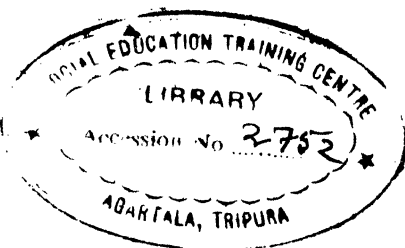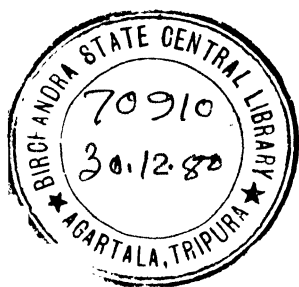
শিক্ষা অধিকার
ত্রিপুরা

সাল	বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা
১৯৫৪-৫৫	৭	৮৭৫	৪৩
১৯৫৫-৫৬	৪৪	৮৪৭৬	২৩৩
১৯৫৬-৫৭	৭৯	১২৬১০	৫২৮
১৯৫৭-৫৮	১২৯	১৯৬২২	৭৭৭

ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে ১০৪১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। স্থির করা হয়েছে যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বছরের মধ্যে ১০৪১টি বিদ্যালয়ের কমপক্ষে এক-চতুর্থাংশ বিদ্যালয়কে নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হবে। এই কাজ এখন চলছেও। এই সাংগঠনিক বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্যা আজ সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করা প্রয়োজন তা হচ্ছে এই শিক্ষাব্যবস্থার উপযুক্ত মানদণ্ড প্রতিষ্ঠার কথা। নির্ভুল শিক্ষানীতি, সুদৃঢ় সংগঠন এবং বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতি—এই ত্রিবিধ তাত্ত্বিক গুরুত্বের উপরেও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে আমাদের শিক্ষকবৃন্দের—যাঁদের একনিষ্ঠ দৈনন্দিন কর্ম্মপ্রচেষ্টার উপরই এই নূতন শিক্ষার ভাবাদর্শ সার্থক রূপায়ণের জন্য প্রধানতঃ নির্ভর করছে।

বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে কতগুলো মৌলিক চিন্তাধারা রয়েছে এবং মামুলী প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে এর পার্থক্যও আছে। এ বিষয়ে এখানে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রাথমিক স্তরে যে শিক্ষার সঙ্গে আমরা সাধারণতঃ পরিচিত তাতে এতদিন পর্য্যন্ত শিক্ষকের কাজ তেমন কঠিন ছিল না। স্কুলে গুরুমশায় ছিলেন, পাঠ্যতালিকা ছিল, পুস্তক ছিল, পরীক্ষা ছিল—শাসন, শাস্তি-শৃঙ্খলা, পড়া দেওয়া-নেওয়া, পাশ-ফেল সবই ছিল। ছিল না শুধু যাঁদের জন্য এই বিবিধ আয়োজন-সম্ভার, সেই শিশুর কোন প্রাধান্য—তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা, তার কল্পনাবিলাসী বিচিত্র খেয়ালী মনের পরিচয় জানার সংবেদনশীল প্রচেষ্টা অথবা তার সহজাত কর্ম্মপ্রবণতাকে শিক্ষাপ্রচেষ্টার পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করা। অবশ্য একথা আমরা অস্বীকার করব না যে উৎকৃষ্ট আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুশিক্ষার সর্ব্বাধুনিক ভাবাদর্শ সার্থক

রূপ পেত এবং সেদিক থেকে আদর্শ প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার কেবলমাত্র লেখাপড়ার দিক থেকে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু তেমন আদর্শ বিদ্যালয়ের সংখ্যা আমাদের দেশে খুব সামান্যই ছিল। শিশু-সম্প্রদায়ের বিরাট অংশকে এমন পরিবেশে লেখাপড়া করতে হত যাকে শিশুশিক্ষার পক্ষে মোটেই অনুকূল বলা চলে না। পরাধীন দেশের শত অভিশাপের মধ্যে শিশুশিক্ষার এই যে বিরাট অসম্পূর্ণতা একেও আমরা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম, কারণ পরীক্ষা-তরণী উত্তীর্ণ হওয়াই ছিল আমাদের শিক্ষা-সাধনার শেষ কথা এবং বৈষয়িক মোক্ষলাভের একমাত্র সাধনপথ। এর ফলে একদিকে যেমন আমাদের ব্যক্তিগত বিকাশ-লাভের পথ রুদ্ধ হয়েছে, অন্যদিকে তেমনই সামাজিক জীবনে এসেছে ক্রমাবনতি এবং হতাশ্বাস। বি. এসসি, এম. এসসি পাশ করে সওদাগরী অফিসে কেরাণীর চাকুরী করেন—সাহিত্যে উচ্চ ডিগ্রী নিয়ে কারখানায় লেবার অফিসারের পদ শোভিত করেন এমন লোকের সংখ্যা আমাদের দেশে কম নয়। যোগ্যতার এই মর্ম্মান্তিক অপচয়ের ফলে জাতীয় জীবনে সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির যে ক্ষতিসাধন হয়েছে তার হিসাব কে রাখে? এই ক্ষতিব চেয়ে আরও বড় ক্ষতি হত শিশুদের। তাদের মনে বিদ্যালয় সম্বন্ধে আসত অনাদর, বই সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা, আর শিক্ষক সম্বন্ধে ভীতি। শিশুর সহজাত কর্ম্মপ্রবণতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের প্রতি অনুসন্ধিৎসা, খেলা, আনন্দ, প্রকৃতির প্রতি বিপুল আকর্ষণ—সদাচঞ্চল অফুরন্ত কর্ম্মমুখরতা—শিশুচরিত্রের এই যে সব প্রধান বৈশিষ্ট্য—এগুলো যাতে অনুকূল পরিবেশের মধ্যে চরিতার্থতা লাভ করতে পারে, দেশব্যাপী এমন কোন শিক্ষা-পরিকল্পনা এযাবৎ আমরা প্রাথমিক স্তরের জন্য করি নি। কাজেই অনেক বিষয়ে শিশুদের আগ্রহ থাকলেও লেখাপড়ায় তাদের কোন মন নেই—স্কুলটা ছুটি থাকলেই তাদের মজা—ক্লাশের পড়ার কথায় তাদের গায়ে জ্বর আসে, মাথা চুলকায়, ঘুম আসে—এই ধরণের সার্ব্বজনীন নালিশই অভিভাবকের কাছ থেকে সাধারণতঃ আমরা শুনে থাকি। অথচ একথাও ঠিক যে লেখাপড়া তাদের করতে হবে, ভালভাবে করতে হবে এবং আনন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত ঐকান্তিকতার সঙ্গে করতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষা এই আনন্দময় স্বতঃস্ফূর্ত্ত শিশুশিক্ষার বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের নামান্তর মাত্র। আর প্রাথমিক স্তরে—

এবং প্রাথমিক স্তরই শিক্ষাসৌধের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠাভূমি—সর্ব্বতোমুখী শিশুশিক্ষার বিজ্ঞানসম্মত প্রচেষ্টা আমাদের দেশে এই প্রথম।

বুনিয়াদী শিক্ষায় শিল্প একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। ব্যক্তিগত এবং সামাজিক দিক থেকে উপযোগী একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছাড়াও সৃজনাত্মক কর্ম্ম, খেলা, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত ইত্যাদির স্থানও পাঠ্যতালিকায় আছে। এসব বিভিন্ন কর্ম্ম-সংগঠনের ফলে শিশুদের যাতে লেখাপড়ায় কোন ক্ষতি না হয়—মাতৃভাষা, গণিত, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সামাজিক ও নাগরিক শিক্ষণীয় বিষয়েও যাতে তারা উপযুক্ত শিক্ষা পায়—এককথায় বিদ্যালয় যাতে সত্যি সত্যিই শিশুদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশলাভের উপযুক্ত অনুশীলনকেন্দ্র হয়—তার জন্য শিক্ষকদের যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয় একটি কারখানা—শিশুরা সব শ্রমিক এবং উৎপাদনই প্রধান লক্ষ্য—এমন মনে করার চেয়ে মারাত্মক ভুল আর নেই। বিদ্যালয়ে কাজ এবং লেখাপড়া দুটোই থাকবে এবং সমস্যামূলক কাজের সমাধানপথে সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে শিশুর সামনে শিক্ষণীয় বিষয়ের মনোবিজ্ঞানসম্মত উপস্থাপন হবে—বুনিয়াদী শিক্ষার এই যে মূল কথা—এই যে সাঙ্গীকৃত পদ্ধতি—এর সাফল্যও নির্ভর করছে কর্ম্মরত শিক্ষকদের উদ্ভাবনীশক্তি এবং সুষ্ঠু পাঠপরিকল্পনার উপর। শিক্ষকগণ যদি বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই সমবায় পদ্ধতি শ্রেণীকক্ষে অনুসরণ করতে না পারেন, তা হলে বিদ্যালয় জ্ঞান এবং কর্ম্মের সার্থক সংযোগস্থল হবে না। এতে শিক্ষার কাজ ব্যাহত হবে।

কাজেই শিক্ষানীতি, সংগঠন, শিক্ষাপদ্ধতি—যে-কোন দিক থেকেই আমরা বিচার করি না কেন, বুনিয়াদী শিক্ষকের দায়িত্ব যে গতানুগতিক প্রাথমিক শিক্ষকের তুলনায় অনেক বেশী, একথা সহজেই বোঝা যায়। ১৯৫৩ সালে ত্রিপুরায় নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহের জন্য একটি পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পাঠ্যতালিকা কেবলমাত্র বুনিয়াদী বিদ্যালয়েই প্রবর্ত্তিত করা হয় নি, সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়েও এই পাঠ্যতালিকা অনুসরণ করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বুনিয়াদী শিক্ষার উপযুক্ত আবহাওয়া তৈরী করা, কারণ শেষ পর্য্যন্ত

একদিন সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ই নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবে এবং বুনিয়াদী শিক্ষা সামগ্রিকভাবে রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচলিত হবে।

বুনিয়াদী শিক্ষার এই ব্যাপক বিস্তৃতিলাভের ফলে আমরা শিক্ষক-শিক্ষণ সমস্যার মুখোমুখি এসে যাচ্ছি। ত্রিপুরায় নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পড়বার উপযুক্ত ৬ থেকে ১১ বছরের সমস্ত শিশুদের জন্য প্রায় ৪০০০ শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। শিক্ষক-শিক্ষণের কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রত্যেক বছরই গ্রীষ্মাবকাশে স্বল্পক্রম বুনিয়াদী শিক্ষণকেন্দ্রে শিক্ষণ-কাজ চলছে। এ ছাড়াও গত কয়েক বছরে কয়েকটি শিক্ষা অধিবেশন এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের আলোচনাচক্রও অনুষ্ঠিত হয়েছে। যদিও বহুসংখ্যক শিক্ষক এখনও শিক্ষণের সুযোগ লাভ করেন নি, তবুও এইসব শিক্ষণ-কাজ, অধিবেশন ও আলোচনাচক্র সংগঠনের ফলে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষার একটা সর্ব্বাত্মক প্রভাব স্বভাবতঃই পড়েছে এবং বুনিয়াদী শিক্ষার সফল প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক প্রস্তুতি মোটামুটি শেষ হয়েছে—একথা বলা যায়।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বুনিয়াদী শিক্ষানীতি এবং পদ্ধতি খুবই নূতন। কাজেই ত্রিপুরার গ্রামে গ্রামান্তরে যেসব শিক্ষককর্ম্মী কাজ করছেন, তাঁদের অনেকেই এখনও ট্রেনিং পান নি; অথচ এই শিক্ষানীতির গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। পুস্তক-পত্রিকার অভাবের জন্য অনেক সময়েই শিক্ষককর্ম্মিদের অসুবিধায় পড়তে হয়। প্রয়োজনমত তাঁরা অনেক সময় অনেক বিষয়ে তথ্যসন্ধান করতে পারেন না—এমন কি প্রামাণ্য তথ্যের অভাবে কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও তাঁদের পক্ষে অনেক সময় কষ্টকর হয়। শিক্ষকদের যে নিত্যপ্রয়োজনীয় কতগুলো পুস্তক-পত্রিকার প্রয়োজন—একথা আমরা অনেকদিন থেকেই অনুভব করে আসছি।

এই অভাব দূরীকরণের জন্য এই শিক্ষণ সঞ্চিতা প্রকাশের কাজ সুরু হল। যেসব হাজার হাজার শিক্ষককর্ম্মী এখনও শিক্ষণলাভের সুযোগ পান নি এই পুস্তক বিশেষভাবে তাঁদের কাজেই সাহায্য করবে—এই আশা আমরা পোষণ করি। গত কয়েক বছরে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য আমরা একাধিক আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছি। এইসব বিভিন্ন আলোচনা-চক্রে প্রায় ৫০০ শিক্ষক যোগদান করেছেন। এই আলোচনাচক্র এখন থেকে প্রত্যেক বছরই নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে। দৈনন্দিন কাজের সময় তাঁরা

যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, নূতন শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের যেসব প্রশ্ন মনে এসেছে, দীর্ঘদিন শিশুশিক্ষার কাজে ব্যাপৃত থেকে শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে যেসব সাধারণ সত্য তাঁদের সামনে প্রতিভাত হয়েছে—এসবের আলোকেই আলোচনাচক্রের কাজ পরিচালিত হযেছে। এইসব আলোচনায যেসব প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হযেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই শিক্ষণ সঙ্কিতা রচিত হল। বর্ত্তমানে এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। এইসব আলোচিত বিষয়ের বাইবেও কযেকটি প্রবন্ধ দেওয়া হল। গত বছর 'বুনিয়াদী শিক্ষা' শীর্ষক একটি পুস্তিকা শিক্ষা অধিকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হযেছিল। সেই প্রবন্ধটিও আংশিক পবিবর্দ্ধিত আকাবে এখানে সংযোজিত হল। এই আশা নিয়ে এগুলো দেওযা হল যে এতে বুনিযাদী শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষকদের একটি পরিপূর্ণ ধারণালাভে সাহায্য কবা হবে। শিক্ষণ সঙ্কিতাব অন্যান্য খণ্ডগুলো যথাসমযে প্রকাশিত হবে।

কাজের সামগ্রিক সফলতার জন্য আমবা কযেকটি গুণাবলীব উপব বিশেষ গুরুত্ব আবোপ করতে চাই এবং আমবা চাই আমাদেব শিক্ষক-সমাজে এইসব গুণাবলী ও মনোবৃত্তি স্থাযীভাবে বিকশিত হোক। এই সব গুণাবলী হচ্ছে একটি সঙ্ঘবদ্ধ অনুপ্রাণিত মনোবৃত্তি, আদর্শ-নিষ্ঠা ও আরব্ধ কর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিক আত্মনিবেদন। বর্ত্তমান সমযে দেশের বুকে যে গঠনমূলক কাজের ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা চলছে, তাতে বুনিযাদী শিক্ষা কেন—কোন ক্ষেত্রেই আমরা সাফল্য অর্জ্জন করতে পারব না—যদি কাজের সর্ব্বস্তরে একটি অখণ্ড বিশ্বাস ও আদর্শবাদ সর্ব্বপ্রকাব কর্ম্মীকে উদ্বুদ্ধ করে না তোলে। কেবলমাত্র অফিসিযাল ঢং বজায় রেখে কাজ করলে লাল ফিতার জীবন দীর্ঘতর হতে পারে, কিন্তু তাতে আমরা বিভিন্ন স্তবের কর্ম্মিদেব মধ্যে প্রেবণার সঞ্চার করতে পারব না। আর তাই যদি হয, তা হলে গণতন্ত্রেব কথা বলা অর্থহীন হবে। কাজেই আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষকসমাজের সর্ব্বস্তরে এক সঙ্ঘবদ্ধ প্রেরণার সৃষ্টি করা যা আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে রয়েছে একটি বিজ্ঞানসম্মত গতিশীল শিশুশিক্ষাব আদর্শ। বুনিয়াদী শিক্ষা কোন শাশ্বত বেদবাক্য নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আত্মসমালোচনা, প্রত্যক্ষ কাজের ফলাফল সব-কিছু অনুধাবন কবে এই

শিক্ষানীতিকে কালক্রমে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে হবে। প্রত্যেক বুনিয়াদী শিক্ষাকর্ম্মীর এই পরীক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। যে কথা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে তা হচ্ছে এই যে শিশুর বিকাশই আমাদের লক্ষ্য—তার ভাবী জীবনের জন্য প্রস্তুতি, এবং তার ফলে জাতির অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধিসাধন—এই হচ্ছে আমাদের সামনে বড় কথা। সন্ধানী মনোবৃত্তি এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ নিয়ে কাজ করে নূতন শিক্ষার বুনিয়াদ সফলভাবে প্রতিষ্ঠা করাই আজ আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীজগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ সহকারে এই শিক্ষণ সঞ্চিতা প্রণয়নের কাজ আরম্ভ করেছেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করার জন্য তাঁকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। যদি আমাদের শিক্ষকবৃন্দ এই পুস্তক প্রণয়নের ফলে উপকৃত হন, তা হলে তাঁর পরিশ্রম পুরস্কৃত হবে। যে কথাটি আমি বিশেষভাবে বলতে চাই তা হচ্ছে এই যে—যে-কোন ক্ষেত্র থেকেই আসুক না কেন, এই পুস্তকের সংশোধন ও পূর্ণতাসাধনের জন্য সর্ব্বপ্রকার মতামত সাদরে গৃহীত হবে এবং এই মতামত প্রেরণের জন্য আমরা পাঠকবর্গকে আহ্বান জানাচ্ছি।

আগরতলা
২৫ ডিসেম্বর, ১৯৫৮

গোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
শিক্ষা অধিকর্ত্তা, ত্রিপুরা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বুনিয়াদী শিক্ষার ইতিহাস

ভাবসংগঠন ও প্রস্তুতিপর্ব্ব—১৯০৪-৩৭

কোন ঐতিহাসিক ঘটনাই দৈববাণীর মত আকাশ থেকে জন্ম নেয় না। তার পেছনে থাকে অতীতের অনুসন্ধান, বর্ত্তমানের আত্ম-জিজ্ঞাসা আর ঐতিহাসিক ধারাপ্রবাহের অমোঘ যোগসূত্র—যাদের সম্মিলিত প্রভাবেব ফলে এক একটি ঘটনা জন্ম নেয়। বুনিয়াদী শিক্ষাও তাই। ইংরেজ আমলে শিক্ষার দিক থেকে আমাদের দেশ ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রয়োজন হয়েছিল শিক্ষার ব্যাপক সংস্কার সাধন করা এবং একটি খাঁটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা। অনেক দিক থেকে আজ শিক্ষার সংস্কার সাধন করা হচ্ছে। বুনিয়াদী শিক্ষা হচ্ছে এই সুসংস্কৃত জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক স্তবের ভিত্তিভূমি।

বুনিয়াদী শিক্ষাব ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করার আগে ইংরেজ আমলের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা বোধ হয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না, কারণ ঐ শেষোক্ত শিক্ষাধারার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসাবেই শেষ পর্য্যন্ত বুনিয়াদী শিক্ষাকে জন্ম নিতে হয়।

বৃটিশ-প্রবর্ত্তিত শিক্ষার কুফল ও জাতীয় শিক্ষার দাবী

১৯৩৭ সালে সর্ব্বপ্রথম গান্ধীজী হরিজন পত্রিকায় বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মতামত জনসমক্ষে প্রচার করেন। তখন বৃটিশ আমল। দেশ পরাধীন। পরাধীন দেশে ব্যাপক শিক্ষাপ্রসারের বাধাবিপত্তি অনেক এবং পরাধীনতার সঙ্গে অজ্ঞানতা, অশিক্ষা আর কুসংস্কারের

কার্য্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে। কোন শাসকশক্তিই তার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারের কোন আন্তরিক চেষ্টা করে না। কারণ শিক্ষাবিস্তার রাজনৈতিক চেতনাকে প্রবুদ্ধ করে এবং প্রতিরোধ সংগ্রামকে তীব্রতর করে তুলে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি দুর্ব্বল করে দেয়। বিশেষ করে আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের পর সেখানকার বিশাল উপনিবেশ হারিয়ে বৃটিশ শাসকসম্প্রদায় এই কথাটি ভাল করে বুঝেছিল। দেখতে পাওয়া যায় ১৭৯৩ সালে তদানীন্তন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন পরিচালক ভারতবর্ষে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে বৃটিশ পার্লামেণ্টে বক্তৃতা দেবার সময় এই কথা বলেছিল, যে সমস্ত ভুলের জন্য তাদের আমেরিকা হারাতে হয়েছে তার মধ্যে মারাত্মক ভুল হয়েছে আমেরিকায় শিক্ষাপ্রসারের চেষ্টা করা। এই লেখাপড়া শিখেই আমেরিকানদেব মাথা পেকেছে—জাগ্রত হয়েছে রাজনৈতিক চেতনা এবং স্বদেশপ্রেম—তারা শিখেছে সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামের কৌশল—যার ফলে শেষ পর্য্যন্ত তাদের আমেরিকা হারাতে হয়। এই ভদ্রলোক সাবধান করে দিয়েছিল যে এই ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন ভারতবর্ষে না করা হয়। ইংরেজ সে ভুল ভারতবর্ষে করে নি। তাই বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদেও আমরা দেখতাম যে বিলাতে যখন শতকরা ১০০ জন লোক শিক্ষিত, তখন আমাদের দেশে মাত্র ১০ জন শিক্ষিত। শুধু তাই নয়—যে কোন দিকেই আমরা তাকাই না কেন—কৃষি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, শিল্পনির্ম্মাণ—সর্ব্বত্রই ভারতের শোচনীয় অনগ্রসরতা প্রকট হয়ে চোখে পড়ে। তাই আজ আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা "ব্যাভেরিয়ার তৈরী" পেনসিল দিয়ে লেখাপড়া করে—জন্মদিনের উপহার হিসাবে আমরা মার্কিণী কলম "পার্কার-সেফ্যার্স" কিনে থাকি—অন্ধকার রাত্রে বিদেশী টর্চ্চলাইট আমাদের আলো দেয়। আমাদের দেশের চিত্র-শিল্পীরা বিলাতী রং-তুলি দিয়ে ছবি আঁকে—ডাক্তাররা হরদম বিদেশী

অনুদার শিক্ষানীতি

ওষুধের বিধান দেয়। আজ যখন বিদেশী মুদ্রার মহার্ঘ্যতার কথা শোনা যাচ্ছে, তখন শুধুমাত্র আমাদের শিল্পনির্মাণের কাজই পেছিয়ে যাবে না—কৃষি, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বিদ্যার্থিদেরও আতঙ্ক হচ্ছে—বোধ হয় অপরিহার্য্য সব বইয়ের অভাবে আর লেখাপড়া করা যাবে না। এই রকম অনেক দৃষ্টান্ত জাতীয় জীবনের যে কোন দিকে চাইলেই চোখে পড়ে।

এই স্বাভাবিক। শিক্ষার অগ্নিশিখায় শোষণের নাগপাশ বেঁচে থাকতে পারে না। কাজেই ইংরেজ আমাদের দেশে শিক্ষার আলোক জ্বালাতে চায় নি—চেয়েছিল মুষ্টিমেয় একদল বাবুর জাত তৈরী করতে, যারা তাদের শাসনব্যবস্থাকে ধারণ করে রাখতে পারবে। তারা পরিষ্কার বলেছিল—

"........the Hindus had as good a system of faith and of morals as most people and that it would be madness to attempt their conversion or to give them *any more learning or any other description of learning than what they already possessed.*"

এই যে অনুদার শিক্ষানীতি এর মধ্যেও কোন লক্ষ্য অথবা পরিকল্পনা ছিল না। নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য শাসকবর্গ বিভিন্ন সময়ে অবস্থা অনুযায়ী এক-একরকম শিক্ষানীতি গ্রহণ করতেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস মনে করতেন ইংরেজ দখলের ফলে দেশীয় সমাজের যে শ্রেণীগুলো সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রভুত্ব হারিয়েছে তাদের স্বার্থের দিকে একটু কৃপাদৃষ্টি দিলেই বিজেতা এবং বিজিত দুয়েরই কল্যাণ হবে। ১৮১৩ সালের সনদের মূল কথা হচ্ছে এতদ্দেশীয় শিক্ষাদীক্ষার ও ভাবসাধনার কিঞ্চিৎ উন্নতি বিধান এবং "সাক্ষর নেটিভদের" শিক্ষীকর্ম্মে উৎসাহ দান। আবার ১৮৫৪ সালে উডের ডেস্‌প্যাচে দেখতে পাওয়া যায় যে "ইউরোপের কলা,

বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং দর্শনের শ্রেষ্ঠতর আলোকশিখা বিকিরণ করাই” শাসকবর্গের উদ্দেশ্য ছিল। লর্ড কার্জ্জন আবার মনে করতেন যে “ভারতীয় বুদ্ধিমত্তার অন্তর্নিহিত অনগ্রসরতা দূর করাই” (to remove the inherent defects of the Indian intellect) শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর প্রধান কর্ত্তব্য। আরও এগিয়ে ১৯১৩ সালে দেখতে পাওয়া যায় যে ভারতীয়দের “চরিত্রগঠনকেই” শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা হয়েছে। এই সব অসংলগ্ন এবং বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে জাতির উন্নতিকল্পে কোন বলিষ্ঠ শিক্ষানীতি গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা বিদেশী কর্তৃপক্ষ কোনদিন বোধ করে নি। যার যেমন খুসী লেখাপড়া করলেই হল—প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের প্রশ্ন অবান্তর। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত আগ্রহ, সামর্থ্য ও প্রবণতার ভিত্তিতে তাকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার কথা কে বিবেচনা করত? গরজ কার? পাঁচ-সাত বছরের জন্য এক-একজন গভর্ণর জেনারেল আসতেন দেশ শাসন করতে। তাঁর যেমন খেয়ালখুসী দেশের শিক্ষাব্যবস্থাও হত সেই রকম। প্রাদেশিক এক-একজন বৃটিশ শিক্ষা অধিকর্ত্তার সামনে জনমতামতের কোন মূল্য নেই। অধিকাংশই চাইতেন নিজ নিজ আমলে চমকপ্রদ কোন কিছু করে যোগ্যতার দ্রুত পরিচয় দিতে। ভারতের মত বিরাট দেশে সফলভাবে শিক্ষাসৌধ নির্ম্মাণ করতে হলে যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে চিন্তা করার অবকাশ কোথায়? লর্ড কার্জ্জন বলতেন—ভারতের অতীত গভীর রহস্যাবৃত। ভবিষ্যৎ ততোধিক তমসাবৃত; এই দুয়ের মধ্যে যে সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র বর্ত্তমান তার মধ্যে শিক্ষার কাজ চালাতে পারলেই যথেষ্ট। এই সব দায়িত্বহীন শিক্ষানীতির ফলে আমাদের দেশে যোগ্যতার যে অপচয় হয়েছে তার হিসাব কে করে? যে শিশুর সাঙ্গীতিক যোগ্যতা উল্লেখযোগ্য সে হয়তো গান শিখবার সুযোগই

পরিকল্পনাহীন শিক্ষাব্যবস্থা

পেল না। ছবি আঁকবার ঝোঁক যার বেশী সে হয়তো জীবনে রং-তুলি দেখলেই না। কারিগরী যন্ত্রপাতিতে যারা হয়তো প্রশংসনীয় দক্ষতা দেখাতে পারত তারা হয়তো জীবনভোর কেবল ফাইলের পাহাড়ই ঘেঁটে গেল। দেশে ডাক্তার নেই, কৃষিবিদ নেই, বাস্তুকার নেই—আমাদের ভিলাই-দুর্গাপুরের জন্য সাগরপার থেকে কারিগর আসে। এর কারণ কি? দেশে ছিল কি? স্কুল-কলেজের দরজায় ভর্ত্তির জন্য বন্যাপ্রবাহের মত ছাত্র-অভিযান চলত বছরের পর বছর। সেখানেও বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ নেই—যোগ্যতার মানদণ্ডও নেই—মুড়িমিছরির একদর। ফলে এক-একটি পরীক্ষায় হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর অকৃতকার্য্যতা। এই জাতীয় বিপর্য্যয় যে আজও সঙ্ঘটিত হচ্ছে তা যে কোন পরীক্ষার ফলাফলের দিকে চাইলেই বোঝা যায়। কিন্তু উপায় নেই, কারণ সাধারণ শিক্ষার ঐ একটি পথই খোলা আছে। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব প্রয়োজন—সেই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার পরিকল্পনা প্রথম থেকে করা হলে কি আর এই অপচয় হতে পারত?

শিক্ষাক্ষেত্রে অবনতির জন্য ইংরেজের নীতি আর এক দিক থেকেও দায়ী। শিক্ষা বিভাগে কাজ করার জন্য সুযোগ্য এবং ভাল লোক এদেশে খুব কমই এসেছে। অনেক বিখ্যাত বৃটিশ রণপণ্ডিত এদেশে এসে সামরিক বিভাগের গৌরব বাড়িয়েছেন। বিচার বিভাগেও অনেক বিখ্যাত আইনজীবীর নাম পাওয়া যায়। আই, সি, এস্‌দের তো কথাই নেই, কারণ তাঁরাই তো শ্বেতাঙ্গ শাসনব্যবস্থার লৌহ-প্রতিষ্ঠাভূমি ছিলেন। বিদেশী ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ারও এদেশে অনেক এসেছে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রের অবস্থা অন্যরূপ। ডাফ্‌, উইলসন, আলেকজাণ্ডার গ্রাণ্ট অথবা পাঞ্জাবের আর্ণল্ডের মত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ইংরেজ শিক্ষাবিদ এদেশে খুব কমই এসেছেন। ১৮৯৬ সালে

ইণ্ডিয়ান এডুকেশনেল সার্ভিস সৃষ্টির পরও অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নি। উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা যে অবহেলিত হবে—এতে আর আশ্চর্য্য কি? তাই গোখ্‌লের মত উদারনৈতিক নেতাও ইংরেজ আমলের শিক্ষাবিভাগকে "যত সব গোঁড়া, সঙ্কীর্ণমনা এবং রক্ষণশীল বিশেষজ্ঞদের" স্বর্গরাজ্য বলে অভিহিত করেছেন।

এই প্রসঙ্গে কেবলমাত্র শিক্ষাবিভাগের কথা বললেই সব কথা বলা হয় না। রাজ্যশাসনের বিশেষ একটা নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে এক-একটা বিভাগের গুরুত্ব বাড়ে অথবা কমে। ইংরেজ আমলের রাজপুরুষদের অন্দরমহলে শিক্ষা বিভাগ কোনদিনই কৌলীন্য মর্য্যাদা পায় নি। শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার, অন্তর্বিভাগীয় সহযোগিতা, সশ্রদ্ধ মনোভাব—এসব দিক থেকে শিক্ষা বিভাগ সব সময়ই হরিজন। একজন ইংরেজ কর্ম্মকর্ত্তার মতামত এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। A. Mayhew ১৯০৯-১০ সালে ছিলেন ভারত সরকারের শিক্ষা-উপদেষ্টা। কর্ম্মজীবনের করুণ অভিজ্ঞতা স্মরণ করে ১৯২১ সালে তিনি তাঁর The Education in India শীর্ষক পুস্তকে আক্ষেপ করে লিখেছিলেন—

"........the experienced secretary, after spending his morning energy on financial and judicial files, generally drafted his educational resolution with the sinking sun, and reminded educationists that their task was the formation of character and the training of productive citizens and that *their methods must be good and effective within the limits prescribed by economy and public opinion.*"

একথা সর্ব্বজনবিদিত যে অর্থ এবং রাজস্ব বিভাগ শিক্ষা বিভাগকে

কোনদিনই সুনজরে দেখত না। বোধ হয় এই কারণেই ১৯৪৪ সালে সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনা পেশ করার সময় সুস্পষ্টভাবে এই কথার নির্দ্দেশ ছিল যে শিক্ষাসংস্কারের জন্য অর্থসংগ্রহ যেভাবে হোক করতেই হবে। দেশের সামনে কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হলে কর্ত্তৃপক্ষ টাকা নেই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে না। এক-একটা যুদ্ধের সময় সমগ্র জাতি অনেক ত্যাগ স্বীকার করে জরুরী অবস্থার বিপুল ব্যয়ভার বহন করে থাকে। সার্জ্জেণ্ট রিপোর্টে এই কথার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল যে দেশের শিক্ষাসমস্যাকে জরুরী অবস্থার মত করে দেখতে হবে এবং সেভাবেই অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। অবশ্য সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনার পর আর বেশী দিন বিদেশী শাসন আমাদের দেশে থাকে নি। কিন্তু অনেক দিনের অবহেলা এবং উপেক্ষার ফলে শিক্ষার বর্ত্তমান দৈন্য-লাঞ্ছিত অবস্থার কারণ খুঁজতে আর অসুবিধা কোথায় ?

বিশেষজ্ঞের অভাব ও উপেক্ষার মনোবৃত্তি

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে এই যে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, ইংরেজী ভাবধারা অনুকরণ করে আমাদের দেশে ময়ূরপুচ্ছ বায়সের মত এমন একদল কুলীন সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল যারা স্বদেশের ঠাকুর ফেলে বিদেশের কুকুর ধরতেও দ্বিধাবোধ করে নি। স্বয়ং লর্ড মেকলের লেখায় এই সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ১৮৩৬ সালে তাঁর পিতাকে একখানা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—"আমাদের ইংরেজী বিদ্যালয়গুলোতে ইংরেজী শিক্ষার কাজ খুব চমৎকারভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।······ইংরেজী শেখার তাগিদ এত বেশী যে সবাইর জন্য এই বন্দোবস্ত করা খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে—এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এমন একজন হিন্দুও নেই যে ইংরেজী শিক্ষা পেয়ে আর সত্যি সত্যি নিজের ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত আছে। অবশ্য কেউ কেউ এখনও উপরে উপরে নিজেদের ধ্যানধারণার গৌরব করে থাকে, কিন্তু আসলে অনেকেই

নিজেদের খাঁটি একেশ্বরবাদী বলে মনে করে, এবং এমন কি অনেকেই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে ফেলেছে।······আমার খুব দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের শিক্ষাপরিকল্পনা যদি ঠিকমত কাজে লাগিয়ে যাওয়া যায়, তা হলে আগামী ত্রিশ বছরের মধ্যে মূর্ত্তিপূজারী বলে বাংলা দেশে আর কিছু থাকবে না। আর এই সাফল্য আমরা লাভ করব ধর্ম্মান্তরকরণের কোন সক্রিয় প্রচেষ্টা না করেই—ব্যক্তিগত ধর্ম্মস্বাধীনতায় বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ না করেই। জ্ঞান এবং ভাবজগতের সহজ স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম্মের ফলেই এই সাফল্য আসবে। কথাটা ভাবতে মন আমার আনন্দে নেচে ওঠে······।" এই মেকলেই অন্যত্র বলেছিলেন—We must at present do our utmost to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern—a class of persons Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect.

মেকলের মনোবাঞ্ছা কোনদিন পূর্ণ হয় নি, কারণ ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে দিকপালসম বিরাট এক একজন যুগস্রষ্টা মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়ে আমাদের সমাজকে এই সাংস্কৃতিক বিপর্য্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। সদ্যোজাগ্রত জাতির সেই অনবদ্য আত্মদর্শনের ইতিহাস এখানে অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু এর পরে শিক্ষাপ্রসঙ্গে ইংরাজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর কি কোন সন্দেহ থাকে? প্রাচ্যের একটি বিশিষ্ট জীবনাদর্শ আছে—বহুকালের স্বভাবসিদ্ধ শিক্ষা ও সাধনার ফলে প্রাচ্যবাসী সেই জীবনাদর্শ পুরুষপরম্পরায় লাভ করে থাকে। ইংরেজী শিক্ষার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের উপকার হলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে এক বিজাতীয় ভাবধারা আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে দেশে এক আদর্শসঙ্ঘাতের সৃষ্টি করেছে।

সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ

সবচেয়ে মারাত্মক আঘাত এসেছে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। ইংরেজী শিক্ষার ফলে সমাজ এবং অর্থনীতি দুদিক থেকেই দেশ আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শিক্ষা এবং সমাজের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান—একটি আর একটিকে প্রভাবান্বিত কবে এবং এগিয়ে নিয়ে যায়। যে কোন আদর্শ সমাজব্যবস্থায় আমরা দেখতে পাব যে জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা এবং সংগঠনও আদর্শভাবে করা হয়ে থাকে। আবার এই আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় জীবনেব বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধন কবে—কাব্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ-সংস্কার, শিল্প ইত্যাদি সব দিক থেকেই জীবন সমৃদ্ধতর হয় এবং ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়। শিক্ষা এবং সমাজের এই পারস্পবিক সহযোগিতা এবং প্রভাবেব ফলে সামগ্রিকভাবে ব্যক্তি এবং সমাজজীবনে শ্রেষ্ঠতর বিকাশলাভের সুযোগ আসে। কিন্তু ইংবেজ আমলেব শিক্ষাব্যবস্থায় আমবা পেয়েছি কি? একটি টোল খুললে আর একটি মাদ্রাসা খুলতে হবে। একটি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী হলে আব একটি আলীগড়ের দরকার। বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হল। বাংলার মাটি বাংলার জল এক হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, "........the decision announced in December 1911 to revise the partition of the provinces of north-eastern India gave rise to grave apprehensions among the Mussalman community who constituted the majority in the province of Eastern Bengal and Assam that their educational progress would suffer by the coming change........" দেশের বৃহত্তর শিক্ষা সমস্যার কোন কথা নেই, কোন বিশেষ এক শ্রেণী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে—কাজেই ঢাকাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় খোলা খারাপ নয়—কিন্তু কথা হচ্ছে নীতির দিক থেকে। শিক্ষাজগতে যদি সাম্প্রদায়িক নীতি

কাজ করে তা হলে জাতির কল্যাণ সূচিত হতে পারে না। তা ছাড়া ১৫০ বছরে জনসাধারণের দারিদ্র্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্গতি

গ্রামগুলো ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হয়ে জনবিরল হয়ে পড়েছে এবং ভিড় বেড়েছে সহরের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায়। রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে আমলাতান্ত্রিক শাসন এবং জাতীয় শক্তিসমূহের নিষ্পেষণ অব্যাহত-ভাবে চলেছে। এর মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের অবকাশ কোথায়? একটি সমৃদ্ধিশীল অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই কেবল সত্যিকার সর্ব্বজনীন শিক্ষাপ্রসার হতে পারে। অথচ এব কোনটাই বৃটিশ আমলে ছিল না। কাজেই শিক্ষা ব্যাহত হয়েছে। আবাব উল্টো দিক থেকে দেখতে গেলে বলা যায় যে শিক্ষা ক্রমাগত অবহেলিত হয়েছে বলেই জাতির অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়েছে যার ফলে বিদেশী শাসকের পক্ষে দুনিয়ার হাটে বলা সোজা হয়েছে যে সে এখানে শুধু "civilising mission" এবং "white man's burden" পালন করার জন্যই থেকে গেছে। নইলে এই ক্রান্তীয় উষ্ণ মণ্ডলের দেশে—সাত সমুদ্র পার হয়ে—ইত্যাদি।

দেশ ও জাতির সেই পরম দুর্দ্দিনে অনেকেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিলেন যে দেশকে অবশ্যম্ভাবী অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে হলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার। অনেক জাতীয়তাবাদীর কণ্ঠেই সেদিন দেশাত্মবোধক নূতন শিক্ষার উদাত্ত আহ্বান ঘোষিত হয়েছিল। সেও এক পৃথক ইতিহাস। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, স্যব গুরুদাসের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষাপ্রসার সমিতির প্রতিষ্ঠা, শ্রীঅরবিন্দ ও বিপিন পালের জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ, আইন পরিষদেব ভিতরে-বাইরে গোখলের বিরামহীন প্রচেষ্টা, লালা লাজপত রায়, এ্যানি বেসান্ত প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের জ্বালাময়ী বক্তৃতা ইত্যাদিব

ফলে দেশে ক্রমশঃই এক জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার দাবী প্রাণবন্ত হয়ে উঠছিল। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথও আছেন। জাতীয় শিক্ষার জন্য এই যে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ধারা, গান্ধীজী এরই উত্তরসাধক। বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে দেশকে তিনি এক খাঁটি ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা দিতে চেয়েছেন—যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেশ অনেক দিন থেকেই উপলব্ধি করে আসছিল। জাতীয় শিক্ষার জন্য ১৯০৫ সাল থেকেই যে আন্দোলন দেশের সর্ব্বত্র জমাট বেঁধে উঠছিল, ১৯৩৭ সালে বুনিয়াদী শিক্ষার সুসম্বদ্ধ ব্যাখ্যার মধ্যে সেই ভাবধারারই সফল পরিণতি লক্ষ্য করা যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর পরীক্ষামূলক কাজ

এখানে একটু আগের কথা বলা দরকার। গান্ধীজীর জীবনধারা, দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন, ফিংকস্ সেট্‌লমেণ্ট এবং টলষ্টয় ফার্মে কাজের অভিজ্ঞতা এবং সর্ব্বোপরি সমাজ এবং অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁর স্বতন্ত্র চিন্তাধারা—সব কিছুরই সম্মিলিত প্রভাব বুনিয়াদী শিক্ষার উপর এসে পড়েছে। ১৯৩৭ সালে তিনি যে কথা বলেছিলেন তার পেছনে রয়েছিল প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের চিন্তা এবং অভিজ্ঞতা। কাজেই কেবলমাত্র ১৯৩৭ সাল থেকে আরম্ভ না করে আমাদের পেছিয়ে যেতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকায় যেখানে সর্ব্বপ্রথম গান্ধীজীর সব চিন্তাধারা দানা বেঁধেছিল এবং যে প্রয়োগক্ষেত্রে তিনি আপন ভাবাদর্শের প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

গান্ধীজীবনীর সহিত পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে গান্ধীজীর কর্ম্মজীবনের এক বিরাট অংশ দক্ষিণ আফ্রিকায় কেটেছিল। এই অংশকে গান্ধীজীবনের প্রস্তুতিপর্ব্ব বলা যেতে পারে। এখানে থাকবার সময়ই সমাজ, স্বাধীনতা, শিক্ষা, অর্থনীতি, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর একটি স্বকীয় মতামত এবং চিন্তাধারা গড়ে ওঠে যা পরে তাঁর সমগ্র

কাজ করে তা হলে জাতির কল্যাণ সূচিত হতে পারে না। তা ছাড়া ১৫০ বছরে জনসাধারণের দারিদ্র্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। গ্রামগুলো ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হয়ে জনবিরল হয়ে পড়েছে এবং ভিড় বেড়েছে সহরের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায়। রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে আমলাতান্ত্রিক শাসন এবং জাতীয় শক্তিসমূহের নিষ্পেষণ অব্যাহত-ভাবে চলেছে। এর মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের অবকাশ কোথায়? একটি সমৃদ্ধিশীল অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই কেবল সত্যিকার সর্ব্বজনীন শিক্ষাপ্রসার হতে পারে। অথচ এর কোনটাই বৃটিশ আমলে ছিল না। কাজেই শিক্ষা ব্যাহত হয়েছে। আবার উল্টো দিক থেকে দেখতে গেলে বলা যায় যে শিক্ষা ক্রমাগত অবহেলিত হয়েছে বলেই জাতির অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়েছে যার ফলে বিদেশী শাসকের পক্ষে দুনিয়ার হাটে বলা সোজা হয়েছে যে সে এখানে শুধু "civilising mission" এবং "white man's burden" পালন করার জন্যই থেকে গেছে। নইলে এই ক্রান্তীয় উষ্ণ মণ্ডলের দেশে—সাত সমুদ্র পার হয়ে—ইত্যাদি।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্গতি

দেশ ও জাতির সেই পরম দুর্দ্দিনে অনেকেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিলেন যে দেশকে অবশ্যম্ভাবী অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে হলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার। অনেক জাতীয়তাবাদীর কণ্ঠেই সেদিন দেশাত্মবোধক নূতন শিক্ষার উদাত্ত আহ্বান ঘোষিত হয়েছিল। সেও এক পৃথক ইতিহাস। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, স্যর গুরুদাসের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষাপ্রসার সমিতির প্রতিষ্ঠা, শ্রীঅরবিন্দ ও বিপিন পালের জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ, আইন পরিষদের ভিতরে-বাইরে গোখলের বিরামহীন প্রচেষ্টা, লালা লাজপত রায়, এ্যানি বেসান্ত প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের জ্বালাময়ী বক্তৃতা ইত্যাদির

ফলে দেশে ক্রমশঃই এক জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার দাবী প্রাণবন্ত হয়ে উঠছিল। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথও আছেন। জাতীয় শিক্ষার জন্য এই যে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ধারা, গান্ধীজী এরই উত্তরসাধক। বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে দেশকে তিনি এক খাঁটি ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা দিতে চেয়েছেন—যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেশ অনেক দিন থেকেই উপলব্ধি করে আসছিল। জাতীয় শিক্ষার জন্য ১৯০৫ সাল থেকেই যে আন্দোলন দেশের সর্ব্বত্র জমাট বেঁধে উঠছিল, ১৯৩৭ সালে বুনিয়াদী শিক্ষার সুসম্বদ্ধ ব্যাখ্যার মধ্যে সেই ভাবধারারই সফল পরিণতি লক্ষ্য করা যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর পরীক্ষামূলক কাজ

এখানে একটু আগের কথা বলা দরকার। গান্ধীজীর জীবনধারা, দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন, ফিংকস্ সেট্‌লমেণ্ট এবং টলষ্টয় ফার্ম্মে কাজের অভিজ্ঞতা এবং সর্ব্বোপরি সমাজ এবং অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁর স্বতন্ত্র চিন্তাধারা—সব কিছুরই সম্মিলিত প্রভাব বুনিয়াদী শিক্ষার উপর এসে পড়েছে। ১৯৩৭ সালে তিনি যে কথা বলেছিলেন তার পেছনে রয়েছিল প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের চিন্তা এবং অভিজ্ঞতা। কাজেই কেবলমাত্র ১৯৩৭ সাল থেকে আরম্ভ না করে আমাদের পেছিয়ে যেতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকায় যেখানে সর্ব্বপ্রথম গান্ধীজীর সব চিন্তাধারা দানা বেঁধেছিল এবং যে প্রয়োগক্ষেত্রে তিনি আপন ভাবাদর্শের প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

গান্ধীজীবনীর সহিত পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে গান্ধীজীর কর্ম্মজীবনের এক বিরাট অংশ দক্ষিণ আফ্রিকায় কেটেছিল। এই অংশকে গান্ধীজীবনের প্রস্তুতিপর্ব্ব বলা যেতে পারে। এখানে থাকবার সময়ই সমাজ, স্বাধীনতা, শিক্ষা, অর্থনীতি, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর একটি স্বকীয় মতামত এবং চিন্তাধারা গড়ে ওঠে যা পরে তাঁর সমগ্র

জীবনাদর্শের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যায় এবং অন্তরের গভীরতম বিশ্বাসরূপে উত্তরজীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্ম্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। গান্ধীজীর আত্মজীবনীতে দেখতে পাওয়া যায় যে ঐ সময়ে দুখানি বই তাঁর সমগ্র জীবনের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর একখানা হচ্ছে Ruskinএর Unto The Last; আর একখানা Tolstoyএর The Kingdom of God is within You. এই দুখানি বই গান্ধীজীর চিন্তাজগতে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। রাস্কিনের কাছ থেকে তিনি যে শাশ্বত সত্যের পরিচয় পেয়েছিলেন তা হচ্ছে অনেকটা এইরূপ ঃ—

১। নিখিল মানবের কল্যাণের মধ্যেই ব্যক্তির কল্যাণ নিহিত রয়েছে।
২। পৃথিবীতে কোন কাজই ছোট নয়। ঝাড়ুদার যে কাজ করে ব্যাবিষ্টারের কাজের চেয়ে তা কোন অংশে ছোট নয়। যে পবিত্র শ্রমের ফলে জীবিকার সংস্থান হয় তার মধ্যে কোন হীনতা নেই।
৩। কায়িক শ্রমের জীবন—কুলি-মজুরের জীবনেরও মহিমা আছে। এবং সে জীবন যাপনের মূল্যও মহান।

গান্ধীজী বলেছেন—প্রথমটি আমি জানতাম। দ্বিতীয়টি আমার অবচেতন মনের অস্পষ্ট চেতনায় ঘুমন্ত ছিল। তৃতীয়টি আমার কোনদিনই মনে আসে নি। দিবালোকের মত আজ আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে প্রথমটির মধ্যেই শেষের দুটিও আছে। প্রত্যূষের প্রথম সূর্য্যালোককে অভিনন্দন জানিয়ে শপথ গ্রহণ করলাম জীবনে এই পরম সত্যকে রূপায়িত করে তুলব।

এ হচ্ছে ১৯০৪ সালের কথা।

টলষ্টয়ের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন বলিষ্ঠ স্বাধীন চিন্তাশক্তি,

সত্যনিষ্ঠা এবং প্রচণ্ড নৈতিক বল। সার্ব্বজনীন মৈত্রীর ভিত্তিতে যদি কোন শোষণহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা করতে হয় তা হলে তার গোড়াপত্তন করতে হবে শিশুশিক্ষার মধ্যে—যার ফলে আগামী দিনের বংশধরগণ একদিন নূতন সমাজজীবনের অগ্রদূত হিসাবে কাজ করতে পারে—এই সত্য সেদিন তাঁর সামনে প্রতিভাত হয়েছিল।

এই আদর্শ সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় দুটি উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রথমটি হচ্ছে ফিংকস্ সেট্‌লমেণ্ট। ডার্ব্বান সহর থেকে বার মাইল দূরে ১৯০৪ সালে তিনি এই উপনিবেশটি স্থাপন করেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ট্রানস্‌ভালে টলষ্টয় ফার্ম্ম। এর পরে ভারতেও তিনি আর একটি আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। সেটি হচ্ছে ১৯১৫ সালে সবরমতী আশ্রম। ফিংকস্ সেট্‌লমেণ্ট থেকে টলষ্টয় ফার্ম্ম এবং সেখান থেকে সবরমতী আশ্রম—এই যাত্রাপথের মধ্যে কোন বিচ্ছিন্নতা নেই। এই তিনটি উপনিবেশেরই সমষ্টিগত জীবনযাত্রার মধ্যে এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য ছিল, যাদের বাস্তব প্রয়োজন থেকেই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম উন্মেষ হয়। ১৯০৪ সালে ফিংকস্ সেট্‌লমেণ্টে সেই যে প্রথম উন্মেষ তার শেষ পরিণতি ১৯৩৭ সালে ওয়ার্দ্ধার সেবাগ্রামে।

ফিংকস্ সেট্‌লমেণ্টের অধিবাসিদের মধ্যে সমান পরিমাণে জমি ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল এবং জীবিকার জন্য সকলকেই সেখানে দৈহিক পরিশ্রম করতে হত। সেখানকার সঙ্ঘবদ্ধ জীবনে কোন বৈষম্য ছিল না—সরল, অনাড়ম্বর জীবনই ছিল সকলের কাম্য—যে জীবন আপন মহিমায় মণ্ডিত—সহিষ্ণু, স্বাবলম্বী, নির্ভীক ও পবিত্র। বলা বাহুল্য পিয়ন-চাপরাশীর কোন বালাই সেখানে ছিল না। রান্নাবাড়া, ঘরদোর পরিষ্কার করা, ময়লা ফেলা—সব কাজই আশ্রমবাসিদের নিজেদের করতে হত। ফলে আশ্রমের মধ্যে কোন অসুখ-বিসুখ ছিল না। এই উপনিবেশের তিরিশটি ছেলেমেয়ের লেখাপড়া নিয়েই সেখানে প্রথম

শিক্ষাসমস্যা দেখা দেয়। এই অবস্থায় গান্ধীজী তাদের লেখাপড়ার ভার নিয়ে এক শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আবাসিক আশ্রম বলে তাঁদের কতগুলো সুবিধা ছিল। শিক্ষার্থিদের রোজ তিন ঘণ্টা করে লেখাপড়া করতে হত। দু ঘণ্টা করে তারা কৃষিকাজ করত, আর দু ঘণ্টা ছাপাখানার কাজ করত। বাড়ীতে পড়ার কাজ রাত্রিতে করতে হত। গান্ধীজী লক্ষ্য করেছিলেন যে এই শিক্ষাব্যবস্থার ফলে গতানুগতিক বিদ্যাশিক্ষা ছাড়াও শিক্ষার্থিদের মধ্যে কতগুলো গুণাবলী বিকাশ লাভ করছে। তা হচ্ছে—শ্রমের প্রতি মর্য্যাদাবোধ, আত্ম-বিশ্বাস, পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গী এবং উদার সামাজিক চেতনা। প্রত্যক্ষভাবে এই লেখাপড়ার কাজ করে গান্ধীজী যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তা তিনি ১৯০৮ সালে 'হিন্দ্ স্বরাজ' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। সেখানে মামুলী শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—'What is the meaning of education ? It simply means a knowledge of letters. It is merely an instrument, and an instrument may be well used or abused. We daily observe that many men abuse it and very few make good use of it.' এই বইয়েরই অন্যত্র তিনি বলেছেন—What is our condition ? We write to each other in faulty English........; our best thoughts are expressed in English ; the proceedings of our Congress are conducted in English ; our best newspapers are printed in English. If this state of things continues for a long time, posterity will, it is my firm opinion, condemn and curse us.

এই কথা যে কত মর্ম্মান্তিকভাবে সত্য তা আমরা বুঝতে পারি যখন দেখি যে বিদেশী ভাষার নাগপাশের ফলে আমাদের উচ্চতর শিক্ষা

সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত। দৈনিক সংবাদপত্রে অনেকেই হয়ত দেখেছেন যে সাম্প্রতিক বৈদেশিক মুদ্রাভাবের জন্য বিলাত-আমেরিকা থেকে বই না আসার ফলে ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের কালোবাজারের অন্ধকার থেকে পাঠ্যপুস্তক কিনে জ্ঞানের আলোক জ্বালতে হচ্ছে।

ফিংকস্ সেট্‌লমেণ্ট থেকে টলষ্টয় ফার্ম্মে গান্ধীজী শিক্ষা বিষয়ে পরীক্ষামূলক কাজের সুবিধা আরও অনেক বেশী পেয়েছিলেন। এই ফার্ম্মটি ছিল জোহান্সবার্গ থেকে ২১ মাইল দূরে একটি পতিত জমির উপর। এখানেও শিক্ষাকর্ম্মিদের স্বাবলম্বী করে তোলবার জন্য পাচকভৃত্যের কোন বরাদ্দ ছিল না। পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য 'অস্পৃশ্য অশুচি' কাজগুলোও আশ্রমবাসিদের নিজেদেরই করতে হত। কিন্তু তার জন্য কোন নালিশ ছিল না, কারণ সেখানে কেবলমাত্র আজ্ঞাকারী এবং আজ্ঞাবহ বলে আলাদা দুটো দল ছিল না। এখানেই বৃত্তিশিক্ষার অঙ্গ হিসাবে গান্ধীজী শিল্পশিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেন, এবং সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় শিল্পের স্থান অপরিহার্য্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। ৬ থেকে ১৬ বছরের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এখানে শিক্ষাকাজ চলত এবং তারা যে কাজগুলো অভ্যাস করত তা হচ্ছে—মাটিকাটা, সাফাই, রান্না, দারুশিল্প এবং চর্ম্মশিল্প। গান্ধীজী নিজে পাদুকা তৈরীর কাজ এখানেই শেখেন। এই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল—গান্ধীজীর নিজের ভাষায় —'all-round development of boys and girls for whose training I was responsible.' পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষার জন্য রোজ তিন ঘণ্টা করে সময় দেওয়া হত। এর মধ্যে ছিল ভাষা ও সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল। আর এ ছাড়া ছিল শরীরচর্চ্চা, নৈতিক ও ধর্ম্ম শিক্ষা।

এই ফার্ম্মের শিক্ষাসাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক। আজকাল শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক

বিশৃঙ্খলা এবং অসংযমের প্রতিকারকল্পে অনেকেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কস্থাপনের কথা বলছেন। সার্জ্জেণ্ট সাহেবও এই 'personal contact'এর উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। এই সম্পর্কের সার্থক অনুশীলন যাতে টলষ্টয় ফার্মে হতে পারে তার দিকে গান্ধীজী বিশেষ লক্ষ্য রেখেছিলেন। তাঁর নিজের কথা হচ্ছে এই—

If I was to be their real teacher and guardian, I must touch their hearts. I must share their joys and sorrows. I must help them to solve the problems that faced them, and I must take along the right channel the surging aspirations of their youth.

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গান্ধীজী যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় এই শিক্ষাকাজে ব্যাপৃত, তখন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথও শিক্ষাকে প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন হৃদয় থেকে হৃদয়ে—জীবন থেকে জীবনে—মস্তিষ্ক থেকে মস্তিষ্কে নয়। আর এইটুকু করতে পারলে বোধ হয় বর্ত্তমান শিক্ষাবিদগণকে শৃঙ্খলা-সংযমের গুরুতর সমস্যা নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হত না।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১৯১৪ সালের শেষের দিকে দেশে ফিরে গান্ধীজী একবার শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন এবং সেখানে কিছুদিন ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ততদিনে ফিংকস্ সেট্‌লমেণ্টটি সরিয়ে আনা হয়েছে এবং ব্যাপারটি তাৎপর্য্যপূর্ণ যে শান্তিনিকেতনেই তাদের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। রান্নাবাড়ার কাজে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য গান্ধীজী এখানেও প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং কবি স্বয়ং এই প্রস্তাবে তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। গান্ধীজীর শান্তিনিকেতনে কয়েকদিন থাকার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু গোখলের মৃত্যু এবং অন্যান্য রাজনৈতিক প্রয়োজনে তাঁকে সত্বর পুনায় চলে যেতে হয়। কিন্তু স্বল্পস্থায়ী হলেও

কবিগুরুর সঙ্গে এই সাক্ষাৎ তাৎপর্য্যপূর্ণ। গান্ধীজীর শিক্ষানীতির ক্রমপরিণতির সঙ্গে শান্তিনিকেতনের এই যোগাযোগের সম্বন্ধ বিশেষ অর্থপূর্ণ।

ভারতভূমিতে পরীক্ষামূলক কাজ

এর পর গান্ধীজী ১৯১৫ সালের ২৫শে মে সবরমতী নদীর তীরে তাঁর শেষ আশ্রম স্থাপন করেন। এখানে প্রায় তিরিশজন সদস্য ছিল এবং এখানেও শিশুদের শিক্ষা নিয়ে এক সমস্যা দেখা দেয়। গান্ধীজী পূর্ব্বলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার অনুরূপ ধারায় এখানেও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। সবরমতীর এই শিশু-ভবনটিকে তিনি একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চেয়েছিলেন এবং এখানে পাঠক্রম, পাঠ্যতালিকা, বিষয়বস্তু, শিক্ষাপদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে শিক্ষা-কর্ম্মিদের মধ্যে প্রাণবন্ত আলোচনা হত। সব বিষয়েই যে মতৈক্য হত এমন কোন কথা নেই। সমস্যা হল দুদিক থেকে—একদিকে আশ্রম—এর পরিচালনা, উৎপাদন, জীবিকা, পরিচ্ছন্নতা; অন্যদিকে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এখানেই গান্ধীজী চূড়ান্তভাবে বুঝতে পারলেন যে শিক্ষা জীবন থেকে আলাদা নয়—শিল্পকাজ বিদ্যাভ্যাস থেকে আলাদা নয়—বরঞ্চ শিল্পকাজের মধ্যেই শিক্ষার সম্ভাবনা রয়েছে। আশ্রমের নেতৃস্থানীয় কেউ কেউ বলতেন যে শিল্পকাজই হবে মুখ্য, আর সব হবে গৌণ। কিন্তু যে মতামত স্থায়িত্ব লাভ করে তা হচ্ছে এই...the introduction of industries in education must be on educational lines, not on those of a factory.' ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনার শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার এই হল প্রথম সোপান।

১৯২১ সালে গান্ধীজী শিক্ষা সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন তাও এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি জোরের সঙ্গে বলেন যে এক

বিদেশী ভাবধারা এবং ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের ফলে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হচ্ছে না—জনসমাজের বিশাল এক অংশ প্রকৃত শিক্ষার সুফল থেকে বঞ্চিত। ইংরেজের পাঠশালায় শিক্ষিত হয়ে তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের দল যে চশমা দিয়ে দেশের সমস্যাগুলোর বিচার করছেন তাতে জাগতিক পরমার্থ লাভ হতে পারে, কিন্তু দেশের কল্যাণ আসবে না। তা ছাড়া এতে বিদ্যালয়ে হৃদয়বত্তার বিকাশ অথবা চরিত্রগঠন হচ্ছে না। সেই পাঠশালায় বুদ্ধিকে শাণ দেওয়া যায় এবং শতভাবে শতকাজে ফাঁকি দিয়ে সেই শাণিত বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া যায়, কিন্তু তাতে দেশ এগুবে না। পাঠ্যপুস্তকগুলো একঘেয়ে, অবাস্তব —শিশুদের পরিবেশের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ নেই—দৈনন্দিন চাহিদার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। এই শিক্ষার ফলে তাই দেশের মাটির সঙ্গে শিক্ষিত লোকদের বন্ধন শিথিল হয়ে আসছে। এই শিক্ষাসোপানের যত উপরের তলায় যাওয়া যাবে, ততই দেখতে পাওয়া যাবে যে তথাকথিত একদল শিক্ষিত লোক নিজেদের জন্য এমন এক সঙ্কীর্ণ স্বর্গলোক গড়ে তুলেছে যেখানে দেশের নাড়ীর স্পন্দন অত্যন্ত স্তিমিত। অথচ চাকুরী, খেতাব, সামাজিক সম্মান ইত্যাদিব ফলে এঁরাই সমাজের মধ্যমণি—আর এদের হাবভাব, আদব-কায়দা, দৃষ্টিভঙ্গী সমাজের নিম্নতর স্তরে সঞ্চারিত হয়ে ক্রমশঃ জাতিকে এক শ্রেণী-বিভেদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তবু দেশ টিকে আছে কেমন করে? চরম আত্মবিলুপ্তি হচ্ছে না কেন? গান্ধীজী নিজেই তার জবাব দিয়েছেন—

And if the mass of educated youths are not completely denationalised, it is because the ancient culture is too deeply imbedded in them to be altogether uprooted even by an education averse to its growth.

তারপর শেষ কথা হচ্ছে এই যে, যে দেশের শতকরা ৮০ জন লোক জমি থেকে জীবিকার সংস্থান করে সেই দেশে শ্রমবিবর্জ্জিত কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার মস্তিষ্কচর্চ্চার আয়োজন করা শুধুমাত্র শিক্ষার সমাধি রচনা করাই নয়—তা হচ্ছে পাপাচার।

এর পর লক্ষ্য করা যায় যে যারবেদা কারাগার থেকে ১৯৩২ সালে গান্ধীজী শিক্ষা সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা অপেক্ষাকৃত প্রণালীবদ্ধ, বিজ্ঞানসম্মত এবং অভিজ্ঞতার আলোকে অধিকতর সংগঠিত। এখানে আমরা শিক্ষানীতির কতগুলো মূল সূত্র পাই। তা হচ্ছে এই—

১। শিক্ষাব্যবস্থায় কায়িক শ্রমের এক বিশেষ স্থান থাকবে। শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছেলেমেয়েরা এই কায়িক শ্রমের কাজ করবে।

২। শিক্ষার্থিদের আগ্রহ, যোগ্যতা এবং প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে কর্ম্মবণ্টন করতে হবে।

৩। যন্ত্রচালিতের মত এই শ্রমের কাজ করলে চলবে না—কাজের পেছনে যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি এবং পদ্ধতি আছে তা সকলকে জানতে হবে।

৪। যতদূর সম্ভব ক্রীড়াচ্ছলে শিশুদের লেখাপড়া শেখাতে হবে, কারণ ক্রীড়াচ্ছল-পদ্ধতি শিশুশিক্ষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৫। মাতৃভাষা হবে শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম।

৬। লেখা শিখবার আগে শিশুরা পড়তে শিখবে।

৭। লেখা শেখাবার আগে জ্যামিতিক রেখা, হিজিবিজি আঁকবার অভ্যাস করাতে হবে।

৮। ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে লেখাপড়া করবে।

৯। ষোল বছর পর্য্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা চলবে—এই স্তরেও সহ-শিক্ষা চলতে পারে।

১০। এই স্তরেও কায়িক শ্রমের স্থান থাকবে—তবে প্রয়োজনানুসারে লেখাপড়ার বিষয়ও বাড়াতে হবে। এই স্তরে শিক্ষার্থিগণকে বৃত্তি নির্ব্বাচনের সুযোগ দিতে হবে।

১১। এই স্তরে মাতৃভাষা ব্যতীত শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, জ্যামিতি, বীজগণিত, উদ্ভিদবিদ্যা ইত্যাদি পাঠ করবে।

১২। ষোল বছরের পরে উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থা কেবলমাত্র যোগ্যতা, আগ্রহ এবং অন্যান্য অবস্থা বিচার করেই করা হবে।

১৩। নয় বছর থেকে শিশুরা বিদ্যালয়ে উৎপাদনের কাজ করতে পারে। প্রথম অবস্থায় উৎপাদনের গুরুত্ব কম—কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শেষের দিকে উৎপাদন থেকে স্কুলের দৈনন্দিন খরচ নির্ব্বাহ কবা যায়।

১৪। শিশুদিগকে নৈতিক এবং ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হবে—পুস্তকের উপর নির্ভর না করে শিক্ষকের জীবনাদর্শই হবে এই শিক্ষার প্রধান বাহক।

১৫। বিদ্যালয়ের জন্য বিশাল এবং মূল্যবান অট্টালিকার কোন প্রয়োজন নেই।

১৬। আন্তর্জ্জাতিক ভাব-বিনিময় এবং লেনদেনের প্রয়োজনে আবশ্যিক না হলেও ইংরেজীর স্থান পাঠ্যতালিকায় থাকতে পারে।

সবরমতী আশ্রমের শিক্ষাভবনে উপরিলিখিত নীতিতেই কাজ চলত। এই সব নীতি এবং পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ থেকে গান্ধীজী যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তাই তাঁকে পাঁচ বছর পরে গভীর আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে দেশবাসীর সামনে এক নূতন শিক্ষাব্যবস্থা উপস্থাপিত করতে সাহায্য করেছিল।
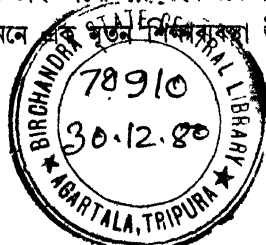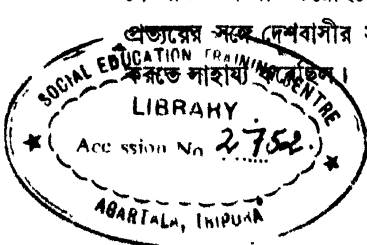
এবার আমরা ১৯৩৭ সালে চলে এলাম। বুনিয়াদী শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করতে হলে সাধারণতঃ এই সময় থেকেই আরম্ভ করা হয়। এর কারণ হচ্ছে এই যে—এই সময় থেকেই দেশে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ ব্যাপক এবং প্রণালীবদ্ধভাবে প্রসারলাভ করে এবং পরীক্ষামূলক কাজের পরিধিও অনেক বেড়ে যায়। এই পর্য্যন্ত যা ছিল গান্ধীজী এবং তাঁর কয়েকজন মুষ্টিমেয় অনুগামীর ব্যক্তিগত বিষয়, তাই সর্ব্বভারতীয় জাতীয় শিক্ষার সম্ভাবনা নিয়ে দেশের সামনে আত্মপ্রকাশ করল।

প্রয়োগ পর্ব্ব—১৯৩৭-

১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে হরিজন পত্রিকাতে গান্ধীজী সর্ব্বপ্রথম বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। তিনি লিখেছিলেন—

By education I mean an all-round drawing-out of the best in child and man—body, mind and spirit............Literacy in itself is no education. I would therefore begin the child's education by teaching it a useful handicraft and enabling it to produce from the moment it begins its training. Thus, every school can be made self-supporting.

I hold that the child's development of the mind and the soul is possible in such a system of education. Only every handicraft has to be taught not merely mechanically, as is done to-day, but scientifically ; the child should know the why and wherefore of every process............The principal

means of stimulating the intellect should be manual training.

রাজনৈতিক সংগ্রাম, শিল্প-সংগঠন, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে গান্ধীজীর যেমন একটি নিজস্ব মৌলিক চিন্তাধারা রয়েছে—যা আপাত-দৃষ্টিতে অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর এবং স্ববিরোধী বলে মনে হয়—শিক্ষানীতিতেও তিনি ঠিক সেইরকম একটি স্বকীয় ভাবস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে আমাদের দেশে প্রচলিত গতানুগতিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বুনিয়াদী শিক্ষার পার্থক্য অত্যন্ত গভীর এবং মৌলিক। পৃথিবীর অন্যান্য অগ্রসর দেশের আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার কতগুলো নীতিগত সাদৃশ্য থাকলেও এর মধ্যে আবার কিছু চমকপ্রদ নূতনত্বও আছে যা অনবহিত অভিভাবকের পক্ষে বিশেষ সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তাই সর্ব্বপ্রথম যখন এই শিক্ষার কথা দেশের সামনে উপস্থিত করা হল, তখন সর্ব্বত্র এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিরোধ, বার্ত্তা-বিবৃতি—অনেক কিছুই সেই সময় মাথা নাড়া দিয়েছিল। একদল এই শিক্ষায় পরাধীন জাতির মুক্তিপথের সন্ধান পেয়েছিলেন—সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পুনরুত্থানের শুভ ইঙ্গিত লক্ষ্য করেছিলেন। অন্যদল এর মধ্যে দেখেছিলেন শিশুর শ্রম-শোষণ, শিক্ষাসাধনার বিরাট লাঞ্ছনা, অপচয় এবং শেষ পর্য্যন্ত এই প্রতিযোগিতামূলক বৈজ্ঞানিক দুনিয়ায় জাতীয় জীবনের চরম দুর্ভাগ্য এবং বিপর্য্যয়। বাতাস যখন এইরূপ বিরোধক্ষুব্ধ সেই সময় ১৯৩৭ সালের ২২শে ও ২৩শে অক্টোবর ওয়ার্দ্ধায় বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি এবং পদ্ধতি, সংগঠন, পাঠ্যতালিকা—এক কথায় এর সর্ব্বাঙ্গীণ মূল্য-নির্দ্ধারণ ও পরিকল্পনা রচনার জন্য প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। গান্ধীজী স্বয়ং এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন।

প্রথম অধিবেশন ও চারটি প্রস্তাব

এই অধিবেশনে উপস্থিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে এঁরাও ছিলেন—ডাঃ জাকীর হোসেন, শ্রীআর্য্যনায়কম, শ্রীবিনোবাজী, শ্রীমাশরুওয়ালা, শ্রীকাকাসাহেব কালেলকার, শ্রীকুমারাপ্পা, শ্রীকে, জি, সৈদিন, শ্রী কে, টি, শাহ, শ্রীমতী আশা আর্য্যনায়কম ইত্যাদি।

এই অধিবেশনে ৪টি প্রস্তাব গৃহীত হয় ঃ—

১। সমগ্র ভারতবর্ষে কমপক্ষে সাত বছরের জন্য (বছর ৭—১৪) অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত।

২। মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার মাধ্যম।

৩। এই স্তরে শিক্ষাব্যবস্থা কায়িক শ্রম এবং উৎপাদনাত্মক কোন শিল্পকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হবে। অন্যান্য পঠন-পাঠন-ক্রিয়াকর্ম্ম এই মূল শিল্পকাজের সঙ্গে সম্বন্ধিত হবে এবং এই শিল্প পরিবেশের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে নির্ব্বাচিত হবে।

৪। এই শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষকদের বেতন ইত্যাদি খরচও কালক্রমে চালাতে সমর্থ হবে।

এই অধিবেশনে ডাঃ জাকীব হোসেনের সভাপতিত্বে একটি বিস্তৃত বুনিয়াদী পাঠ্যতালিকা প্রণয়নের জন্য এক সমিতিও গঠিত হয়। এটিই জাকীর হোসেন কমিটি নামে পরিচিত এবং এই কমিটি ১৯৩৮ সালের মার্চ্চ মাসে বুনিয়াদী পাঠ্য-তালিকা সহ যে শিক্ষা-পরিকল্পনা পেশ করেন তাই ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা নামে পরিচিত। বুনিয়াদী শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে জাকীর হোসেন কমিটির এই রিপোর্টটি একটি মূল্যবান এবং প্রামাণ্য জিনিস। তাই এই রিপোর্টটির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের মর্ম্মানুবাদ এখানে দেওয়া হল।

জাকীর হোসেন কমিটির সুপারিশ

১। চলতি শিক্ষাব্যবস্থার ফলে দেশে জাতীয় প্রয়োজনানুগ কর্ম্মদক্ষ সুনাগরিক তৈরী হচ্ছে না। বর্ত্তমান সামাজিক

ব্যবস্থা প্রতিযোগিতা এবং বাহুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত। পারস্পরিক সহযোগিতার উপর নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠা এর দ্বারা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিবিশেষের অন্তর্নিহিত সৃজনীপ্রতিভা এই শিক্ষার মধ্যে বিকাশ লাভ করতে পারছে না। কাজেই জাতীয় প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে একটি গঠনমূলক নূতন শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

২। সমস্ত অগ্রসর দেশের শিক্ষানীতিতেই উৎপাদনাত্মক শিল্প-কর্ম্মকে শিশুশিক্ষার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই শিক্ষানীতির ফলে শিক্ষার্থীর সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের সম্ভাবনা অনেক বেশী।

৩। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও এই শিক্ষা বাঞ্ছনীয়, কারণ এই শিক্ষা পুস্তক-কেন্দ্রিক শিক্ষার একঘেয়েমি এবং মস্তিষ্কচর্চ্চা থেকে শিশুকে রক্ষা করে। শিশুর হাত ও মাথা দুটোই একসঙ্গে কাজের সুযোগ পায় বলে শিশুর বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা এক সূত্রে গ্রন্থিত হয়। এতে জ্ঞান এবং কর্ম্মের সমন্বয় সাধিত হয় এবং শিশু সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় (literacy of the whole personality)।

৪। সামাজিক দিক থেকে বিচার করতে গেলে উৎপাদনাত্মক ব্যবহারিক শিল্পকাজের ফলে বুদ্ধিজীবী এবং শ্রমজীবী এই দুই দলের কৃত্রিম এবং ক্ষতিকর ব্যবধানের সীমারেখা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা এই শিক্ষায় দেখা দেবে। এর ফলে সমাজে শ্রমের মর্য্যাদা বাড়বে এবং সামাজিক সংহতি দৃঢ় হবে। এই সামাজিক সংহতির নৈতিক মূল্যও কম নয়।

৫। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাব যে এই শিক্ষার ফলে সমাজের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের কর্ম্ম-কুশলতা এবং কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা আসবে

এবং তারা অধিকতর গঠনমূলকভাবে অবসর-সময় যাপনের সুযোগ পাবে।

৬। কেবলমাত্র শিক্ষাগত দিক থেকে বিচার করলেও এ কথা বলা যায় যে শিল্পকেন্দ্রিক হওয়ার ফলে শিক্ষা অধিকতর বাস্তবধর্ম্মী হবে। জীবনধর্ম্মী এই যে শিক্ষা, এর বিভিন্ন বিভাগও পরস্পরের সহিত অধিকতর স্বাভাবিকভাবে সম্পৃক্ত হবে।

৭। বিশেষভাবে দুটি কথা সব সময় মনে রাখা দরকার। প্রথমতঃ, যে শিল্প নির্ব্বাচিত হবে তার শিক্ষাগত সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে থাকতে হবে। **শিল্পকাজ করা হচ্ছে শিক্ষার জন্য, উৎপাদনের জন্য নয়। কাজেই দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, যন্ত্রচালিতবৎ শিল্পের কাজ করলে চলবে না। প্রত্যেকটি কাজের প্রক্রিয়া, পদ্ধতি এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কাজের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থিদের জানতে হবে। তা হলেই কেবল শিল্পকাজের শিক্ষাগত সম্ভাবনা সার্থকভাবে রূপ পাবে।** এর ফলে সহজেই বোঝা যায় যে শিল্পকাজের সঙ্গে শিক্ষা-পদ্ধতির গভীর সম্বন্ধ রয়েছে।

৮। এই শিক্ষার স্বয়ংসম্পূর্ণতা কথাটি নিয়ে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। কাজেই এ সম্বন্ধেও পরিষ্কার করে কিছু বলা দরকার। এ কথাটি বিশেষভাবে বলা যেতে পারে যে, যদি ষোল আনা স্বয়ংসম্পূর্ণতা নাও আসে, তবু নীতি হিসাবে স্বাবলম্বনের উদ্দেশ্যটি রাখা অসমীচীন নয়, কারণ এর ফলে বিদ্যালয়ে কিছু সম্পদের সৃষ্টি হবে এবং তা থেকে দৈনন্দিন প্রাসঙ্গিক খরচের আংশিক নির্ব্বাহ হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, কোন লক্ষ্য স্থির না থাকলে শিল্পকাজে অপচয় আসতে পারে এবং তার ফলে শিক্ষার ব্যাঘাত হবে। উৎপাদনের উপর গুরুত্ব না থাকলে শিল্প নিয়ে ছেলেখেলা হতে পারে, এবং

কোন দেশের শিক্ষাবিদগণই এরূপ নীতিবিবর্জ্জিত শিল্পকাজ পছন্দ করেন না। শিল্পকাজ যদি শিশুরা ভালভাবে করে—এবং শিশুদের সব কাজই ভালভাবে করতে শেখান কর্ত্তব্য—তা হলে কিছু উৎপাদন হবেই এবং সেই উৎপাদন থেকে যদি বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহের আংশিক সঙ্কুলান হয়, তা হলে শিক্ষা ব্যাহত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

৯। এর ফলে শিক্ষকের উপর এক গুরুদায়িত্ব এসে পড়ে। উৎপাদন এবং অর্থ উপার্জ্জনের লোভে কোন কোন শিক্ষক হয়ত লেখাপড়াকে অবহেলা করে কেবলমাত্র শিল্পকাজের উপরই গুরুত্ব দিতে পারেন। এইরূপ ভুল যাতে না হয় তার জন্য প্রত্যেক শিক্ষককেই খুব সাবধান থাকতে হবে। শিল্পকাজ যাতে শিশুদের মানসিক, সামাজিক এবং নৈতিক বিকাশলাভের পথে বাধা সৃষ্টি না করে তার দিকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং শিক্ষক-শিক্ষণ, শিক্ষা-পরিদর্শন এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রচেষ্টাও যাতে সর্ব্বাত্মকভাবে এই মূল নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেদিকে সচেতন হতে হবে।

১০। শিশুদের সামাজিক চেতনা বিকাশের পথে এই শিক্ষা বিশেষ কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায়। শিশুরা হাতে কলমে এমন কতগুলো শিল্পকাজ অভ্যাস করছে যেগুলো না থাকলে সমাজ চলতেই পারে না—যেমন, কৃষি, বস্ত্রবিদ্যা ও দারুশিল্প। প্রত্যক্ষভাবে এই কাজগুলো করার ফলে সমাজজীবনের যে অংশের এবং যে সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের একাত্মতাবোধ জন্মাবে, সেই অংশ বহুদিনের অনাদর ও উপেক্ষায় নতশির এবং ম্রিয়মাণ। গতানুগতিক শিক্ষার ছাপ নিয়ে যাঁরা এদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জ্জন করে থাকেন, তাঁরা এদেরই শ্রমের ফল ভোগ করে থাকেন—কিন্তু এদের সগোত্র মনে করেন না—

সেখানে একাত্মতা বোধ নেই। বুনিয়াদী শিক্ষার ফলে এমন একদল উত্তরসাধক বিদ্যালয় থেকে বের হয়ে আসবে আশা করা যায়, যারা প্রত্যক্ষ কাজের ফলে জানে—কাদের মেহনতের ফলে সমাজ চলছে এবং সেই মেহনতের মূল্য কতখানি। কাজেই অন্ততঃ আর কিছু না হোক, এই শিক্ষার ফলে সমাজে যে একদল সমবেদনশীল অকৃত্রিম কর্ম্মীর উদ্ভব হবে এতে সন্দেহ নেই।

জাকীর হোসেন কমিটির রিপোর্টে পাঠক্রম, শিক্ষক-শিক্ষণ, শিক্ষা-পরিদর্শন, পরীক্ষাপদ্ধতি ও শাসনব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধেও মতামত ছিল। এই রিপোর্টটি ১৯৩৮ সালের মার্চ্চ মাসে জাতীয় কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে বিচার-বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়। কংগ্রেস বিবেচনার পর নিম্নলিখিত তিনটি প্রস্তাব গ্রহণ করে ঃ—

১। দেশব্যাপী সাত বছরের (বছর ৭—১৪) জন্য আবশ্যিক এবং অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হওয়া প্রয়োজন।

২। মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার মাধ্যম।

৩। এই স্তরে শিক্ষাব্যবস্থা কোন কায়িক শ্রম অথবা উৎপাদনাত্মক শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে। অন্যান্য সমস্ত লেখাপড়ার কাজ এই মূল শিল্পের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হবে, এবং শিল্পনির্ব্বাচন পরিবেশের বাস্তব প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে করতে হবে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ওয়ার্দ্ধায় প্রথম শিক্ষা-অধিবেশনে ৪টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। কংগ্রেসের অধিবেশনে তার প্রথম ৩টি প্রস্তাবকে মাত্র গ্রহণ করা হয়। ওয়ার্দ্ধার যে প্রস্তাবটিতে শিক্ষকদের পারিশ্রমিকের উল্লেখ ছিল সেই প্রস্তাবটি হরিপুরা অধিবেশনে গৃহীত হল না। কেন এই প্রস্তাবটিকে বাদ

দেওয়া হল সে সম্বন্ধে কোন কারণ সাধারণতঃ দেখান হয় না, কিন্তু একটা কথা স্বভাবতঃই মনে হয় যে, ছাত্রছাত্রীদের উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা শিক্ষকের পারিশ্রমিক নির্ব্বাহের সম্ভাবনাটি হরিপুরা অধিবেশন বোধ হয় যুক্তিযুক্ত বলে মনে করে নি।

হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশন ও হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা

যা হোক্, কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হবার পর দেশব্যাপী এই নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠার আর কোন বাধা রইল না। এই কংগ্রেসের অধিবেশনেই আবার দেশব্যাপী বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সর্ব্বভারতীয় বোর্ড গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই অনুসারে এক মাস পরে (এপ্রিল, ১৯৩৮) এই শিক্ষার সংগঠন-কল্পে একটি সুসমঞ্জস পরিকল্পনা নির্ম্মাণের জন্য হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ নামে একটি বোর্ড গঠিত হয়। সেই থেকে হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ দেশব্যাপী বুনিয়াদী শিক্ষার সফল সংগঠনের জন্য কাজ করে আসছে। কংগ্রেস অধিবেশনের পর বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা, আসাম, বোম্বাই ইত্যাদি প্রদেশে পরীক্ষামূলকভাবে কাজ আরম্ভ হল। পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন, শিক্ষক-শিক্ষণ ইত্যাদি কাজও আরম্ভ করা হয়।

এইভাবে কাজ করার পর রাজনৈতিক কারণে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ বছরখানেক পরে ব্যাহত হল। বুনিয়াদী শিক্ষার দ্রুত প্রসারের একটি কারণ হল এই যে ১৯৩৮ সালে ভারতের অধিকাংশ প্রদেশেই কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ছিল। কিন্তু এই মন্ত্রিত্ব আর বেশীদিন থাকা সম্ভব হল না। ১৯৩৯ সালে ইউরোপে যুদ্ধের ঘনঘটা আরম্ভ হয়ে গেছে—ইংরেজ সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর কোন মতামত না নিয়েই ভারতবর্ষকে যুদ্ধে ভিড়িয়ে দিলে। ফলে সমস্ত প্রদেশ থেকে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে এবং বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ পিছিয়ে পড়ে। বিদেশী আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন যে এই জাতীয় শিক্ষাকে সুনজরে

দেখবে না এতে আর আশ্চর্য্য কি? তবু যা হোক সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ এই বিরাট কর্ত্তব্য পালন করে যেতে লাগল—অগ্রগতির বেগ কমলেও তা রুদ্ধ হল না এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তালিমী সঙ্ঘ এই শিক্ষার পরিধি বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর করে যেতে লাগল। সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে বুনিয়াদী শিক্ষাকর্ম্মিদের আহ্বান করে কাজের অভিজ্ঞতা এবং ভাব বিনিময়ের জন্য অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হতে লাগল এবং তালিমী সঙ্ঘই এর প্রাণকে সঞ্জীবিত করে রাখল।

১৯৩৭ থেকে ১৯৩৮ এর এপ্রিল পর্য্যন্ত যে সব ঘটনার উল্লেখ আমরা করলাম—ওয়ার্দ্ধায় প্রথম শিক্ষা অধিবেশন, চার দফা প্রস্তাব গ্রহণ, জাকীর হোসেন কমিটির রিপোর্ট পেশ, হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশন, তিন দফা প্রস্তাব, হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা এবং তারও পরে হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের চেষ্টা—এ সবই বেসরকারী উদ্যমের ফলে সম্ভব হয়েছে এবং এর পেছনে কাজ করেছে কেবলমাত্র জাতীয়তাবোধক শক্তিসমূহ।

এবার আমরা বুনিয়াদী শিক্ষাক্ষেত্রে বৃটিশ ভারতের সরকারী প্রচেষ্টার উল্লেখ করব। এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পাব যে ইংরেজ আমলেও ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগ বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেছে এবং শেষ পর্য্যন্ত ১৯৪৪ সালে আংশিক পরিমার্জ্জিত আকারে ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনার এই বুনিয়াদী শিক্ষাকেই প্রাথমিক স্তরের জন্য জাতীয় শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি (Central Advisory Board of Education) প্রথম থেকেই বুনিয়াদী শিক্ষার মূল্য বুঝেছিল। এই কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি—যাকে ইংরেজীতে সংক্ষেপে বলা হয়—CABE অথবা CAB—সর্ব্বপ্রথম ১৯২০ সালে স্থাপিত হয়েছিল। এর প্রধান কাজ ছিল বিভিন্ন প্রাদেশিক

সরকারের শিক্ষা বিভাগীয় কাজকর্মের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য রাখা এবং প্রয়োজনবোধে পরামর্শ দেওয়া, অর্থসাহায্য মঞ্জুর করা এবং কেন্দ্রীয় সরকারকেও শিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া। কিন্তু ১৯২৩ সালে এই সমিতিকে তুলে দেওয়া হয়। তার কারণ, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে শিক্ষা একটি প্রাদেশিক এবং হস্তান্তরিত বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন-সীমার বাইরে চলে আসে। কিন্তু শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি তুলে দেওয়া ও প্রাদেশিক বিষয় বলে শিক্ষা ব্যাপারে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করার ফলে সমস্ত ভারতেই শিক্ষাকাজ ব্যাহত হতে আরম্ভ হল। শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে ভারত সরকারের এই 'unfortunate divorce' প্রসঙ্গে Hartog Committee যে মন্তব্য করেছিল তাও এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কমিটি বলেছিল—

বৃটিশ আমলের কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি এবং বুনিয়াদী শিক্ষা

We are of the opinion that the divorce of the Government of India from education has been unfortunate ;................. We have suggested that the Government of India should serve as a centre of educational information for the whole of India and as a means of co-ordinating educational experience of the different provinces. We cannot accept the view that it should be entirely relieved of all responsibility for the attainment of universal primary education..................

হার্টগ কমিটির এই সুপারিশের ফলে ১৯৩৫ সালে আবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়।

এই শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি ১৯৩৮ সালে সর্ব্বপ্রথম বুনিয়াদী শিক্ষা

নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করে। জানুয়ারী মাসে সমিতি একটি উপসমিতি গঠন করে—এই উপসমিতির সভাপতি হন বোম্বাইয়ের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী বি, জি, খের। সাধারণ শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর উড-এবট্ রিপোর্টে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, সেই সব প্রস্তাব এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সুপারিশের আলোকে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে বিচার করতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এই উপসমিতিকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

খের কমিটি যথাসময়ে কতগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নীচে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো দেওয়া হল। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে খের কমিটির সিদ্ধান্তগুলো কিছুটা পরিমার্জ্জিত এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ।

১। নীতি হিসাবে "কর্ম্মকেন্দ্রিক" শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই।

২। কিন্তু নীচের দিকের ক্লাশে বৈচিত্র্যপূর্ণ একাধিক কাজের সুযোগ শিশুদের দিতে হবে—এখানে কর্ম্মের অবকাশই থাকবে বেশী। "কেবলমাত্র উপরের দিকের শ্রেণীগুলোতে" মূল শিল্প নিয়ে কাজ হবে যে শিল্প থেকে বিক্রী করার মত জিনিস তৈরী হবে।

৩। বুনিয়াদী শিক্ষা প্রথমতঃ কেবলমাত্র গ্রামাঞ্চলে চালু হওয়া দরকার।

৪। ৬—১৪ বছরের সমস্ত ছেলেমেয়েকে বাধ্যতামূলকভাবে বুনিয়াদী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রথম অবস্থায় ৮ বছরের পরিবর্ত্তে ৫ বছরই আবশ্যিক কাল হিসাবে নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত ; কাজেই কোন শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণীর পর বুনিয়াদী বিদ্যালয় ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়তে পারে।

৫। শিক্ষার্থিদের মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার মাধ্যম।

৬। সর্ব্বভারতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দুস্থানীকে গ্রহণ করা উচিত। এই ভাষা হিন্দী এবং উর্দ্দু দুটি হরফেই চলতে পারে। কে কোন্ হরফে পড়বে তা নির্ভর করবে শিক্ষার্থিদের উপর।

৭। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পড়া শেষ করার সময় কোন বাইরের পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। স্কুলের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ভিত্তিতে বিদ্যালয় পরিত্যাগ-পত্র দেওয়া যেতে পারে।

প্রথম চারটি সিদ্ধান্তের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া উচিত। বুনিয়াদী শিক্ষাকে 'কর্ম্মকেন্দ্রিক' আখ্যা দিয়ে 'শিল্প' ও 'কর্ম্ম'কে সগোত্র করে দেওয়া এই প্রথম। খের কমিটি বিশেষভাবে বলেই ছিল যে নীচের শ্রেণীগুলোতে বৈচিত্র্যপূর্ণ একাধিক কর্ম্মই (activity) হবে শিক্ষার প্রধান বাহন। আর মূল শিল্প (basic craft) আসবে পরে। তারপরে কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষার ন্যূনতম কালকে আট বছরের জায়গায় কমিয়ে পাঁচ বছর করে দিল। ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা থেকে খের কমিটির এই সব সুপারিশের পার্থক্য লক্ষ্য করবার মত। আর তা ছাড়া মূল ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনায় যে শিক্ষাকাল নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল সাত বছরের জন্য (বছর ৭—১৪), খের কমিটি তাকে বাড়িয়ে ৮ বছর করে দিল এবং লেখাপড়া আরম্ভ করার বয়স নির্দ্ধারিত হল ৬ বছরে।

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি খের কমিটির রিপোর্টটি নিয়ে আলোচনা করে। তারপর আবার শ্রীখেরেরই সভাপতিত্বে আর একটি কমিটি গঠন করে এই নবগঠিত দ্বিতীয় কমিটির উপর বুনিয়াদী শিক্ষার সহিত মাধ্যমিক শিক্ষার যোগসূত্র কোথায়, বুনিয়াদী শিক্ষার অর্থসংগ্রহ কি ভাবে হতে পারে ইত্যাদি বিষয় অনুসন্ধান করবার জন্য পুনরায় নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। এই কমিটি সুপারিশ করে যে ৬—১৪ এই আট বছরের জন্যই বুনিয়াদী

শিক্ষার ন্যূনতম কাল নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। কিন্তু পুরো আট বছরকে ভেঙ্গে দুটো স্তরে ভাগ করা হল—(১) নিম্ন বুনিয়াদী স্তর (বয়স ৬—১১) ; এবং (২) উচ্চ বুনিয়াদী স্তর (১২—১৪)। ১১ বছরের শেষে পঞ্চম শ্রেণীর পর কোন শিক্ষার্থী বুনিয়াদী বিদ্যালয় পরিত্যাগ করতে চাইলে তা সে করতে পারবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি ১৯৪০ সালের মে মাসে সিমলায় অনুষ্ঠিত এক অধিবেশনে খের কমিটির দ্বিতীয় প্রস্তাবকেও গ্রহণ করে।

আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে খের কমিটি দুবার বুনিয়াদী শিক্ষা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেছে। এই দুবারেরই অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদির পর তাঁরা যে সমস্ত প্রস্তাব করেন, কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি সেগুলো মোটামুটিভাবে গ্রহণ করে এবং ১৯৪৪ সালে যুদ্ধোত্তর ভারতের জন্য যে চূড়ান্ত শিক্ষা পরিকল্পনা প্রকাশ করে তার মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে এই দুটি কমিটির প্রস্তাবই গৃহীত ও অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৪ সালের প্রকাশিত যুদ্ধোত্তর শিক্ষা পরিকল্পনাই সাধারণতঃ সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনা নামে পরিচিত, কারণ স্যার জন সার্জ্জেণ্ট ছিলেন এই কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি। এইভাবে শেষ পর্য্যন্ত বুনিয়াদী শিক্ষা ইংরেজ সরকারের শিক্ষা-বিশেষজ্ঞদের দ্বারাও প্রাথমিক স্তরের জন্য উপযুক্ত এবং ফলপ্রসূ শিক্ষাব্যবস্থা বলে পারগণিত হয় এবং যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে গৃহীত হয়।

কিন্তু ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনাকে তাঁরা পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি—একটু পার্থক্য লক্ষ্য করবার মত। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মূল রিপোর্টটি থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করছি—

Basic (Primary and Middle) education, as envisaged by the Central Advisory Board, embodies many of the educational ideas contained in the original Wardha Scheme, though it differs from it in certain

important particulars. The main principle of 'learning through activity' has been endorsed by the educationists all over the world. At the lower stages the activity will take many forms, leading gradually upto a basic craft or crafts suited to the local conditions. So far as possible the whole of the curriculum will be harmonised with this general conception. The three R's by themselves can no longer be regarded as an adequate equipment for efficient citizenship. *The Board however are unable to endorse the view that education at any stage and particularly in the lowest stages can or should be expected to pay for itself through the sale of articles produced by the pupils.* The most which can be expected in this respect is that sales should cover the cost of the additional materials and equipment required for practical work.

বিদ্যালয়ের অর্থকরী বিষয়ে ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনার সঙ্গে সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনার এই যে প্রভেদ এতে নূতনত্ব কিছু নেই। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে হরিপুরায় কংগ্রেস অধিবেশনেও ওয়ার্দ্ধায় গৃহীত অর্থকরী বিষয়ক চার নম্বর প্রস্তাবটিকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতিও এই নীতিকে সমর্থন করায় বিষয়টির যৌক্তিকতা আরও বাড়ে এবং লোকের মন থেকে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে অকারণ আশঙ্কা অপসারিত হবার সম্ভাবনা বেশী হয় মাত্র।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির মতামত কেন্দ্রীয় সরকার এবং অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারও মেনে নেয় এবং কোন কোন প্রাদেশিক সরকার ১৯৪৬-৪৭ সাল থেকেই এই শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করার জন্য

পরিকল্পনা গ্রহণ করতে থাকে। কোন কোন প্রাদেশিক সরকারের অনুরোধে কেন্দ্রীয় বোর্ড একটি বুনিয়াদী পাঠ্যতালিকা নির্ম্মাণ এবং শিক্ষকদের জন্য একটি শিক্ষণ ব্যবহারিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটি জুন মাসে প্রথম কাজ আরম্ভ করে এবং জাকীর হোসেন কমিটির রিপোর্ট ও সার্জ্জেন্ট কমিটির রিপোর্ট—এই দ্বিবিধ রিপোর্টের আলোকে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন করে মূল নীতিগুলো ঘোষণা করে। দেখতে পাওয়া যায় কমিটির ধারণা এই যে—বিদ্যালয়ে খরচ নির্ব্বাহের প্রশ্নটি ছাড়া আর কোন বিষয়ে জাকীর হোসেন কমিটির সঙ্গে সার্জ্জেন্ট কমিটির রিপোর্টে কোন মতানৈক্য নেই। এই কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষা কমপক্ষে আট বছরের জন্য হওয়া উচিত এই মত সমর্থন করেন এবং তদনুযায়ী প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত আট বছরের জন্য একটি পাঠ্যতালিকা নির্ম্মাণ করেন। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এই পাঠ্যতালিকা গৃহীত হয়। শিক্ষণ ব্যবহারিকাটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৬ সালে।

পশ্চিম বাংলায় সরকারী প্রচেষ্টায় বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ আরম্ভ হয় ১৯৪৮ সালে। তারও ছয় বছর পরে ১৯৫৪ সালে ত্রিপুরায় এই শিক্ষার কাজ আরম্ভ হয়। মাত্র পাঁচ বছরের কাজের উপর ভিত্তি করে কোন শিক্ষানীতি অথবা পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত নয়। যে কথা প্রত্যেকটি বুনিয়াদী শিক্ষা-কর্ম্মীকে মনে রাখতে হবে এবং যে কথা একাধিকবার পুঁথি-পুস্তিকায়, সভামঞ্চ থেকে বলা হয়ে থাকে, তা হচ্ছে এই যে বুনিয়াদী শিক্ষার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসে নি। সমস্ত বিষয়টিই পরীক্ষামূলকভাবে অনুসৃত হচ্ছে। একটি গতিশীল শিক্ষানীতির যা বৈশিষ্ট্য বুনিয়াদী শিক্ষারও তাই। পরীক্ষামূলক কাজ এবং সন্ধানী অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে একে রূপদান করলে এর

শিক্ষানীতি এবং পদ্ধতি একদিন পূর্ণতা লাভ করবে এই আশা করা অযৌক্তিক নয়।

বুনিয়াদী শিক্ষার ক্রমপরিণতি

হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা, বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ আরম্ভ, প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকারসমূহের পদত্যাগ এবং তারপরে তদানীন্তন ভারত সরকারের শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ড কর্ত্তৃক বুনিয়াদী শিক্ষার সারবত্তা উপলব্ধি এবং চূড়ান্তভাবে এই শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করা—এ সবই আমরা আলোচনা করেছি। এবং সেখানে মনে হতে পারে যে ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস মন্ত্রিত্বের বিদায়ের পর থেকে কেবলমাত্র যেন সরকারী প্রচেষ্টায়ই বুনিয়াদী শিক্ষা জীবিত রয়েছে। কিন্তু আসলে তা নয়—ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করার উদ্দেশ্যে আমরা হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের কার্য্যাবলী নিয়ে আগে কোন বিস্তৃত আলোচনা করি নি। সেই আলোচনা আমরা এখানে করছি এবং এই প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পাব কেমন করে বুনিয়াদী শিক্ষা ধীরে ধীরে ক্রমপরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। শিক্ষার পরিপূর্ণতার জন্য এই বিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল।

বুনিয়াদী শিক্ষার ক্রমবিবর্ত্তনের এই ধারাটি অনুসরণ করতে হলে আমাদের প্রধানতঃ তিনটি বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৯৩৯ সালে অক্টোবর মাসে পুনায় প্রথম বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কয়েকটি প্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ আরম্ভ হয়—এ কথা আমরা আগে বলেছি। এই কাজ আরম্ভ হওয়ার পর শিক্ষানীতি, শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষা-সংগঠন ইত্যাদি নিয়ে নূতন কর্ম্মিদের সামনে স্বভাবতঃই অনেক সমস্যা উপস্থিত হয়। বিভিন্ন

প্রথম সম্মেলন

প্রদেশের কর্ম্মরত শিক্ষাব্রতিদের নিয়ে একটি সম্মেলন আহ্বান করলে পরস্পর ভাব বিনিময়ের সুযোগ আসবে এবং প্রত্যক্ষ কাজের আলোকে অনেক সমস্যার সমাধান হবে—এই আশা নিয়ে বোম্বাই সরকারের আহ্বানে এই প্রথম সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। কাশ্মীরের তদানীন্তন শিক্ষা-অধিকর্তা শ্রী কে, জি, সৈদিন এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন।

গত দেড় বছর ধরে কাজের ফলে যে সব প্রশ্ন এসেছে সেগুলো নিয়ে তিন দিন আলোচনা হয়। এই আলোচনার সংক্ষিপ্তসার ১৪টি সিদ্ধান্তের আকারে সাধারণ সম্মেলনে উপস্থাপিত হয় এবং সেগুলো গৃহীত হয়। ১৪টি সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই ঃ—

১। খুব গোড়ার দিক থেকেই ইংরেজী চালু করার ফলে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ; শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ভারতীয় ভাষাগুলো বিকাশ লাভের সুযোগ পায় নি এবং জোর করে বিদেশী ভাষা চাপাবার ফলে শিক্ষার্থিদের লেখা-পড়াও পিছিয়ে পড়েছে। এই সম্মেলন প্রস্তাব করে যে পুরো সাত বছর লেখাপড়া করার আগে শুধুমাত্র বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে নয়—ভারতের কোন বিদ্যালয়েই যেন ইংরেজী পড়ানোর কাজ আরম্ভ না করা হয়।

২। বুনিয়াদী শিক্ষা আশাপ্রদ উন্নতি লাভ করেছে এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এই কথা বলা যায় যে, এই শিক্ষার ফলে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সাধিত হবে।

৩। দেশের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির জন্য বুনিয়াদী শিক্ষার গুরুত্ব এত বেশী যে, রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তনের মধ্যেও এর কাজকে অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া উচিত ; আর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলকভাবে সাত বছরের জন্য এই শিক্ষার প্রবর্ত্তন করতে হলে যে বিপুল অর্থসম্পদের প্রয়োজন, দেশের

পুনর্গঠনকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের সেই ব্যয়ভার বহন করাও অবশ্য কর্ত্তব্য।

৪। বুনিয়াদী শিক্ষকদের শিক্ষণকাল কমপক্ষে এক বছর হওয়া উচিত এবং এই সময়ের মধ্যে কোন ছেদ পড়বে না।

৫। শিক্ষকদের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য চেষ্টা করতে হবে যাতে তাঁরা গ্রাম্য ভারতের বিশেষ সমস্যাসমূহের সমাধানে সক্ষম হন।

৬। যে সব এলাকায় বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ খুব দ্রুত প্রসার লাভ করছে, সেই সব জায়গায় সুনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষামূলক কয়েকটি বিদ্যালয় খোলা প্রয়োজন। এই সব বিদ্যালয়ে যে পরীক্ষামূলক কাজ হবে তার ফলাফল কাজের অগ্রগতির জন্য অন্যান্য স্কুলকেও দেওয়া উচিত।

৭। গ্রাম এবং সহর এলাকার শিক্ষকদের একই শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে ট্রেনিং নিতে হবে—এর ফলে কাজের একাত্মতাবোধ বাড়বে।

৮। চারুশিল্প-শিক্ষার উপর প্রত্যেক শিক্ষণ-কেন্দ্রে ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, কারণ চারুশিল্প শিল্পকাজের (crafts) একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৯। বুনিয়াদী শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানসমূহে যে কাজ চলছে তারই আলোকে শিক্ষণ কাজকে আরও প্রণালীবদ্ধ এবং সংগঠিত করা প্রয়োজন। একমাত্র প্রত্যক্ষ কাজের অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষণ কাজের সফল পরিণতি সম্ভব হতে পারে।

১০। গত দুই বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় যে শিক্ষাগত দিক থেকে সমবায় পদ্ধতিতে পাঠদান (method of correlated teaching) ফলপ্রসূ হবে।

১১। এই সমবায় পদ্ধতি কখনও জোর করে চাপান উচিত নয়; সমস্ত পাঠ্য বিষয় যে কেবলমাত্র শিল্পের সঙ্গেই সম্বন্ধিত

হবে এমন কোন কথা নেই। শিশুর প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সম্বন্ধিত করেও পাঠদানের কাজ চলতে পারে। শিশুর অভিজ্ঞতা বাড়াবার পক্ষে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের অবদান কম নয়।

এই শিক্ষা-পরিকল্পনাকে পূর্ণভাবে কার্য্যকরী করে তুলতে হলে প্রত্যেক শিক্ষককে শিল্পশিক্ষকের ভূমিকাও গ্রহণ করতে হবে—তার জন্য প্রয়োজন শিল্প বিষয়ে ট্রেনিং। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে মামুলী শিক্ষকদের সঙ্গে কয়েকজন কারিগর জুড়ে দিলেই বুনিয়াদী শিক্ষা হয় না।

১২। বিদ্যালয়ের জন্য কোন শিল্প নির্ব্বাচনের সময় পরিবেশের পেশা এবং জীবিকার প্রশ্নটি বিবেচনা করতে হবে। পরিবেশে কি কি হস্তশিল্প আছে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই শিল্প নির্ব্বাচন করতে হবে।

১৩। শিশুদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রী করবার সুবিধা কতটুকু তা নির্দ্ধারণ করবার জন্য বিদ্যালয়, তার চারপাশ, আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের প্রয়োজন কতটুকু সে সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা পেতে হবে। এই অনুসন্ধানের পরই উৎপাদনের সীমারেখা নির্দ্ধারিত হবে।

১৪। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে দৈনন্দিন কাজ কেমন চলছে তা লক্ষ্য করবার জন্য বিশেষ একটি আঞ্চলিক ভিত্তিতে শিক্ষা-পরিদর্শক নিযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক-এক জন পরিদর্শকের এলাকা ততটুকুই হবে যতটুকু হলে পরিদর্শনকাজ ভালভাবে হতে পারে। **এই পরিদর্শকের সঙ্গে শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন।** পরিদর্শককে অবশ্যই শিক্ষা এবং শিল্প বিষয়ে ট্রেনিংপ্রাপ্ত হতে হবে এবং যদি প্রথম অবস্থায় এইরূপ পরিদর্শক না পাওয়া যায় তা হলে প্রত্যেক

এলাকার জন্য মামুলী শিক্ষা-পরিদর্শক ব্যতীত আর একজন শিল্প-পরিদর্শকও নিযুক্ত করতে হবে।

শিক্ষার দিক থেকে বিশেষ করে ১০ ও ১১নং এবং পরিদর্শনের দিক থেকে ১৪নং সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

এই অধিবেশনের আগে পর্য্যন্ত কেবলমাত্র শিল্পকেই শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র বলে বিবেচনা করা হত এবং মূল শিল্পকে কেন্দ্র করেই যা কিছু পাঠ-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হত। একমাত্র শিল্পকে কেন্দ্র করে পাঠ পরিকল্পনা রচিত হলে বিদ্যালয়ের শিক্ষাগত দায়িত্ব পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিপালিত হতে পারে না—পাঠ্য বিষয়ের অনেক অংশই তা হলে বাদ চলে যেতে বাধ্য। কাজেই শিশুর প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে গ্রহণ করে বুনিয়াদী শিক্ষার ভিত্তিভূমিকে বিস্তৃততর করার এই যে বিজ্ঞানসম্মত প্রচেষ্টা—প্রথম সম্মেলনের এটি একটি বিশিষ্ট অবদান। এর ফলে শিক্ষার পরিধি প্রসারিত হয়েছে এবং সম্বন্ধিত পদ্ধতিতে পাঠ-পরিকল্পনার কাজ অনেক সুগম হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যে ১৯৩৯ সালেই গ্রহণ করা হয়েছিল এ খবর অনেকে রাখেন না এবং বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে বক্র কটাক্ষ করবার সময় বলেন যে, প্রথম উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র শিল্প দিয়ে বিদ্যালয়গুলোকে কারখানা তৈরী করা—তারপর অবস্থার চাপে পড়ে শিল্পের সঙ্গে পরিবেশকেও যোগ করে দেওয়া হয়। আসলে কথাটি মোটেই তা নয়—বুনিয়াদী শিক্ষাবিদগণ প্রথম থেকেই পরিবেশের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং শিক্ষা যে কেবলমাত্র শিল্পের সঙ্গেই সম্বন্ধিত হবে এমন কথা বলেন নি। সর্ব্বভারতীয় সম্মেলনে তাঁরা এই বৈশিষ্ট্যকে একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়ে গ্রহণ করার ফলে বুনিয়াদী শিক্ষার জ্ঞানমুখী তাৎপর্য্য আরও বেড়ে যায়।

আর একটি কথা হচ্ছে এই যে, সম্বন্ধিত পাঠদান যে কোন

অবস্থায়ই জোর করে চাপান উচিত নয় সে কথাও এখানে বলা হয়েছে। খুব সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে যা সম্বন্ধিত পদ্ধতিতে পড়ান সম্ভব, তাই শুধু ঐ পদ্ধতিতে পড়ান যেতে পারে। সাঙ্গীকরণ কখনও কষ্টকল্পিত হতে পারে না।

১৪ নং সিদ্ধান্তটিও যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা সহজেই বোঝা যায়। বুনিয়াদী শিক্ষাকে যদি দাঁড় করাতে হয় তা হলে এর শিল্পশিক্ষা, সাঙ্গীকৃত পাঠ পরিকল্পনা এবং সর্ব্বাত্মক পাঠ পরিকল্পনা—প্রত্যেকটি জিনিসের নিখুঁত এবং বিশদ বিবরণ প্রত্যেকটি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে থাকা প্রয়োজন। ট্রেনড্ শিক্ষকের অভাবে এ হেন নিশ্ছিদ্র পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়তো সব বুনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তখন স্কুল পরিদর্শক এই কাজে স্কুলগুলোকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারেন; এবং বিদ্যালয় পরিদর্শকের এই যে প্রধান কাজ একথা আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান স্বীকার করে। এইজন্য প্রস্তাবটিতে পরিদর্শককে শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলা হয়েছে।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে—প্রথম সম্মেলনের পর হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ থেকে One Step Forward নামে যে বইখানি প্রকাশিত হয়েছিল তাতে এই সম্মেলনের সব উল্লেখ-যোগ্য তথ্যাদি ও প্রস্তাবাবলী লিপিবদ্ধ আছে।

দ্বিতীয় সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪১ সালে এপ্রিল মাসে দিল্লীর জামিয়া নগরে। এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন ডাঃ জাকীর হোসেন। উদ্বোধনী ভাষণে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ যে কথা বলেছিলেন তার খানিকটা অংশ নীচে উদ্ধৃত করছি—

দ্বিতীয় সম্মেলন

"........We are trying to make the children 'learn by doing', and this is particularly helpful and useful

in the earliest stages. But in later years the use of books cannot altogether be eliminated. We are used to a certain class of books which are prescribed as text books. I do not think they can serve the purpose of our basic schools. *We have to create literature for our schools.....*" এই ভাষণের পর সতের বছর পার হয়ে গেছে ; তবু আশ্চর্য্য এই যে, অনেক লোক এখনও মন্তব্য করেন যে বুনিয়াদী শিক্ষায় নাকি বইয়ের স্থান নিতান্তই গৌণ।

এই অধিবেশনে প্রধানতঃ তিনটি আলোচনার বিষয় ছিল—(১) বুনিয়াদী পাঠ্যতালিকা, (২) সম্বন্ধিত পদ্ধতিতে পাঠদান এবং (৩) শিক্ষকদের শিক্ষণ সমস্যা। অধিবেশনে মোট এগারটি প্রস্তাব গৃহীত হয় ; তার মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য চারটি আমরা এখানে বিবৃত করছি—

১। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী বুনিয়াদী বিদ্যালয় থেকে যে সব রিপোর্ট এসেছে তাতে দেখতে পাওয়া যায় যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থিদের স্বাস্থ্য, স্বভাব-আচরণ এবং লেখাপড়ায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিশুরা সাধারণতঃ অধিকতর কর্ম্মদক্ষ, আনন্দ-চঞ্চল এবং আত্মবিশ্বাসী হয় ; তাদের আত্মপ্রকাশ-ক্ষমতা, যৌথ কর্ম্মপ্রচেষ্টায় আগ্রহ সুন্দর বিকাশ লাভ করেছে এবং সামাজিক সঙ্কীর্ণতা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কোন নূতন শিক্ষাব্যবস্থাকে রূপ দেবার প্রাথমিক পর্য্যায়ে অপরিহার্য্য যে সব বাধা-অসুবিধা আসে, সে সব বিচার করে এই কথা বলা যায় যে কাজের যতটুকু বিবরণ পাওয়া গেছে তাতে এই শিক্ষার উজ্জ্বল সম্ভাবনার ইঙ্গিতই সুস্পষ্টভাবে বর্ত্তমান।

২। এ কথা বেশ জোরের সঙ্গে বলা যেতে পারে যে এই শিক্ষার উন্নতির জন্য খুব বিচক্ষণ এবং সংবেদনশীল পরিদর্শন-কাজের প্রয়োজন। যে সব প্রতিষ্ঠান বুনিয়াদী বিদ্যালয় পরিচালনা করছেন তাঁদের অনতিবিলম্বে সমস্ত পরিদর্শকদের জন্য শিক্ষণের বন্দোবস্ত করা উচিত—যাতে করে পরিদর্শকরা এই শিক্ষার ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন এবং প্রয়োজনবোধে কার্য্যরত শিক্ষকদের পরিচালনা করতে পারেন।

৩। বিভিন্ন স্থানের কার্য্যবিবরণী থেকে সহজেই প্রমাণিত হয় যে সম্বন্ধিত পদ্ধতিতে পাঠদান বাঞ্ছনীয় এবং এর সম্ভাবনাও সমধিক। কিন্তু একটি কথা সব সময় মনে রাখা দরকার যে এই পদ্ধতি যেন কোন সময়ই কষ্টকল্পিত অথবা সুদূরপ্রসারী না হয় এবং শিল্পের সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার আর দুটি কেন্দ্র প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশও যেন শিক্ষা পরিকল্পনায় অনুসৃত হয়।

৪। বুনিয়াদী পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী প্রথম পাঁচটি ক্লাশে ভালমত কাজ করতে হলে প্রত্যেক বুনিয়াদী শিক্ষককে কমপক্ষে অন্ততঃ দু বছরের ট্রেনিং নেওয়া দরকার। এই ট্রেনিং এক-সঙ্গেও হতে পারে অথবা মাঝখানে বিরতিও থাকতে পারে।

প্রথম সম্মেলনের প্রস্তাবে আমরা এক বছরের ট্রেনিংএর কথা শুনেছিলাম। দ্বিতীয় সম্মেলনে মেনে নেওয়া হচ্ছে যে দু বছর না হলে বেসিক ট্রেনিংএর কাজ ভালভাবে শেষ করা যায় না এবং ফলে শিক্ষক শিক্ষণ কাজে অসম্পূর্ণতা থেকে যায়।

বিশ্বব্যাপী মহাসমর তখন আরম্ভ হয়ে গেছে। ভারতের রাজনৈতিক আকাশেও ধীরে ধীরে মেঘ জমতে লাগল। ক্রমশঃ স্বাধীনতা-সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি, ভারত ছাড় আন্দোলন, গান্ধীজী এবং অন্যান্য জাতীয় কর্ম্মিদের কারাবরণ ইত্যাদির ফলে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ প্রত্যাশিত

অথবা পদ্ধতি সম্বন্ধে আর কোন রদবদল হয় নি। এই সব সম্মেলনের অধিকাংশতেই পাঠ্যসূচী, শিল্পশিক্ষা, শ্রেণী-সংগঠন, পরীক্ষা-গ্রহণ ইত্যাদি সাংগঠনিক বিষয়ে পূর্ণতা লাভের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা হয়েছে। অবশ্য এখন বুনিয়াদী শিক্ষার উন্নতিকল্পে কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ সাধারণতঃ সরকারী বিভাগ থেকেই নেওয়া হয়, কারণ সরকার বুনিয়াদী শিক্ষাকে প্রাথমিক স্তরের জন্য জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বলে গ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বুনিয়াদী শিক্ষার কথা

বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ যে আমাদের দেশে মাত্র অল্প কয়েক বছর যাবৎ আরম্ভ হয়েছে এ কথা আমরা পূর্ব্বে বলেছি। নূতন জিনিস সম্বন্ধে সাধারণ লোকের প্রায়ই সঠিক ধারণা থাকে না—বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে যদি কোন নূতনত্ব আসে তা হলে সাধারণ লোকের পক্ষে শঙ্কিত হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। নূতনত্বের নামে শিক্ষাক্ষেত্রে যদি কোন ভুল প্রবেশ করে তা হলে সেই ভুলের মাশুল দিতে হবে একদিন সমস্ত জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের। তা ছাড়া, বুনিয়াদী শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি শেষ পর্য্যন্ত কেমন হবে সে কথা এখনও কেউ জোর দিয়ে বলতে পারেন না, কারণ সমস্ত বিষয়টিকেই পরীক্ষামূলক দৃষ্টি নিয়ে বিচার করা হচ্ছে। এই সব কারণে অনেকেই বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথা বলেন ; এমন কি বেশীর ভাগ সময় অপব্যাখ্যাই করা হয়। কাজেই বুনিয়াদী শিক্ষা বলতে আসলে কি বোঝায় সেই কথাটি পরিষ্কার করে বলার প্রয়োজনীয়তা আছে।

বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের সঠিক ধারণা পেতে হলে মূলতঃ দুটি জিনিসের ওপর নির্ভর করতে হবে। প্রথমটি হচ্ছে জাকীর হোসেন কমিটির রিপোর্ট ; দ্বিতীয়টি হচ্ছে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির মতামত। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি বিভিন্ন সময়ে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেছে এবং একাধিক রিপোর্টে আপনার মতামত ব্যক্ত করেছে। এই দুই দিকের আলোচনা এবং মতামত ব্যক্ত করে যে সমস্ত কাগজপত্র বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে, বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথ্য পেতে হলে আমাদের সেই সব রচনার উপরই বেশী নির্ভর করতে হবে। এ ছাড়া গান্ধীজীর

নিজস্ব মৌলিক রচনা এবং তার টীকা-ভাষ্য ইত্যাদি সেবাগ্রাম হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ থেকে পরবর্ত্তী সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। আজকাল কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তর থেকেও এই বিষয়ে একাধিক পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করা হচ্ছে।

বুনিয়াদী শিক্ষার প্রধানতঃ দুটি স্তরবিভাগ করা হয়েছে—(১) নিম্ন বুনিয়াদী এবং (২) উচ্চ বুনিয়াদী। এ ছাড়া, প্রাক্-বুনিয়াদী, উত্তর-বুনিয়াদী, পল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষা ইত্যাদি স্তরও যে আছে তা আমরা আগেই বলেছি। কিন্তু এই সব স্তরে ব্যাপকভাবে হাতেকলমে কাজ আরম্ভ না হওয়ার জন্যে আপাততঃ এই স্তরগুলোকে আমাদের আলোচনার বাইরে রাখা সমীচীন মনে করছি। তা ছাড়া, বুনিয়াদী শিক্ষাকে উচ্চ মাধ্যমিক অথবা উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষা বলে গ্রহণ করা হয় নি। কাজেই আমরা আলোচনা নিম্ন এবং উচ্চ বুনিয়াদী এই স্তর দুটিতেই সীমায়িত রাখছি।

(১) প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষার নাম হচ্ছে নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা। যে শিশুরা এই স্তরের অন্তর্গত তাদের বয়স হচ্ছে ৬ থেকে ১১ বছর। এই স্তরের শিক্ষারই আর এক পুরান নাম হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। দেশের সর্ব্বত্র একসঙ্গে নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা চালু করা সম্ভব নয় বলে বর্ত্তমানে আমরা নিম্ন বুনিয়াদী এবং প্রাথমিক শিক্ষা দুটোই পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি। (২) ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী এই তিন শ্রেণী নিয়ে হবে উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষার রূপ। এই স্তরের শিক্ষার্থিদের বয়স হবে ১২ থেকে ১৪।

এখানে আমাদের একটি কথা মনে রাখা দরকার। গান্ধীজী যখন প্রথম বুনিয়াদী শিক্ষার কথা বলেছিলেন, তখন তিনি এই শিক্ষাকালকে একটি অভগ্ন অবিচ্ছিন্ন শিক্ষাস্তর বলেই মনে করতেন—সকলে সাত বছর একটানা বুনিয়াদী শিক্ষা পাবে এই ধারণাই তাঁর ছিল। ওয়ার্দ্ধায় প্রথম শিক্ষা সম্মেলনে এই প্রস্তাব পাশ হয়েছিল এবং

হরিপুরায় কংগ্রেস অধিবেশনও একে গ্রহণ করে। কিন্তু 'খের কমিটি' এই অবিচ্ছিন্ন শিক্ষাকালটিকে ভেঙ্গে দুটি স্তরে পরিণত করল; এবং বয়সের দিক থেকেও ৭—১৪ বছরের পরিবর্ত্তে ৬—১৪ বছর করে শিক্ষাকালকে এক বছর বাড়িয়ে দিল। শিক্ষাকাল বাড়ানোতে কোন ক্ষতি হয়নি—কিন্তু একটানা আট বছরের পরিবর্ত্তে পাঁচ ও তিন বছরের যথাক্রমে নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদী এই দুটি আলাদা স্তর সৃষ্টি করা বুনিয়াদী শিক্ষার পক্ষে সামগ্রিকভাবে কল্যাণপ্রসূ হয়েছে কিনা তা ভেবে দেখবার বিষয়। এই ব্যবস্থাতে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। এই নিয়মের ফলে যে কোন শিক্ষার্থী বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়ে সেই স্কুল পরিত্যাগ করতে পারে এবং গতানুগতিক কোন স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে গিয়ে ভর্ত্তি হতে পারে। এর ফলে প্রকারান্তরে উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষাকাজ ভালমত চলতে পারে না এবং বুনিয়াদী শিক্ষার সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে শিল্পকাজের ক্ষতি হয় সব থেকে বেশী। একথা বোধ হয় সকলেই জানেন যে নিম্নবুনিয়াদী স্তরে শিল্পকাজ এবং উৎপাদন খুব ব্যাপকভাবে হতে পারে না। এই স্তরকে শিল্পকাজের প্রস্তুতিপর্ব্ব বলা যেতে পারে। এই সময় সব জিনিসটাই শিশুর কাছে নূতন থাকে এবং তার বয়সও খুব কম থাকে। কাজেই এই সময় সব জিনিস দেখেশুনে সে সঠিক ধারণা করবে, যন্ত্রপাতি চিনবে, এবং ধীরে ধীরে অভ্যাসের মধ্য দিয়ে শিল্পকাজে দক্ষতা লাভ করবে—এই হচ্ছে স্বাভাবিক। তারপর উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে যখন তার বয়স বাড়বে, পেশীসমূহ দৃঢ়তর হবে, কাজের অভ্যাসও দীর্ঘতর হবে, তখনই কেবল সে ব্যাপকভাবে উৎপাদনাত্মক কাজে মনোনিবেশ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বুনিয়াদী শিক্ষার উৎপাদনাত্মক সম্ভাবনাকে যাচাই করে দেখবার প্রকৃত সময় হচ্ছে উচ্চ বুনিয়াদী স্তর এবং এই যাচাই করা তখনই যুক্তিসঙ্গত হবে যখন বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ প্রথম থেকে অষ্টম

শ্রেণী পর্য্যন্ত আট বছরের জন্য একটানা প্রসারিত হবে। কিন্তু পঞ্চম শ্রেণীর পরই স্থানান্তরের সুবিধা থাকার ফলে বর্ত্তমানে এই নূতন শিক্ষার কাজ অনেক ক্ষেত্রেই পূর্ণাঙ্গ হতে পারছে না। যতদিন পর্য্যন্ত দেশে প্রচুর সংখ্যক উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত না হচ্ছে এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে (elementary education) বাধ্যতামূলকভাবে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত প্রসারিত না করা হচ্ছে, ততদিন পর্য্যন্ত বুনিয়াদী শিক্ষার এই অর্দ্ধপথ পরিক্রমার দুর্ভাগ্য বোধ হয় শেষ হবে না।

সে যা হোক্, বর্ত্তমানে স্থির হয়েছে যে আগের প্রাথমিক শিক্ষা আর রাখা হবে না—এবং নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা (৬—১১ বছর) তার স্থান গ্রহণ করবে। তা ছাড়া, অদূর ভবিষ্যতে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে এবং আশা করা যায় প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত (৬—১৪ বছর) সমস্ত শিক্ষাই আবশ্যিকভাবে বুনিয়াদী শিক্ষায় রূপান্তরিত হবে। এ কাজ এখনও শেষ হয়নি; পরিকল্পনা কমিশন ১৯৫৩ সালে এই প্রসঙ্গে যে কথা বলেছে তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—"In recent years basic education has been accepted as the pattern for children in the age-group 6-14; but work in this direction has only just begun.....by and large, teaching continues on the old lines and practically the entire task of remodelling the system still remains to be done." কাজেই শেষ পর্য্যন্ত যে একদিন চৌদ্দ বছর পর্য্যন্ত বুনিয়াদী শিক্ষা প্রসারিত হবে—একথা বলা যায়। ঐরূপ অবস্থায় আর কোন মাধ্যমিক, জুনিয়ার হাই ইত্যাদি স্কুল থাকবে না। কাজেই বুনিয়াদী শিক্ষার গুরুত্ব যে সমধিক একথা বলাই বাহুল্য। এই সব কারণেই বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি এবং পদ্ধতি সম্বন্ধে ভুল ধারণা দূর করার জন্য আমরা এখানে আলোচনার অবতারণা করছি।

বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য কি ? স্কুলগুলোর উদ্দেশ্য কি—ছেলেমেয়েরা যাবে কেন সেখানে? এই প্রশ্নের জবাবে অনেকে অনেক কথা বলবেন। কেউ বলবেন লেখাপড়া শিখতে যাবে—লেখাপড়া না শিখলে খাবে কি? যা দিনকাল পড়েছে, লেখাপড়া না শিখলে দাঁড়াবে কোথায়? কথাটা একদিক দিয়ে ঠিক—কিন্তু সর্ব্বতোভাবে ঠিক নয়। লেখাপড়া করে যে, গাড়ীঘোড়া চড়ে সে—এই কাব্যঘুষ দুরন্ত শৈশবে আমরা প্রায় সবাই পেয়েছি। কিন্তু লেখাপড়া করব কেবলমাত্র পেট ভরাবার জন্য, পকেট ভারী করবার জন্য, গাড়ী-বাড়ী করবার জন্য এবং চোখ বোজবার আগে ধনকুবের নাম রাখবার জন্য—এই কি সব? শিক্ষার এটুকুই শেষ কথা? জীবনে কেবলমাত্র খেয়ে বাঁচবার জন্যই শিক্ষা একথা কেউ মেনে নিতে পারে না—বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-নেতাজী এঁদের জীবনকাহিনী এই কথা বলে না। অর্থকরী ও বৃত্তিমূলক উদ্দেশ্য ছাড়া শিক্ষার যে আরও মহান্ লক্ষ্য রয়েছে—আত্মিক উন্নতি, নৈতিক উৎকর্ষতা, সমাজসেবা ইত্যাদিও যে শিক্ষার অন্যতম অবদান—আদর্শবাদের কথা বলতে গিয়ে আমরা একথা সব সময়ই স্বীকার করি। অর্থকরী উদ্দেশ্য লেখাপড়ার একটিমাত্র দিক—সব নয়। অনেকে আবার বলেন যে লেখাপড়া শিখি মানুষ হবার জন্য—সুস্থ দেহ ও মন নিয়ে বাঁচতে হলে লেখাপড়ার প্রয়োজন। অনেকে বলেন চরিত্র গঠনই লেখাপড়ার প্রধান উদ্দেশ্য। মানুষ সব সময় দেবত্বস্পর্দ্ধী—তার অন্তরের সম্পদকে জাগ্রত করে উন্নত জীবনযাপনের জন্যই শিক্ষার দরকার। কথাগুলো আংশিক সত্য; লক্ষ্য করলে দেখব যে এতে আবার জীবনের বাস্তব ব্যবহারিক দিকটিকে অবহেলা করা হয়েছে। মানুষ রুটির জন্যই কেবল বেঁচে থাকে না—একথা যেমন সত্য, একথাও ঠিক তেমনি সত্য যে রুটি

না হলে সে বাঁচতেও পারে না। দুটিরই প্রয়োজন আছে। আর একদল হয়তো বলবেন নাগরিক শিক্ষাই লেখাপড়ার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—দেশে ভাল লোক নেই—দরদী নাগরিকের একান্ত অভাব—সবাই যার যার নিজের ভাবনায় বিভোর; কাজেই সুনাগরিক তৈরী করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। এর পর নিছক জ্ঞানসাধনার কথা তো আছেই। মানুষের দেহের ক্ষুধাটাই সব নয় —তার রয়েছে মননশীলতা, মেধা, ধীশক্তি, অনন্ত জিজ্ঞাসা। এর পরিতৃপ্তির জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন। তা না হলে তার মস্তিষ্কচর্চ্চা ও জ্ঞানপিপাসার তৃপ্তি হবে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—নিখিল বিশ্বের প্রাণকেন্দ্রে ধ্বনিত হচ্ছে এক অনন্ত রাগিণী—অপূর্ব্ব ঐকতান। 'সাগরের জলে গগনের গায়' নিয়ত প্রতিধ্বনিত এই মহাসংগীতের কখনো ছন্দোপতন হয় না। বিশ্ববীণাশিঞ্জিত এই সঙ্গীতপ্রবাহের সঙ্গে আপন হৃদয়ের সুরযোজনার জন্য যে চেতনার প্রয়োজন—যে মুক্তির প্রয়োজন—শিক্ষাই মানুষকে সেই চেতনা ও মুক্তি দিতে পারে। এই যে 'harmony with existence'—শিক্ষার এই হচ্ছে মূল কথা।

আমরা একাধিক মতামতের উল্লেখ করলাম। কিন্তু একটু বিচার করলে দেখতে পাব যে শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে কোনটাকেই আমরা বাদ দিতে পারি না; আবার কেবলমাত্র যে কোন একটিকেই শিক্ষার এক মাত্র সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করতেও পারি না। তা হলে প্রয়োজন সব কটিরই এবং এই সব কটি মতামত সংযুক্ত করে শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আমরা যে সাধারণ সংজ্ঞা গ্রহণ করতে পারি, তা হচ্ছে এই—জগৎ ও জীবনকে উন্নত, সুন্দর, মহীয়ান করে তোলাই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। জীবন গতিশীল—যুগে যুগে তার ধ্যানধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শের রূপান্তর ঘটে থাকে। তিনশ বছর আগে আমাদের পিতামহগণ উন্নত ও সুন্দর জীবন বলতে

যে ছবি কল্পনা করতেন, আমরা হয়তো এখন আর তা করি না। গতিশীল জীবনের সঙ্গে জীবনাদর্শও যে পরিবর্ত্তিত হবে—এতে আর আশ্চর্য্য কি! কাজেই শিক্ষার কোন চিরন্তন শাশ্বত আদর্শ রচনা করাও সম্ভব নয়। কিন্তু জীবনকে সুন্দরতর করা শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত—একথা যে কোন সময় ও যে কোন দেশের পক্ষে প্রযোজ্য। অবশ্য দেশকাল ভেদে এই উন্নতি এবং সুন্দরতার আপেক্ষিক পার্থক্য হতে পারে। এই জীবনের প্রধান সম্পদ হবে ক্ষণস্থায়ী আরাম-বিলাস নয়—অনাবিল নির্ম্মল আনন্দ। প্রেম, মৈত্রী, সেবা, সহনশীলতা হবে এই জীবনের ব্যবহারিক ধর্ম্ম। সহযোগিতা হবে এর সামাজিক মন্ত্র—প্রতিযোগিতা নয়।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জীবনকে উন্নত করাই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তা হলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে জীবন কাকে নিয়ে সংগঠিত হয়েছে? জীবন বলতে আমরা সাধারণতঃ তুটি দিক বুঝি—ব্যক্তি এবং সমাজ। ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবন—এই তুটি মিলেই জীবন সামগ্রিক রূপ পায়। যে শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন উন্নত হয় না—সে শিক্ষার কোন মূল্য নেই। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের উন্নতি সাধন করা। এখানে একথাও বলা দরকার যে কোন আদর্শ অবস্থায় ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বিরোধের কোন সম্ভাবনা নেই। বুনিয়াদী শিক্ষা এই বিরোধের সম্ভাবনাকে স্বীকার করে না এবং সুপরিকল্পিত শিক্ষার দ্বারা বিরোধের যে কারণ রয়েছে সেগুলো যে দূর করা যায় একথাও বিশ্বাস করে।

হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ থেকে প্রকাশিত Basic National Education শীর্ষক পুস্তকে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রধানতঃ তুটি উদ্দেশ্য দেওয়া হয়েছে।

১। (ক) সমষ্টিগত কর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এক নূতন সমাজ-জীবনের নাগরিক হিসাবে ভারতের সকল ছেলেমেয়েকে বড় হবার সুযোগ দেওয়া এবং (খ) এই সমাজজীবনে তাদেব অধিকার, দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সবাইকে সচেতন করে তোলাই বুনিয়াদী শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য।

২। (ক) প্রত্যেকটি শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের বিকাশলাভ এবং (খ) একটি সুস্থ, পরিচ্ছন্ন ও সুসংস্কৃত জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রত্যেকের আত্ম-নির্ভরশীল হওয়ার ক্ষমতা অর্জ্জন এবং (গ) এই জীবনের সামাজিক ও নৈতিক তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা —এ সবের জন্য প্রত্যেকটি শিশুর সামনে উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করা বুনিয়াদী শিক্ষার আর একটি উদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্য দুটি নিয়ে বিচার করলে দেখতে পাব যে (ক) প্রথমটিতে শিশুর সামাজিক চেতনার বিকাশের কথা বলা হয়েছে, এবং (খ) দ্বিতীয়টিতে শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তি অথবা ব্যক্তিগত বিকাশের কথা বলা হয়েছে। এবং এটিও তাৎপর্য্যপূর্ণ যে প্রথমেই সামাজিক চেতনাব বিকাশের (social development) কথা আছে এবং পরে আছে ব্যক্তিগত বিকাশ (individual development)।

বুনিয়াদী শিক্ষার ফলে এই বিকাশ কি কবে সম্ভব হতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করবার আগে আমরা একটু প্রসঙ্গান্তরে যাচ্ছি। বুনিয়াদী শিক্ষার এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে অন্যান্য দেশের আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে সংক্ষেপে একটু তুলনামূলক আলোচনা করা বোধ হয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না এবং আশা করি এই আলোচনায় আমরা দেখতে পাব যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের দিক থেকে অন্যান্য দেশের শিক্ষানীতির সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার কোন পার্থক্য নেই।

স্যার পার্সি নানের উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা আরম্ভ করতে পারি।

শিক্ষার লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"প্রত্যেক শিশুর ব্যক্তিতা (individuality) অর্থাৎ নিজস্ব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য যাহাতে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে পারে এমন সুযোগ সকলকে দেওয়াই হইবে শিক্ষার কর্ত্তব্য। এই ভাবেই প্রত্যেক ব্যক্তি বিচিত্র মানব-জীবনের সম্মিলিত ধারায় নিজ নিজ প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতা অনুযায়ী নিজস্ব দানটি নিবেদন করিতে পারিবে। ....শিশু যে আবেষ্টনীর মধ্যে মানুষ হইতেছে তাহার মধ্যে সেই সকল উপাদানই যথেষ্ট পরিমাণে থাকা আবশ্যক, যেগুলি মনুষ্যচরিত্রের উচ্চতর দিকটি ফুটাইয়া তুলিতে পারে, এবং অন্যবিধ প্রভাবগুলি দূরে রাখাই প্রয়োজন। ....ব্যক্তির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র সামাজিক আবেষ্টনে সর্ব্বজনের সম্মিলিত উদ্দেশ্য ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। আমরা শুধু এইটুকু চাই যেন এই সম্মিলিত জীবনের মধ্যেই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য অবাধে বিকাশলাভ করিবার সুযোগ পায়......।" সংক্ষিপ্ত ফর্ম্মুলা হিসাবে এই নীতিকেই ইংরেজীতে বলা হয়—"Individualise instruction and socialise the pupil."

আর, জন ডিউইর কথা বলে আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করব। জন ডিউই সম্বন্ধে কে. ডি. ঘোষ 'শিক্ষার ভাবধারা' শীর্ষক পুস্তকে বলেছেন—"শিক্ষাক্ষেত্রে দ্বিমেরু তত্ত্ব আজ স্বীকৃত—এক মেরুতে থাকে শিশু আর অপর মেরুতে থাকে শিক্ষক। শিক্ষক, সংস্কৃতি ইত্যাদি সব কিছুই তো সমাজের অন্তর্ভুক্ত। একদিকে রয়েছে শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি, সংস্কার ও তার শক্তিসামর্থ্য আর অন্যদিকে রয়েছে সমাজের নিত্য পরিবর্ত্তনশীল আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও আদর্শ। সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বা তার তালে তালে পা ফেলে যদি শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি ও অন্তর্নিহিত শক্তি বা সামর্থ্যের সম্যক বিকাশসাধন হয়, তা হলে বুঝতে হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হল। কাজেই শিশুর বিকাশ হবে সমাজের মাধ্যমেই। তাই ডিউই বলতেন—প্রত্যেকটি

বিদ্যালয় হবে যেন এক একটি ক্ষুদ্র সমাজ অথবা বৃহত্তর সমাজের প্রতিচ্ছবি। এই ক্ষুদ্র সমাজের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানই হবে শিশুর কাজ। নানাবিধ সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে নেমে আসবে শিশুর জীবনে কর্ম্মকুশলতা, অভিজ্ঞতা। তাই শিশুর শিক্ষাকে কর্ম্মকেন্দ্রিক করলেই চলবে না ; তাকে করতে হবে জীবনকেন্দ্রিক। এক কথায় শিক্ষাই হবে জীবন ; জীবনের জন্য প্রস্তুতি নয়।"

ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন যে ব্যক্তিস্বাধীনতা, তার সঙ্গে সমাজ এবং এর অপরিহার্য্য বিধিনিষেধের সম্ভাব্য সঙ্ঘর্ষ সম্বন্ধে ডিউই অন্যত্র বলেছেন—"Even the theoretical anarchist, whose philosophy commits him to the idea that state or government control is an unmitigated evil, believes that with abolition of the political state other forms of social control would operate : indeed, his opposition to governmental regulation springs from his belief that other and to him more normal modes of control would operate with abolition of the state."

পাশ্চাত্ত্য দেশের এই দুজন দিকপালসম বিশেষজ্ঞের শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অভিমতে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে তাঁরাও শিশুর ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং সামাজিক চেতনার বিকাশকেই শিক্ষার মূল লক্ষ্য বলে মেনে নিয়েছেন। এই মতামতের সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষানীতির কোন প্রভেদ নেই।

বুনিয়াদী শিক্ষা ও শিশুর সামাজিক চেতনার বিকাশ

বুনিয়াদী শিক্ষা শিশুর সামাজিক চেতনার বিকাশের কথা আগে বলেছে। বুনিয়াদী শিক্ষা কেমন করে সমষ্টিগত কাজের উপর

প্রতিষ্ঠিত এক নূতন সমাজজীবনের জন্য আদর্শ নাগরিক তৈরী করতে পারে? বর্ত্তমানে আমাদের সমাজজীবন যে খুব সুন্দর এবং মনোরম এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। ব্যক্তিগত জীবনে অনেক অভাব-অভিযোগ; এবং সামাজিক জীবনেও অনেক বৈষম্য, ব্যবধান ও গলদ। একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে আমাদের বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থায় একদল লোক শ্রমদান করে যায় মাত্র, আর একদিকে মুষ্টিমেয় কিছু লোক সেই শ্রমের ফলভোগ করে। বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীতে বিরাট ব্যবধান—সহরবাসী ও গ্রামবাসীর কোন সাধারণ মিলনস্থান নেই—দুজন দুটি আলাদা পৃথিবীর লোক। দারিদ্র্য, অনাহার, বেকারী সমাজের এক বিশাল অংশকে ধীরে ধীরে দুর্গতির নিম্নতম স্তরে টেনে নিচ্ছে। শিল্পকেন্দ্রিক সভ্যতার ব্যাপক প্রসারের ফলে এক-একটা নূতন সহর অঞ্চলের সৃষ্টি হচ্ছে—কর্ম্ম ও জীবিকার সংস্থানে দুর্গত নরনারীর জনসমাবেশ সেখানে ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। অথচ বাজারে গেলে দেখতে পাওয়া যায় খাদ্য নেই, সব্জী নেই, মৎস্য নেই—দৈনন্দিন চাহিদার অনুপাতে সব জিনিসেরই অভাব। আমাদের দেশ হচ্ছে গ্রাম নিয়ে—গোসেবা আমরা পুণ্য-কাজ বলে মনে করি। অথচ আমাদেরই শিশুদের জন্য দুধ আসছে সাগরপার থেকে টিনে করে পাউডার হয়ে। অবস্থাটা হয়েছে অনেকটা ত্রিশঙ্কুর মত। পাশ্চাত্ত্য বিদেশী শাসক দুশ বছর আমাদের দেশে থেকে তাদের সভ্যতার আশীর্ব্বাদ দিয়েছে খুব কমই, অভিশাপগুলো দিয়েছে বেশী। শতকরা ২০ জন লোকও আমাদের দেশে শিক্ষিত হয়নি—টাকার অভাবে ব্যাপক স্কুল খোলার পরিকল্পনা আমরা একসঙ্গে নিতে পারি না। অথচ আমাদের প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পাঠশালাগুলোকে বিদ্রূপ করে দেশ থেকে আমরা নির্ম্মূল করেছি। বিজ্ঞান-কারিগরী শিক্ষা আমাদের দেশে মাত্র সুরু হয়েছে—জাগতিক জীবনের কোন ক্ষেত্রেই আমরা এই বিজ্ঞান-শিক্ষার আশীর্ব্বাদকে এখনও ব্যাপকভাবে

প্রয়োগ করতে পারছি না—আমাদের লৌহশিল্প, রসায়ন-শিল্প, বিদ্যুৎশিল্প, ধাতুশিল্প সব হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করছে মাত্র—অথচ পাশ্চাত্ত্য শিল্প সভ্যতার সব বোঝাকে আমরা অম্লান বদনে গ্রহণ করেছি। আমরা ট্রাক্টার বানাতে পারি না, কিন্তু লাঙ্গল দেখলে করুণা হয়। ডাক্তার নেই—ওষুধের কারখানা নেই, অথচ কবরেজ মশাইকে দেখলে হাসি পায়। আমরা হাঁকডাক দিয়ে সহরের কলেবর বাড়াই, অথচ সেখানে পানীয় জলে পোকামাকড় থাকে। আমাদের 'কটিতটমাত্র-আচ্ছাদিত' দেশবাসী ক্যামেরা-ম্যানের আনন্দ বর্দ্ধন করে, অথচ চরকার নাম শুনলে আমরা নাসিকা কুঞ্চিত করি। ইংরেজ আমাদের দেশে শিল্প আমদানী করল—ফল কি হল? গ্রামগুলো শেষ হয়ে গেল। সূত্রধর দেশী কামারের হাতুড়ী-বাটাল না কিনে আমদানী করল বিদেশী মাল। ফলে কামারের কাজ ঘুচল। কামার কিনে আনল বিদেশী জুতা—চর্ম্মকারের কাজ ঘুচল। চর্ম্মকার কিনে আনল এনামেলের থালাবাটী—কুম্ভকারের কাজ ঘুচল। কুম্ভকার কিনল ম্যানচেষ্টারের ধুতি-শাড়ী—তন্তুবায়ের কাজ ঘুচল। এইভাবে একটার পর একটা দেশী শিল্প শেষ হয়ে গেল—চাষী জমি বিক্রী করে হয়ে গেল দিনমজুর; তারপর তাও যখন আর জুটল না, তখন সবাই মিলে ছুটল সহরের দিকে—যেখানে আছে কল, আর অনেক কাজ। আর আছে ধোঁয়া, অন্ধকার, বদ্ধবাতাস, ব্যাধি ও মৃত্যু। এই অবস্থা আজও চলছে। এর ফলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে একটা সজ্ঘাতের সম্ভাবনা সব সময়ই রয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জাগতিক জীবনের দিকে তাকালে এই কথার সত্যতা অতি সহজেই বোঝা যায়। জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় অপরিহার্য্য দ্রব্যাদির উৎপাদনব্যবস্থার উপর ব্যক্তিগত অধিকার এবং ঐ দ্রব্যজাত মুনাফার সঙ্গে শ্রেণী সজ্ঘাতের যে গভীর কার্য্যকারণ সম্পর্ক আছে একথা আজ সকলেই স্বীকার করেন। এবং মানুষে

মানুষে এই কৃত্রিম ব্যবধান যে সমাজের কল্যাণ সূচিত করে না একথাও সকলেই জানেন। এবং এ সম্বন্ধে গান্ধীজীর নিজের কথা হল এই—"The economic constitution should be such that no one under it suffers for want of food and clothing. Everybody should be able to get sufficient work to enable him to make the two ends meet and this ideal can be universally realised only if the means of production of elementary necessaries of life remain in the control of the masses.······They should not be made a vehicle to traffic for the exploitation of the others." (Young India, 1928.)

তাই বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে সাম্য এবং পারস্পরিক সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে এক নূতন আদর্শ সমাজ তৈরী করা যেখানে ব্যক্তি ও সমাজে কোন বিরোধ থাকবে না। এই নূতন সমাজের আবির্ভাব দুভাবে হতে পারে—হিংসা এবং বিপ্লবের পথে অথবা শিক্ষার সুদূরপ্রসারী সংগঠনমূলক কাজের প্রভাবে। নূতন শিক্ষার ফলে ব্যক্তি ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হবে এবং নূতন সমাজের ভিত্তিস্থাপন হবে—বুনিয়াদী শিক্ষা এই আশা পোষণ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তনের প্রধান উপায় হচ্ছে শিশুদের ছোটবেলা থেকে লেখাপড়ার মধ্যে এমন কতগুলো উৎপাদনমূলক কাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দেওয়া, যে কাজগুলো না হলে সমাজ চলতেই পারে না। এই সব কাজের মধ্যে প্রধান হচ্ছে কৃষিকাজ, বস্ত্রবিদ্যা ও দারুশিল্প। অন্ন, বস্ত্র, আবাসস্থান—আদিম যুগের অসভ্য মানুষ থেকে আরম্ভ করে বর্ত্তমান যুগের সুসভ্য নাগরিক—সকলের পক্ষেই এই তিনটি হচ্ছে অপরিহার্য্য এবং একান্ত প্রয়োজন। তাই কর্ম্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষায় এই তিনটি শিল্পকেই বুনিয়াদ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

এই সব উৎপাদনমূলক ও সমাজকল্যাণমূলক কাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীরা শৈশব থেকে পেয়ে আসলে আশা করা যায় আগামী দিনের সমাজে মানুষে মানুষে—যেমন শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবী, সহরবাসী ও গ্রামবাসী—ইত্যাদিতে প্রভেদ আর থাকবে না। এই আশা করা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না যে সমাজকল্যাণমূলক উৎপাদনাত্মক শিক্ষা-পদ্ধতির প্রভাবে সুস্থ সামাজিক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এমন একদল উত্তর-সাধক বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসবে যারা বর্ত্তমান দিনের বিভেদ-বৈষম্যকে বিলুপ্ত করে গতিশীল নূতন সমাজের পত্তন করবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুদের অপরিহার্য্য তিনটি উৎপাদনাত্মক শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, শিক্ষার্থিগণ যাতে যতদূর সম্ভব নিজেদের কাজ নিজেরা করতে পারে সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। এখন, এই ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণামকে গান্ধীজীর চিরাচরিত সংগ্রামনীতি অহিংস অসহযোগের আলোকে বিচার করলে সহজেই বুঝতে পারা যাবে এই শিক্ষার বৈপ্লবিক তাৎপর্য্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যই বুনিয়াদী শিক্ষাকে গান্ধীজী এই দিক থেকে নীরব সমাজবিপ্লবের অগ্রদূত হিসাবে অভিহিত করেছেন। গান্ধীজীর নিজের কথা আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি—"My plan to impart primary education through the medium of village handicrafts ....is....conceived as the spearhead of a silent social revolution fraught with the most far-reaching consequences. It will provide a healthy and moral basis of relationship between the city and the village and thus go a long way towards eradicating some of the worst evils of the present social insecurity and poisoned relationship between the classes. It will.... lay the foundation of a juster social order in which

there is no unnatural division between the 'haves' and 'have-nots' and everybody is assured of a living wage and the right to freedom. And all this would be accomplished without the horrors of a bloody class-war or a colossal capital expenditure such as would be involved in the mechanisation of a vast continent like India."

শিশুদের মধ্যে সামাজিক চেতনা বিকাশের জন্য সাধারণতঃ কল্যাণবাণী পাঠ করা হয়—ইংরেজ আমলে শেখান হত, Long Live The King. ফল কি দেখেছি। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশে ৩০ লক্ষ লোক মরে গেল। সুশিক্ষিত ইংরেজ নাগরিক লর্ড আমেরী বিলাতের পার্লামেন্টে ঘোষণা করলেন যুদ্ধের বাজারে ভারতের লোকগুলো রোজগার করছে ঢের, আর খাচ্ছেও বেশী—কাজেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। উডহেড কমিশন বসল তদন্তের জন্য। তদন্তের পর আর এক ঘোষণায় বলা হল চালের যে চোরাকারবার চলেছিল আইন-শৃঙ্খলার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির অন্তরালে, সেখানে দয়া করে চোরাকারবারী যদি মণপ্রতি মাত্র পাঁচ টাকা কম লাভ করত, তা হলে একটি করে জীবন রক্ষা হত। মুনাফার বাজারে একটি জীবনের মূল্য হয়েছিল মাত্র পাঁচ টাকা। অথচ যারা এই লুণ্ঠনহত্যায় মত্ত হয়েছিল, তাদের অশিক্ষিত বলার মত স্পর্দ্ধা কোন্ মূর্খের আছে ? কাজের পরিবর্ত্তে বাণী দিয়ে আমরা শিশুদের সামাজিক চেতনাসম্পন্ন করে তুলতে চাই ; আর এই প্রচেষ্টা চরম সার্থকতা লাভ করে যখন আমরা দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্গন্ধ অপসারণের জন্য প্রশাসনীয় অর্ডিন্যান্স জারী করতে হয়।

কাজেই শিক্ষাকে যদি জীবনকেন্দ্রিক করতে হয়—'education for life and through life' ই যদি কাম্য হয়, তা হলে বিদ্যালয়কে একটি ক্ষুদ্র যৌথ সমাজজীবনে রূপান্তরিত করতে হবে ;

'through life' বলতে আমরা এই সমাজজীবনই বুঝি। এখন, সমাজের অত্যাবশ্যক, অপরিহার্য্য শিল্পকাজগুলোকে বাদ দিয়ে—যে কাজগুলো সমাজকে বাঁচিয়ে রাখছে—সেগুলো বাদ দিয়ে বিদ্যালয়ে সমাজজীবন প্রতিষ্ঠা কি করে সম্ভব হতে পারে? বুনিয়াদী শিক্ষার এই হচ্ছে সামাজিক দিক।

তা হলে একথা অনেকে বলতে পারেন যে বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে লেখাপড়ার মধ্যে কিছু দৈহিক শ্রমের কাজ ঢুকিয়ে দেওয়া। লেখাপড়া শিখে আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবী বলে এমন এক শ্রেণীর লোক তৈরী হয় যারা নিজেরা তো কোন মেহনতের কাজ করতে পারেই না, অধিকন্তু যাঁরা সমাজের গভীর তলদেশে থেকে দৃষ্টির অন্তরালে মেহনত করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সর্ব্বপ্রকার চাহিদা মেটান, তাঁদেরও অবজ্ঞার চোখে দেখে। এর ফলে সমাজে অন্তর্বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। তাই, এ সম্ভাবনাকে দূর করার জন্য লেখাপড়ার মধ্যে শিশুদের দিয়ে ছোটবেলা থেকেই কিছু মেহনতের কাজ করান হচ্ছে—যেমন সাফাই, সূতাকাটা, কৃষি ইত্যাদি। কিন্তু শুধু এই ধারণাটুকু করলে ভুল হবে। বুনিয়াদী শিক্ষায় শিল্প অথবা কাজের অবতারণা করার পেছনে আরও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য্য আছে এবং এর মধ্যে শিশু-মনোবিজ্ঞানসম্মত কয়েকটি গভীর সত্যও নিহিত রয়েছে—যে সত্যকে সমস্ত অগ্রসর দেশের আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞান স্বীকার করে নিয়েছে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের বিকাশের সম্ভাবনা আছে কি না সে বিষয়ও পরিষ্কার হবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা ও শিশু মনোবিজ্ঞান

প্রত্যেক বাড়ীতেই শিশুরা রয়েছে এবং তাদের লেখাপড়ার সমস্যা নিয়ে অভিভাবকদের মাথাব্যথার অন্ত নেই। যে-কোন শিশুর

বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারা যায় ছোট শিশুদের লেখাপড়া করাতে গিয়ে তাঁরা কিরূপ হিমসিম খেয়ে যান। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাওয়া যায় সুস্থ সবল শিশুদের কর্ম্মচাঞ্চল্য কত বেশী। সব রকম কাজেই তাদের অফুরন্ত উৎসাহ—সরস্বতীপূজা, ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, পুরস্কার-বিতরণী, ২৫শে বৈশাখ, ২৩শে জানুয়ারী —যাই হোক না কেন, এই সব কাজ উপলক্ষে শিশুদের মুখে চোখে উদ্দীপনার জোয়ার ছুটে যায়। এদের দিয়ে কাজ করাতে তখন কোন বেগই পেতে হয় না—সব এক পায়ে প্রস্তুত। খেলার মাঠে খেলা বলুন, পাড়ায় থিয়েটার বলুন, কলাগাছ দিয়ে কালীপূজো বলুন—কোন সমস্যা নেই। কিন্তু যত গোলমাল ঐ বই নিয়ে বসলে—লেখাপড়ার বেলায়। তখন মাথা চুলকায়, পেনসিল ভাঙ্গে, আঁখি ঢুলুঢুলু হয়, ক্ষিধে পায়—নানারকম উপসর্গ জোটে। একটি চতুর্থ শ্রেণীর উজ্জ্বল মেধাবী শিশুর কথা মনে পড়ল—ডিসেম্বর মাসের এক শীতের সন্ধ্যায় তাকে দেখেছিলাম। মাঠ থেকে হাই জাম্প, লং জাম্প শেষ করে ধূলিশোভিত দেহে ঘরে ফিরে সে যখন তার জাম্পের রেকর্ডগুলো বর্ণনা করে যাচ্ছিল, মা তখন তাকে মনে করিয়ে দিলেন আর দিন সাতেকের মধ্যেই তার বার্ষিক পরীক্ষা সুরু হবে। ব্যস্—সব ঠাণ্ডা! মলিন বদনে হাত-পা ধুয়ে সে গিয়ে বই নিয়ে বসল—সুরু হল বইএর সঙ্গে মল্লযুদ্ধ। মিনিট পঁচিশ সেই গগন-বিদারী কোলাহল শেষ করে পরম নিশ্চিন্তভাবে সে এসে তার মাকে বললে—যাও, তোমার পড়া শেষ করে দিয়ে এলাম— ; তারপর, শোন বাবা, সেকেণ্ড চান্সে তপন এইস্যা জাম্প দিলে—

—শুনলে, শুনলে, আমাকে বলে কি তোমার ছেলে—জননী নালিশ করলেন—বলে আমার পড়া পড়ে দিয়ে এল—পড়াটা আমার, ওর নয়।

সেদিন রুশোর একটি কথা মনে হয়েছিল—"What must we

think of that barbarous education which sacrifices the present to the uncertain future, which loads a child with chains of every sort, and begins by making him miserable in order to prepare for him, long in advance, some pretended happiness which it is probable he will never enjoy ?"

কথাটা সত্য কিনা একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় এবং সেই সঙ্গে নিজেদের বাল্যজীবনের কথা মনে করলে আরও ভাল হয়। আমরা অভিভাবকেরা বুঝতে পারছি যে সময়মত লেখাপড়া আরম্ভ না করলে এবং পড়ার কাজ চালিয়ে না গেলে সর্ব্বনাশ হবে। কিন্তু শিশুর সামনে এই কঠোর জীবনসংগ্রামের কোন অর্থ আছে কি? তার সামনে তখন আনন্দ, হাসি-গান, খেলা, সবুজ মাঠ আর উদার আকাশের বিপুল সমারোহ। তাই শঙ্কিতা জননী যখন ভয় দেখান যে লেখাপড়া না করলে ঘোড়ার ঘাস কাটতে হবে, সে তখন ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দেয়। ভয় দেখিয়ে কোন কাজ না হলে হয়তো গাড়ী-ঘোড়ার লোভ দেখান হয়। তাতেও যদি কোন কাজ না হয়, তখন হয়তো আসে শাস্তি। জোর করে আমরা তাকে বই নিয়ে বসতে বাধ্য করি—কিন্তু তাতে তার আগ্রহ হয় না, মন বসে না। সে মনে করে লেখাপড়াটা হয় তার বাবার নতুবা মার—এবং নিশ্চয় তাঁদেরই কোন পারলৌকিক পরমার্থের জন্য।

কিন্তু একথাও সত্য যে পাঠ্য বই বাদ দিয়ে অন্য বাইরের বই পড়তে অনেক শিশুই ভালবাসে। যে "অল্পকথার রামায়ণ" শিখে শিশু ক্লাশে যায় না, সেই রামায়ণের গল্পই হয়তো সে তন্ময় হয়ে ঠাকুমা-দিদিমার কাছ থেকে শোনে এবং মন্তব্য করে বালীকে আড়াল থেকে মারা রামচন্দ্রের মত বীরের উচিত কাজ হয়নি। কাজেই প্রশ্ন আসে—গলদটা কোথায়? অনেক অভিভাবকই অভিযোগ করেন—

"দেখুন, বাচ্চাগুলোর সব রকম অনাচ্ছিষ্টিতেই উৎসাহ, কিন্তু ঐ লেখা-পড়ার ব্যাপারটাতেই মহা গোলমাল।" একটা গোলমাল যে কোথাও আছে একথা খুবই সত্যি। কিন্তু গোলমাল কি শিশুর মধ্যে, না শিশুর জন্য আমরা পরিণত মানুষেরা যে লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করেছি তার মধ্যে—সে সম্বন্ধেও চিন্তার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমরা অভিভাবকেরা কি কখনও ভেবে দেখি কেন শিশুর লেখা-পড়ার নামে গায়ে জ্বর আসে? কেন বিদ্যালয় ছুটি থাকলে তার মজা হয়? কেন স্কুলটাকে সে আনন্দ-নিকেতন বলে মনে করে না? কি রকম লেখাপড়ার বন্দোবস্ত আমরা তার জন্য করেছি? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ই এর উত্তর দেওয়া চলে—"ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাষ্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটায় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাষ্টারের মুখও চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাষ্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন। ছাত্ররা দুই-চার পাতা কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ী ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপর মার্কা পড়িয়া যায়।

কলের একটা সুবিধা, ঠিক মাপে, ঠিক ফরমাশ-দেওয়া জিনিসটা পাওয়া যায়—এক কলের সঙ্গে আর-এক কলের উৎপন্ন সামগ্রীর বড়ো একটা তফাৎ থাকে না, মার্কা দিবার সুবিধা হয়। কিন্তু এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের অনেক তফাৎ। এমন কি, একই মানুষের এক দিনের সঙ্গে আর-এক দিনের ইতর-বিশেষ ঘটে।"

ধীরস্থির বয়স্ক ব্যক্তিদেরও যদি ঘণ্টা কয়েক চুপচাপ বসে বক্তৃতা শুনতে হয়, তা হলে তাঁরাও উস্‌খুস্‌ করেন, একটু কেশে নেন, বাইরে ঘুরে আসেন। অথচ এই বয়স্ক ব্যক্তিরাই আশা করেন ১১টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিশুরা একাসনে নির্ব্বাক

শ্রোতা হয়ে বসে বিশ্বের বিমূর্ত্ত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানের নির্য্যাস আহরণ করে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর কুম্ভে পরিণত হবে। এই আশা যখন দুরাশায় পরিণত হয় এবং পরিণত হতে বাধ্য, তখন তাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে আর শিশুর জীবনে নামে দুর্য্যোগ। আসল গোলমালটা হয়েছে এইখানে যে, আমরা শিশুর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে এযাবৎ ভালমত পর্য্যবেক্ষণ করিনি ; এক একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখন যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে তার বিচার করে এরূপ মন্তব্য করলে অযৌক্তিক হবে না যে, শিশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তার আবেগ, কল্পনা, সহজাত প্রবৃত্তি ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে এ পর্য্যন্ত কোন শিশুশিক্ষার পরিকল্পনা আমাদের দেশে করা হয়নি। অধিকন্তু নিজেদের মনগড়া একটা পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা দাঁড় কবিয়ে শিশুদের হুকুম করেছি—তোমাদের এ রকম করতে হবে। ফলে স্কুল ছুটি থাকলে শিশু মনে করে সে মুক্তি পেল ; আর অভিভাবক করেন সার্ব্বজনীন নালিশ—'শিবের দূতেরা সব কিছু করে, লেখাপড়া করে না।' রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে যে গভীর মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—"কোনোমতে সাড়ে নয়টা দশটার মধ্যে তাড়াতাড়ি অন্ন গিলিয়া বিদ্যাশিক্ষার হরিণবাড়ীর মধ্যে হাজিরা দিয়া কখনোই ছেলেদের প্রকৃতি সুস্থভাবে বিকাশলাভ করিতে পারে না। শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দরোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, শাস্তিদ্বারা কণ্টকিত করিয়া, ঘণ্টাদ্বারা তাড়া দিয়া, মানবজীবনের আরম্ভে এ কী নিরানন্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে। শিশু যে অ্যালজেব্রা না কষিয়াই, ইতিহাসের তারিখ না মুখস্থ করিয়াই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেজন্য সে কি অপরাধী। তাই সে হতভাগ্যদের নিকট হইতে তাহাদের আকাশ বাতাস, তাহাদের আনন্দ অবকাশ, সমস্ত কাড়িয়া লইয়া শিক্ষাকে সর্ব্বপ্রকারেই তাহাদের পক্ষে শাস্তি

করিয়া তুলিতে হইবে?……আমাদের অক্ষমতা ও বর্ব্বরতা-বশত জ্ঞানশিক্ষাকে যদি আমরা আনন্দজনক করিয়া না তুলিতে পারি, তবু চেষ্টা করিয়া, ইচ্ছা করিয়া, নিতান্ত নিষ্ঠুরতাপূর্ব্বক নিরপরাধ শিশুদের বিদ্যাগারকে কেন আমরা কারাগারের আকৃতি দিই।"

অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে তিনি যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন তার গুরুত্বও সমধিক; তিনি বলেছেন—"যে জলস্থল আকাশবায়ুর চিরন্তন ধাত্রীক্রোড়ের মধ্যে জন্মিয়াছি তাহার সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচয় হইয়া যাক, মাতৃস্তন্যের মতো তাহার অমৃতরস আকর্ষণ করিয়া লই, তাহার উদার মন্ত্র গ্রহণ করি—তবেই সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে পারিব। বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ, তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও—তাহাদিগকে এই ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিও না।……হে প্রবীণ অভিভাবক, হে বিষয়ী, তুমি কল্পনাবৃত্তিকে যতই নির্জীব, হৃদয়কে যতই কঠিন করিয়া থাক, দোহাই তোমার,……তোমার বালকদিগকে বিশাল বিশ্বের মধ্য দিয়া বিশ্বজননীর প্রতক্ষ্যলীলাস্পর্শ অনুভব করিতে দাও—তাহা তোমার ইনস্পেক্টরের তদন্ত এবং পরীক্ষকের প্রশ্নপত্রিকার চেয়ে যে কত বেশী কাজ করে তাহা অন্তরে অনুভব কর না বলিয়াই তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষা করিয়ো না।"

মুখে আমরা বর্ত্তমান শতাব্দীকে শিশু শতাব্দী বলে থাকি। কিন্তু আসলে শিশুকে প্রাধান্য কতটুকু দেই? যে কাজ আমাদের করতে ভাল লাগে তা আমরা যে-কোন অবস্থাতেই করতে রাজী। অফিস থেকে ফেরার পর সান্ধ্য আসরে যখন তাস-দাবা ইত্যাদি নিয়ে বসি, তখন আমাদের খেয়াল থাকে না রাত্রির কয় প্রহর অতিক্রান্ত হয়েছে; গড়ের মাঠে ফুটবল ফাইন্যাল দেখবার আশায় ৬০।৭০ ঘণ্টা আগে থেকে গেটের পাশে আমরা তাঁবু খাটিয়ে অপেক্ষাও

করতে পারি ; জলঝড় উপেক্ষা করে সিনেমা দেখে রাত্রি দশটায়ও ঘরে ফিরি। কেন আমরা এগুলো করি? আমাদের ভাল লাগে বলে—আনন্দ হয় বলে—আমরা সুখী হই বলে। অথচ এই আমরাই ভুলে যাই যে আমাদের যেমন সুখী হবার আনন্দিত হবার অধিকার আছে, ঠিক তেমনি অধিকার রয়েছে আমাদের শিশুদেরও তাদের নিজেদের বিচিত্র পৃথিবীতে সুখী হবার, আনন্দ লাভ করবার। কিন্তু আমাদের নাদীরশাহী দাপটে তারা সে আনন্দ থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়—কারণ তারা ছোট, অসহায়—সব বিষয়েই আমাদের অধীন। তাদের জন্য কতটুকু বিশেষ বন্দোবস্ত আমরা করি? ঘরের চেয়ার-টেবিল তাদের নাগালের বাইরে—টেবিলের উপর কি আছে তা দেখবার জন্য ওদের আর একটা সিঁড়ি ব্যবহার কবতে হয়, কারণ মাপটা হয় আমাদেব হিসাবে, ওদের প্রয়োজনে নয়। বিশেষভাবে শিশুদের উপযোগী কোন দ্রব্যসামগ্রী ঘবে বাখা আমরা দরকার মনে করি না। অবশ্য আমাদেব অর্থনৈতিক অবস্থা এর জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী। কিন্তু যেখানে অর্থনৈতিক প্রশ্ন আসে না, সেখানেও একই অবস্থা। ঘরের রেডিও-গ্রামোফোন থাকবে ওদের ছোঁয়ার অনেক বাইরে—ওবা ফুলদানীটা ধরতে পারবে না, সাইকেলটা ধরতে পারবে না, টর্চলাইটটা থাকবে ওদের নজরের অলক্ষ্যে ইত্যাদি। তাই কোন কিছু না পেয়ে যখন ওদেরই উদ্ভাবনী শক্তিতে যোগাড় করে মাটি দিয়ে ওরা ঘর বানায়, কিংবা জলের বালটিতে ছপ্‌ছপ্ করে, কলাগাছ দিয়ে কালী বানায়, ইঁট দিয়ে দালান তোলে, কিংবা কাঠের টুকরো দিয়ে মেলা সাজায়, তখন আমরা ধূলোবালি জলকাদার দূষিত স্পর্শ থেকে বাঁচাবার জন্য ওদের ঘরটা ভেঙ্গে দেই, বালটিটা নিয়ে আসি, কালীপূজার বলিটা নিজেরাই সেরে ফেলে তাড়াতাড়ি পূজাটা শেষ করে দেই। প্রতিরোধ একটু বেশী হলে মোক্ষম অস্ত্র তো নিজেদের হাতেই আছে—অসুবিধা কি?

শিশু শতাব্দীতে আমাদের শিশুবন্দনার নমুনা হল এই। এই প্রসঙ্গে মাদাম মন্তেসরী সমাজের উপর যে কশাঘাত করেছেন তার তীব্রতা আরও মারাত্মক। তিনি বলেছেন—"Today it is necessary that society as a whole should become aware of the child and of his importance, and that it should rapidly remedy the peril of the vast void on which it rests. ....The greatest crime that society is committing is that of wasting the money it should spend for its children, of dissipating it to destroy them and itself : The adult world spends and makes for itself alone, whereas clearly a great part of its wealth should be destined for the child. ....There is no example in nature of adults devouring everything themselves and leaving their offspring in want. Yet nothing is done for the human child ; *there is just the bare endeavour to preserve his body in a state of vegetative life. When wasteful society has urgent need of money, it takes it from the schools and specially from the infant schools that shelter the seeds of human life. It takes it from where there are neither arms nor voices to defend it. And therefore this is humanity's worst crime and greatest error.*

এর ফলে পরমার্থ কি লাভ করছি আমরা? রবীন্দ্রনাথের কথায়ই আবার এর উত্তর দিতে হবে—"অন্তরে এবং বাহিরে যে দুইটি উদার এবং উন্মুক্ত বিহারক্ষেত্র আছে, মনুষ্য যেখান হইতে জীবন বল ও স্বাস্থ্য সঞ্চয় করে (প্রকৃতির সত্যরাজ্য ও সাহিত্যের কল্পনারাজ্য)—

যেখানে নানা বর্ণ, নানা রূপ, নানা গন্ধ, বিচিত্র গতি এবং গীতি, প্রীতি ও প্রফুল্লতা সর্ব্বদা হিল্লোলিত হইয়া আমাদিগকে সর্ব্বাঙ্গ-সচেতন এবং সম্পূর্ণ বিকশিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে—সেই দুই মাতৃভূমি হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া হতভাগ্য শিশুদিগকে কোন্ ......কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ঈশ্বর যাহাদের জন্য পিতামাতার হৃদয়ে স্নেহ সঞ্চার করিয়াছেন, জননীর কোল কোমল করিয়া দিয়াছেন, যাহারা আকারে ক্ষুদ্র তবু সমস্ত গৃহের সমস্ত শূন্য অধিকার করিয়াও তাহাদের খেলার জন্য যথেষ্ট স্থান পায় না, তাহাদিগকে কোথায় বাল্য যাপন করিতে হয়। যাহার মধ্যে জীবন নাই, আনন্দ নাই, অবকাশ নাই, নবীনতা নাই, নড়িয়া বসিবার এক তিল স্থান নাই, তাহারই অতি শুষ্ক কঠিন—সঙ্কীর্ণতার মধ্যে। ইহাতে কি সে ছেলের কখনো মানসিক পুষ্টি, চিত্তের প্রসার, চরিত্রের বলিষ্ঠতা লাভ হইতে পারে?" তা হলে নিঃসন্দেহে আমরা এখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট ব্যর্থতার জন্য শিশুদের চেয়ে আমরা পরিণত মানুষেরা অনেক বেশী পরিমাণে দায়ী।

মনোবৈজ্ঞানিকগণ বলেছেন যে প্রত্যেক সুস্থ শিশুর মধ্যে একটা সহজাত কর্ম্মপ্রবণতা আছে—সে প্রধানতঃ কর্ম্মী, শ্রোতা নয়। সে কাজ পছন্দ করে, কাজ করতে চায়, হাতে-কলমে প্রত্যক্ষভাবে জিনিসকে নাড়াচাড়া করতে চায়। খেলাধূলা, প্রত্যক্ষ কাজ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের সুযোগ, স্বাধীনতা ইত্যাদি জিনিসগুলো বিদ্যালয়ে না পেলে শিশুরা লেখাপড়ার প্রতি কখনও আগ্রহান্বিত হতে পারে না—একথা পৃথিবীর সমস্ত আধুনিক শিক্ষাবিদগণই স্বীকার করেন। পার্সি নান এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে কর্ম্মমাধ্যমে লেখাপড়া করালে শ্রেণীপাঠনা যে অনেক বেশী সফল হয় একথা কোন পর্য্যবেক্ষকই অস্বীকার করতে পারেন না। শিশুদের পাঠক্রম সম্বন্ধে বলা হয়েছে

যে, পাঠক্রম নির্ম্মিত হবে কর্ম্ম ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে—ভাব ও তত্ত্বের উপরে নয়। জন ডিউই বলেছেন যে কর্ম্মই হচ্ছে জ্ঞানের সফল পরিণাম। **কাজেই শিক্ষাপ্রচেষ্টাকে শিশুর কাছে আনন্দদায়ক ও চিত্তাকর্ষক করে তোলার জন্য বিদ্যালয়ে কর্ম্মের আমদানী না করে উপায় নেই।**

এখন কথা হচ্ছে এই কাজ কখনও অর্থহীন খামখেয়াল হলে চলবে না। তাই, বুনিয়াদী শিক্ষায় অনেক কাজের মধ্যে এমন তিনটি শিল্পকে প্রধান বলে গ্রহণ করা হয়েছে, যাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক উপযোগিতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এই তিনটি শিল্প যে কৃষি, বস্ত্রবিদ্যা ও দারুশিল্প একথা আমরা আগেই বলেছি। এই সব শিল্প ছাড়া আরও অনেক কাজ আছে—যেমন, বই বাঁধান, সূচীশিল্প, চর্ম্মশিল্প, মৃৎশিল্প, কাগজ তৈরী, গৃহ-বিজ্ঞান, ছবি আঁকা, গান ইত্যাদি। এ ছাড়াও উপযুক্ত সমস্যামূলক কর্ম্মও গ্রহণ করা চলে—যেমন, গ্রাম-পরিক্রমা, যানবাহন তৈরী, হাসপাতালের কাজ, অভিনয়, পত্রিকা-রচনা ইত্যাদি। এই প্রত্যেকটি কাজেরই ব্যক্তিগত ও সামাজিক উপযোগিতা রয়েছে এবং শিশুরা এই কাজগুলোতে আগ্রহান্বিত হয়। এখন কথা হচ্ছে শিশুরা যদি স্কুলে বাগান তৈরী করে, কিংবা সূতো দিয়ে কাপড় বানায়, কিংবা আসবাবপত্র কিছু তৈরী করে—তা হলে তার মানে এই নয় যে লেখাপড়া না শিখিয়ে তাদের কৃষক-তাঁতি-মিস্ত্রী করে তোলাই বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য। অনেকে এরকম কথা যে না বলেন তা নয়, এবং টীকা হিসাবে যোগ করেন যে আমাদের দেশে বেকার-সমস্যা অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক—অনেক লোক পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করেও অন্নসংস্থান করতে পারে না। কাজেই কেবল বই মুখস্থ করে লেখাপড়া না শিখিয়ে ছোটবেলা থেকে কিছু হাতের কাজ শেখান ভাল—দুর্দ্দিনে বাঁচবার পথ হতে পারে।

কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ও শিল্পকাজ

বুনিয়াদী শিক্ষার উপর কেবলমাত্র এইরূপ বৃত্তিমূলক উদ্দেশ্য আরোপিত করার চেয়ে মারাত্মক ভুল আর নেই। আসল কথা হচ্ছে শিশুরা চায় কাজ—তাদের মধ্যে রয়েছে কর্ম্মপ্রবণতা এবং আত্মপ্রকাশের তাগিদ। কিন্তু এতদিন বিত্যালয়ে ছিল শুধুমাত্র কর্ম্মহীন মস্তিষ্কচর্চ্চার বোঝা। এই কারণেই শিক্ষাকে আনন্দমুখর করার জন্য বিত্যালয়ে কাজের আমদানী করা হয়েছে এবং অর্থহীন খামখেয়ালের পরিবর্ত্তে বুনিয়াদী শিক্ষায় উৎপাদনাত্মক শিল্প এবং সৃজনাত্মক কর্ম্মকে গ্রহণ করা হয়েছে। আর জীবনের প্রধানতম তিনটি শিল্পকে মূল শিল্প বলে গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষায় শিল্পের এই যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান—এ শুধু আমাদের দেশের নিজস্ব কোন নূতন ব্যাপার নয়। বিশ্বের সমস্ত অগ্রসর জাতির শিক্ষাব্যবস্থা অনুধাবন করলে একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। ১৯৫১ সালে UNESCO থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শিল্পশিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে যে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে তাতে দেখতে পাওয়া যায় যে তুনিয়ার ৪৮টি সেরা দেশই শিল্পকে বিত্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছে। আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে এই যে পাশ্চাত্ত্যের সব অগ্রসর দেশই আমাদের চেয়ে অনেক বেশী সময়, পূর্ণতা ও গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীকে শিল্পশিক্ষা দেয়। আমাদের স্কুলে শিল্পশিক্ষা এখনও ততটা পূর্ণতা এবং উৎকর্ষতা লাভ করতে পারেনি। এর কারণ হচ্ছে উপযুক্ত পরিবেশ, সরঞ্জাম ও শিক্ষকের অভাব। কয়েকশ বছর পরাধীন থেকে আমাদের স্বাধীন চিন্তার মেরুদণ্ড এমনভাবে ভেঙ্গে গেছে যে আমরা একবার এই সোজা সত্যটাকে তলিয়েও দেখি না যে ইংরেজের কাছ থেকেই ধার-করা যে শিক্ষার কৌলীন্য ও পবিত্রতা রক্ষা করবার জন্য আজ আমরা শিল্পকাজকে তথাকথিত চাষা-ভুষোর কাজ বলে শিক্ষাপ্রাঙ্গণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই, পাশ্চাত্ত্য দেশ সেই শিক্ষার অন্তঃসারশূন্যতা উপলব্ধি করে

অনেক আগেই তার জরাজীর্ণ খোলসটাকে পরিত্যাগ করেছে। তারা শিল্পকে আমাদের অনেক আগেই গ্রহণ করেছে—তাদের নবীন সংগঠনের কাজ ঠিকই চলছে। আমরা যারা অতি উৎসাহী তারাই কেবল সেই পরিত্যক্ত খোলসটাকে কণ্ঠে ধারণ করে শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষাকে 'কুলিমজুরের' শিক্ষা বলে অতীতলব্ধ প্রসাদের ঋণস্বীকার করছি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—স্কুলে এসে শিশুরা যদি কেবল কাজই করে তা হলে লেখাপড়া করবে কখন? বইপত্র লেখাপড়া বন্ধ করে বাচ্চারা কি কেবল কারখানার মত কাজই করবে? তা মোটেই নয়—স্কুলে শিশুরা কাজ এবং লেখাপড়া দুটোই করবে এবং ভালভাবে পড়া করবার জন্য যতটুকু কাজ দরকার, ততটুকুই করবে—তার বেশী নয়। বুনিয়াদী শিক্ষায় কাজ এবং লেখাপড়া দুটোই কিভাবে হতে পারে সে কথা জানতে হলে আমাদের বুনিয়াদী শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। এখানে সেই কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্পকাজ এবং লেখাপড়া দুটোই একসঙ্গে হতে পারে এবং শিশুদের লেখাপড়ার বিষয়ে ক্ষতি হবার কোন সম্ভাবনা নেই। জাগতিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করার যোগ্যতা অর্জ্জন করাও শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। জন ডিউই শিক্ষাকে সমস্যা-সমাধানেরই নামান্তর মাত্র বলেছেন। পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষায় কতগুলো মুদ্রিত তথ্য সরবরাহ করা ছাড়া শিশুদের হাতে-কলমে সমস্যা-সমাধানের কি উপযুক্ত পরিবেশ আমরা স্কুলে গড়ে তুলতে পারি? কিন্তু শিল্পকাজে নিযুক্ত হলে শিশুরা কতগুলো বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হয়। আজ যদি শিশুদের একটি বাগান করতে হয়, তা হলে তাদের মাপজোখ, বীজ, মাটি, জল, সার, আবহাওয়া, গাছের বিভিন্ন অংশ এবং তাদের কাজ—সবই বাগান করার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জানতে হবে। সুতাকাটা এবং কাপড় তৈরীর কাজে

বুনিয়াদী শিক্ষা ও অনুবন্ধ পাঠদান প্রণালী

অনেক প্রক্রিয়া আছে এবং শিশুর কাছে এগুলো সবই সমস্যাসঙ্কুল। জমির প্রকৃতি, চারাপালন, সংরক্ষণ, ওজন, টাকাপয়সার হিসাব, গজ-ফুটের অঙ্ক, গড়, ঐকিক নিয়ম, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি একাধিক পাঠ্যবিষয় বিভিন্ন কর্ম্মোদ্ভূত সমস্যার সমাধানপথে আসবে। এই জ্ঞান না পেলে শিশুরা ভালমত কাজটি করতেই পারবে না। বিভিন্ন শিল্পের এই যে শিক্ষাগত দিক, পাঠ্যবিষয়ের সহিত শিল্পকর্ম্মের এই যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক—এ সম্বন্ধে একাধিক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কৃষি বা বাগানের কাজের সঙ্গে আবহাওয়া, ঋতুপরিবর্ত্তন, মাটি, গাছ ইত্যাদি প্রকৃতিবিজ্ঞানের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে তা অতি সহজেই চোখে পড়ে। বস্ত্রবিদ্যার সঙ্গে—ওজন, টাকাপয়সা, গজফুট, ঐকিক নিয়ম ইত্যাদি গণিতের প্রশ্ন, কার্পাসের ইতিহাস, কাপড়ের ইতিহাস, তুলার চাষ, আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য, কাপড়ের কলের ইতিহাস, তাঁতিদের কথা—সমাজবিজ্ঞানের ইত্যাদি বিষয় অতি সহজেই এসে পড়ে। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত শিশুদের এমন কি পড়া? একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাওয়া যায় যে কৃষি, বস্ত্রবিদ্যা, দারুশিল্প এবং অন্যান্য সৃজনাত্মক কাজগুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এবং জ্ঞানমুখী দৃষ্টি নিয়ে করতে গেলে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত শিশুদের যতটুকু মাতৃভাষা, গণিত, ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অঙ্কন, জ্যামিতি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি শেখান দরকার, তার অনেকখানিই শেখান যায়। কাজের বাস্তব প্রয়োজন থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভে শিশুদের এইভাবে সাহায্য করাকে সমবায় অথবা সম্বন্ধিত অথবা অনুবন্ধ পদ্ধতিতে পাঠদান বলে (method of correlated teaching)। এই পদ্ধতিতে পাঠদানের ফলে শিশুর সামনে জ্ঞান ও কর্ম্ম ওতপ্রোতভাবে প্রতিভাত হয় এবং শিশুর সামগ্রিক বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। এই শিক্ষাপদ্ধতির ফলে শিক্ষকের কাজ ও দায়িত্ব বাড়ে, কিন্তু শিশুর কাছে লেখাপড়া হয় চিত্তাকর্ষক। যে বইএর নামে তার গায়ে

জ্বর আসে, সেই বই এখন গৌণ, কাজই মুখ্য ; আর এই কাজগুলোর শিক্ষাগত সম্ভাবনা এমন যে শিশুদের ভাল করে কাজগুলো করতে হলে লেখাপড়া শিখতেই হবে। বুনিয়াদী শিক্ষা যে মনোবিজ্ঞানসম্মত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর যে স্কুলগুলোকে কারখানা করে তোলার মতলব নেই, অথবা শিক্ষার নামে দেশের ভাবী বংশধরদের তথাকথিত 'চাষা-ভূষো' করে তোলার উদ্দেশ্য নেই—উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশা করি সে কথা এখন বোঝা যাবে।

অবশ্য একথা ঠিক যে এই শিক্ষায় শিক্ষকের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশী। গতানুগতিক শিক্ষায় মাষ্টারমশাইর কাজ অনেক সোজা ছিল। এখন বুনিয়াদী শিক্ষককে অনেক সাবধানে অগ্রসর হতে হবে। তিনি যে ক্লাশে গিয়ে একখানা বই নিয়েই কেবল পড়িয়ে আসবেন তা হবে না। তাঁকে পরিকল্পনা করতে হবে কাজের এবং পাঠের। কাজ ও লেখাপড়ার সার্থক সাঙ্গীকরণ যদি তাঁকে করতে হয় তা হলে অনেক বেশী মনোযোগ, চিন্তা ও পরিকল্পনা নিয়ে তাঁকে কাজ করতে হবে। যে কথাটি তাঁকে সব সময় মনে রাখতে হবে তা হচ্ছে ডাঃ জাকীর হোসেনের ১৯৩৮ সালের মতামত—'The scheme is one of education, and not of production.' স্বয়ং সার্জ্জেণ্ট সাহেব ১৯৩৯ সালে পুনা সম্মেলনের প্রাক্কালে বলেছিলেন— …'the scheme of basic education is going to make demands on the enthusiasm and initiative of the teacher to an extent that no other system of education in any country has done before.' এই সাধারণ সত্য থেকে যত আমরা দূরে সরে যাব সেই পরিমাণে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যর্থ হবে।

কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন দাঁড়ায়। সব বিষয়ই কি ভালভাবে এই কর্ম্মমাধ্যমে পড়ান যায়? পাঠ্যসূচীতে এমন কয়েকটি বিষয়

থাকা সম্ভব যেগুলো খুব স্বাভাবিকভাবে এই সমবায় পদ্ধতিতে পড়ান যেতে পারে না। এ প্রশ্নেরও জবাব আছে। শুধুমাত্র শিল্পকে কেন্দ্র করে পাঠ্যসূচীর সমস্ত অধ্যায় যে সার্থকভাবে উপস্থাপিত করা চলে না, এই সম্ভাবনা শিক্ষাবিদগণ ১৯৩৯ সালেই বুঝেছিলেন। তাই পুনায় প্রথম বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলনে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে শিল্পই বুনিয়াদী শিক্ষার একমাত্র ভিত্তি নয়—আরও দুটি ভিত্তি আছে—প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ। এখন এই তিনটি আগ্রহের কেন্দ্র ধরেও যদি সমবায় পদ্ধতিতে সব বিষয়ের সব অংশ উপস্থাপিত করা সম্ভব না হয়, তা হলে ঐ অংশগুলো যে-কোন উত্তম পদ্ধতি অনুযায়ী পড়ান যেতে পারে। শিক্ষাবিদগণ একথা সব সময়ই স্বীকার করেছেন যে কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় প্রাসঙ্গিক জ্ঞানলাভের অবকাশ খুব বেশী এবং তার ফলে পাঠ্যসূচী অনুসরণে ফাঁক পড়তে পারে। এই রকম ক্ষেত্রে ঐ বিষয়গুলো (এবং এদের সংখ্যা খুব বেশী হবে না) উত্তম প্রচলিত পদ্ধতিতে (improved formal method) পড়ালে দোষাবহ হবে না। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও শিশুর আগ্রহকে উদ্দীপিত করে নিতে হবে এবং তাকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। কোন ক্ষেত্রেই পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে আগ্রহের কেন্দ্রের কষ্টকল্পিত সম্বন্ধ বাঞ্ছনীয় নয়।

এখানে আর একটি কথা উঠতে পারে। অনেকে বলতে পারেন যে শিল্পগুলোকে যদি ভালভাবে শিশুদের লেখাপড়া শেখাবার মাধ্যম হিসাবেই কেবল গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তা হলে হয়তো এই কাজগুলো নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলতে পারে। এমন হতে পারে শিশুরা শিল্পকাজকে তাচ্ছিল্য করবে এবং তার ফলে একটা উচ্ছৃঙ্খল ও অপরিচ্ছন্নভাবে কাজ করার কু-অভ্যাস নিয়ে বড় হতে থাকবে। এরকম যদি হয় তা হলে একে বিকাশের দিক থেকে এক অশুভ লক্ষণ বলতে হবে। এইরূপ ছিনিমিনি খেলা যাতে না চলতে পারে—

যাতে প্রত্যেকেই যথেষ্ট পূর্ণতা ও গুরুত্ব দিয়ে শিল্পকাজ করে, তার জন্য স্থির করা হয়েছে যে, শিল্পকাজের মাননির্ণয় দুটি নীতি দিয়ে নির্দ্ধারিত হবে। (১) প্রত্যেক শিশুকে নিজের শিল্পে একটা ন্যূনতম মান অর্জ্জন করতেই হবে এবং তার জন্য প্রত্যেক শিল্পে পরীক্ষা থাকবে; আর (২) শিশুদের উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রীর উপযুক্ত হতে হবে। এই দুই নীতিকে সামনে রেখে কাজ করলে আশা করা যায় শিল্পকে নিয়ে বিদ্যালয়ে ছেলেখেলা হবে না।

আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে এই যে, শিশুর কাছে নিছক মস্তিষ্কপ্রসূত বিমূর্ত্ত (abstract) জ্ঞানের কোন আবেদন নেই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই হল শিশুর জ্ঞানের প্রথম সোপান। এই বিমূর্ত্ত জ্ঞানকে Prof. Whitehead বলেছেন inert ideas—অর্থাৎ এমন কতগুলো ভাব বা তত্ত্ব যাদের সঙ্গে শিশুর ঐ মুহূর্ত্তের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কোন যোগাযোগ নেই। পৃথিবীর সকল মনীষীই একথা স্বীকার করেন যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাই হল শিশুর জ্ঞানের প্রথম সোপান। রুশো, পেষ্টালট্‌সি, ফ্রোবেল, মন্তেসরী, জন ডিউই, রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকেই শিশুর এই প্রখর ইন্দ্রিয়চেতনার কথা উল্লেখ করেছেন যার ফলে আধুনিক শিশুশিক্ষায় কর্ম্মের এত প্রাধান্য। রুশো বলেছেন যে যখন শিশুর স্মৃতি ও কল্পনা বিকাশলাভ করে না তখন একমাত্র ইন্দ্রিয়চেতনার সাহায্যেই সে শিক্ষা পেয়ে থাকে। পেষ্টালট্‌সি আমাদের দেখিয়েছেন কেমন করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিশুদের ভাষা ও গণিত শেখান যায়। ফ্রোবেল-প্রবর্ত্তিত 'কিণ্ডারগার্টেন' স্কুলের কেবলমাত্র শ্রেণীসংগঠন দেখলেই বুঝতে পারা যায় সেখানে ইন্দ্রিয়-চেতনার সাহায্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভে শিশুদের কতটা সাহায্য করা হয়। মন্তেসরী তো 'sense training'এর উপর বিশেষ জোর দিয়ে নার্সারী স্কুলে তার ব্যাপক আয়োজনের

শিশু এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান

নির্দ্দেশই দিয়েছেন। এই দিক দিয়ে বিচার করলে একথা বলা যায় যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশু অনেক স্বাভাবিকভাবে জ্ঞানলাভ করে —কর্ম্মকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার ফলে জ্ঞান তার কাছে অনেক জীবন্ত হয়ে আসে। সূতা কাটলেই শিশুকে গণিতের যোগবিয়োগ, গজফুট ইত্যাদি অঙ্ক শিখতে হবে। তুলার হিসাব রাখতে গেলেই সের মণ ছটাক, টাকা পয়সার হিসাব তাকে শিখতে হবে। তুলা উৎপাদন করতে গেলে তাকে ভূগোল, প্রকৃতিবিজ্ঞান জানতে হবে। সমস্ত কাজের পরিকল্পনা এবং কর্ম্মপ্রগতির দিনলিপি রাখতে গেলে ভাষা শিখতে হবে। বাগান করতে গেলে তাকে মাপজোখ, নক্শা ইত্যাদি করতে হবে। অভিনয় করতে হলে বই লিখতে হবে। গ্রাম-পরিক্রমা করতে হলে গ্রামের ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য, যানবাহন ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ করতে হবে। কাজেই কর্ম্মমাধ্যমে জ্ঞান তার কাছে অনেক প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত হয়ে আসবে। খুব ছোট কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

এই প্রসঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট্যও চোখে পড়ে। সেটি হচ্ছে পাঠ্যতালিকার অবিভাজ্যতা। মনোবৈজ্ঞানিকগণ আমাদের বলেছেন যে শিশুর সামনে জ্ঞানজগৎ অখণ্ড—অবিচ্ছিন্ন। পরিণত মানুষের মত সমস্ত বিষয়গুলোকে তারা বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে পায় না। একটি শিশু যখন মাকে দেখে যে দুধের হিসাব করে তিনি গয়লাকে পয়সা দিচ্ছেন, অথবা ধোবার সঙ্গে কাপড় কাচার হিসাব করছেন, তখন সে ভাববে না এটা অঙ্কের ব্যাপার। শিশুমহলের আসরে যদি কোন সুন্দর কবিতা শোনে তা হলে মনে করবে না এবার সে সাহিত্যের জগতে চলে এল। আখাউড়ার কাছে চেক্পোষ্ট পর্য্যন্ত গিয়ে যখন সে ছাড়পত্র ব্যতীত আর পশ্চিমদিকে যেতে পারে না, তখন দ্বিখণ্ডিত ভারতের ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক ঘটনা-পরম্পরা এবং নূতন ভৌগোলিক সীমারেখা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। এই সব

বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো একটা অখণ্ড ধারায় তার জীবনের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে—এই অনায়াসলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে সে অনেক কিছু শেখে এবং উত্তরকালে পরিণত বয়সে বুঝতে পারে—কোন্ তত্ত্ব ও তথ্য কোন্ বিশিষ্ট জ্ঞানপ্রকোষ্ঠের ভাণ্ডারে গিয়ে সঞ্চিত হবে। কিন্তু শিশু বয়সে এটা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিছু আগে আমরা শিল্পের যে একটি উদাহরণ দিয়েছি, তার থেকে বোঝা যায় কি করে শিশু অনায়াসে প্রয়োজনের তাগিদে (felt need) বিভিন্ন বিষয়ে শিল্পকাজের মধ্য দিয়ে জ্ঞানলাভ করে। পাঠ্য-তালিকাকে যতদূর সম্ভব অবিভাজ্যরূপে রূপায়িত করার এই যে বিজ্ঞানসম্মত প্রচেষ্টা, বুনিয়াদী শিক্ষার এটি একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পাঠ্যতালিকার অবিভাজ্যতা ও শিল্পনির্ব্বাচন

এই বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োজন থেকে আমরা শিল্পনির্ব্বাচনের প্রশ্নে এসে পড়ি। আমরা আগাগোড়া এই কথাই বলে আসছি যে বিদ্যালয়ে শিল্প ও অন্যান্য সৃজনাত্মক কর্ম্ম আমদানী করার পেছনে জ্ঞানমুখী উদ্দেশ্যই প্রধান—কারিগর তৈরী নয়। একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে সব শিল্পের শিক্ষাগত গুরুত্ব সমান নয়। জ্ঞান ও কর্ম্মকে যদি একসূত্রে গ্রন্থিত করতে হয় তা হলে—এমন সব শিল্প আমাদের নির্ব্বাচন করতে হবে যাদের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলোর ব্যাপকতা এবং বৈচিত্র্য অপেক্ষাকৃত বেশী। যে শিল্পকর্ম্মের ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য যত বেশী, তার শিক্ষাগত মূল্যও তত বেশী। শিশু কোন কাজ করতে গিয়ে যত বেশী বিচিত্র পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে—যত বেশী সমস্যা নিয়ে তাকে মাথা ঘামাতে হবে, তত বেশী নূতন তথ্য লাভ করবার তার সুযোগ আসবে। এদিক থেকে বিচার করে লক্ষ্য করলে সকলেই দেখতে পাবেন যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যেসব শিল্পকে গ্রহণ করা হয়, তাদের মধ্যে সামাজিক উপযোগিতা তো আছেই, অধিকন্তু শিক্ষাগত সম্ভাবনাও যথেষ্ট রয়েছে। শিল্পকাজ যাঁরা জানেন তাঁরা

সহজেই বুঝতে পারবেন কার্পাস উৎপাদন থেকে আরম্ভ করে কাপড় বোনা পর্য্যন্ত শিশুদের কতগুলো ও কি রকম বিচিত্র এবং সমস্যাপূর্ণ স্তর পার হয়ে যেতে হয় এবং তার মধ্যে শিক্ষাগত সম্ভাবনা কতটুকু আছে।

এবার আমরা উৎপাদন এবং তার অর্থকরী দিক সম্বন্ধে আলোচনা করব। এই উৎপাদন এবং অর্থকরী দিক নিয়ে অনেক অপ্রিয় সমালোচনা হয়েছে। শিশুদের স্বাধীনতা বলে কিছু থাকবে না, তারা সব শ্রমিকে পরিণত হবে। ভাবকল্পনা, জ্ঞানসাধনার পরিবর্ত্তে বিদ্যালয়গুলোতে বণিকবৃত্তির অনুশীলন চলবে। এবং তার ফলে শেষ পর্য্যন্ত একদিন শিক্ষাব সমাধি রচিত হবে। এই ধরণের অভিযোগ অনেক সময়ই শোনা যায়। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তা মোটেই নয়। বুনিয়াদী শিক্ষানীতিতে উৎপাদন-কুশলতাকে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের একটি অপরিহার্য্য উপায় বলে মনে করা হয়। যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামালের সাহায্যে শিশুরা কিছু কিছু জিনিস বিদ্যালয়ে উৎপাদনও করে। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষাব্রতীর কাছে একটা বড় কথা হচ্ছে এই যে, উৎপাদন বুনিয়াদী শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য নয়—একটি বিষয় মাত্র। কোন ক্ষেত্রেই লেখাপড়াকে অবহেলা করে উৎপাদনকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। অথবা প্রাধান্য দেবার সম্ভাবনাও নেই। কিন্তু একটা কথা হচ্ছে এই যে—উৎপাদন হবেই। শিশুদের মধ্যে যদি আমরা সুন্দর করে, গুছিয়ে, পরিচ্ছন্নভাবে সব কাজ করার সুঅভ্যাস গড়ে তুলতে চেষ্টা করি—এবং সব কাজেই আমরা এইরূপ মনোযোগ দেব—তা হলে শিল্প থেকে ব্যবহার ও বিক্রীর উপযোগী জিনিস বিদ্যালয়ে তৈরী হবেই। এবং এই বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে বিদ্যালয়ের যদি কিছু আমদানী হয়, তা হলে লেখাপড়ার গয়াপ্রাপ্তি হবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। আর একথা যদি কেউ

উৎপাদন ও শিক্ষাগত দিক

বলেন যে হাতুড়ী-বাটাল, খেতী-চরকাতে মূল্যবান সময় নষ্ট না করে লেখাপড়ায় সেই সময়টুকু নিয়োজিত করলে আখেরে মেওয়া ফলতে পারে, তা হলে অবশ্য বুনিয়াদী শিক্ষার কিছু বলার নেই; কারণ শিশুচরিত্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্যগুলোকে ধ্বংস করে স্কুলগুলোকে—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—বিদ্যাচর্চ্চার কল এবং মস্তিষ্কচর্চ্চার কচ্‌কচিতে পরিণত করার মতবাদকে এই শিক্ষানীতি শিশুশিক্ষার ঘোর পরিপন্থী বলে সমর্থন করে না।

এই প্রসঙ্গে আমরা মাধ্যমিক স্তরের বর্ত্তমান শিক্ষাসংস্কারের দিকে লক্ষ্য করতে পারি। একটা কঠোর ও মর্ম্মন্তুদ বাস্তব ঘটনা ইদানীং সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন। প্রত্যেক বছর স্কুল-ফাইন্যাল, ইণ্টারমিডিয়েট ইত্যাদি পরীক্ষার ফলাফলের দিকে একটু দৃকপাত করলেই দেখা যায় কি সাঙ্ঘাতিক জাতীয় অপচয় এই শিক্ষাস্তরে সঙ্ঘটিত হচ্ছে। এক লক্ষ পরীক্ষা দিলে পঞ্চাশ হাজারও পাশ করে না—যারা পাশমার্কা পায় তাদের মধ্যেও শতকরা প্রায় নব্বই জনই হচ্ছে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিভাগে। এদের ভবিষ্যৎ কি তা নিয়ে আজ অভিভাবকদের চিন্তার অবধি নেই। উচ্চশিক্ষার প্রায় সকল বিদ্যামন্দিরের দ্বারই এদের জন্য অবরুদ্ধ—এরা সেখানে অবাঞ্ছিত হরিজন—অথচ এরাই শতকরা প্রায় ৯০ জন। কোথায় এরা যায়? আবার, তিন দাগের পাশমার্কা যে বাস্তবক্ষেত্রে এদের পক্ষে কতটুকু 'ভব-সাগর-পার-কারণ' হতে পারে সে খবর আমরা সকলেই জানি। এবার ভেবে দেখুন যারা এই পাশমার্কা পায়নি তাদের কথা। তাদের জন্য নিজেদের স্কুলের দরজাও অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে যায়। এর সম্মিলিত পরিণাম হচ্ছে এই যে কলেজীয় শিক্ষায়ও বিরাট অপচয় হচ্ছে—কারণ উপযুক্ত যোগ্যতা এবং মেধা নিয়ে সবাই সেখানে পড়তে যায় না। কোন কোন সংবাদপত্র একে

মাধ্যমিক শিক্ষায় সংস্কার ও বুনিয়াদী শিক্ষা

বলেছে ছাত্রমেধ। এর কারণ কি? কারণ অনেক—কিন্তু তার মধ্যে একটা কারণ কি এই নয় যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভর্তির জন্য যারা অনবরত ভিড় করছে, তারা সকলেই সেই জ্ঞানমুখী শিক্ষার বিদ্যাসাধনার জন্য উপযুক্ত নয়? কিন্তু এদেরও শিক্ষার দরকার—এরা এম. এ., এম. এসসি. পাশ করার উপযুক্ত না হতে পারে, কিন্তু যে-কোন মেকানিকেল অথবা বৃত্তিমূলক শিক্ষা এরা পেতে পারে। তার জন্য প্রয়োজন বহুমুখী শিক্ষার বন্দোবস্ত করা—বই মুখস্থ করাই যে শিক্ষার একমাত্র পথ এমন কি কথা আছে? এই প্রসঙ্গে মুদালিয়ার-কমিশন (১৯৫৩) যে কথা বলেছেন তার উল্লেখ আমরা এখানে করতে পারি—"………Our secondary schools should no longer be single-track institutions, but should offer a diversity of educational programme calculated to meet varying aptitudes, interests and talents……… They should……include both general and vocational subjects, and pupils should have an opportunity to choose from them……The whole modern approach to this question is based on the insight that the cultural and intellectual development of different individuals takes place best through a variety of media, that the book or the study of traditional academic subjects is not the only door to the education of the personality, and that in the case of many—perhaps a majority—of the children, practical works intelligently organised can unlock their latent energies much more successfully than the traditional subjects which address themselves

only to the mind or, worse still, the memory." কাজেই মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায়ও কেবলমাত্র বইয়ের বোঝার পরিবর্ত্তে কারিগরী বিদ্যা, শিল্পকাজ ইত্যাদিও প্রবর্ত্তিত হতে যাচ্ছে। তাই যদি হয়, তা হলে এই স্তরে শিল্পশিক্ষা অথবা বৃত্তিনির্ব্বাচনের জন্য আরও আগে থেকেই কি আমাদের স্কুলে বিভিন্ন শিল্পকাজের বন্দোবস্ত করা উচিত নয়? তা না হলে নবম শ্রেণীতে গিয়ে কোন্ ছাত্র কোন্ বিভাগে কোন্ কাজের জন্য উপযুক্ত তা আমরা জানব কেমন করে? আর কিছু না হোক, অন্ততঃ মাধ্যমিক স্তরে যোগ্যতা ও প্রবণতার আলোকে কোন্ শিক্ষার্থী কোন্ কাজের জন্য উপযুক্ত, শুধু এইটুকু জানাব জন্যও বুনিয়াদী স্তরে আমাদের একাধিক শিল্পকাজের অবতারণা করা একান্ত প্রয়োজন। এর ফলে প্রথম শ্রেণী থেকে আরম্ভ করে একাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত সমস্ত বিদ্যালয়-জীবনের মধ্যেই শিল্পকাজেব একটা সার্থক ও অখণ্ড ধারা অব্যাহত থাকবে।

অনেকে অভিযোগ করেন যে উৎপাদনাত্মক কাজের উপর জোর দেওয়ার ফলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পুস্তকের প্রাধান্য কমে যাবে এবং তার ফলে শিক্ষাব মানদণ্ড নীচে নেমে আসবে। "পুস্তকবিহীন শিক্ষা", "বইয়েব বোঝা কমাও" ইত্যাদি স্লোগান শুনে অনেক বুনিয়াদী শিক্ষাকর্ম্মীরও এই বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে এবং লেখাপড়ায় বইয়ের স্থান কতটুকু হবে এ প্রশ্নে অনেক সময় তাঁরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন না। বুনিয়াদী শিক্ষানীতির একটা গোড়ার কথা হচ্ছে এই যে গ্রন্থকীট হওয়াই জ্ঞানার্জ্জনের অথবা সর্ব্বতোমুখী বিকাশলাভের একমাত্র পথ নয়। ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও জ্ঞানলাভের পক্ষে উৎপাদনমূলক কাজের উপযোগিতা শৈশবে অধিকতর কার্য্যকরী। কিন্তু বই বাদ দিয়ে লেখাপড়া কি করে হতে পারে? আসলে কথাটা হচ্ছে এই যে বর্ত্তমানে কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক

বুনিয়াদী শিক্ষায় পুস্তকের স্থান

ব্যতীত শিশুদের সামনে দেবার আর কিছুই নেই যার ফলে লেখাপড়া শিশুদের সামনে একটা বোঝা বলে মনে হয়। বই ঠিকই থাকবে, তবে বর্ত্তমানে যে নীতি ও পদ্ধতিতে বইয়ের ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার ধরণটাকে পরিবর্ত্তিত করতে হবে। ১৯৫৮ সালের মে মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত পঠন বিষয়ে জাতীয় অধিবেশনে প্রাক্তন শিক্ষা-সচিব শ্রী কে. জি. সৈদিন বলেছিলেন—"...our present educational system is usually criticised as being too "bookish" and "academic". While I share the point of the criticism, I doubt whether the use of the two words is appropriate.....What people really mean is that it is not bookish but "text-bookish".... An ordinary text book is as different from a creative book as great music from the cheap songs that flood the market. And when even the text book is replaced by the horrible notes on which students rely for passing the examinations, there is no education of the mind. They are mainly engaged in purveying factual information which is often of doubtful value and utility. *The problem of education therefore is not one of reducing the importance of books but of ensuring their proper use.*" সুসম্বদ্ধ জ্ঞানের আধার এবং আনন্দের উৎস হিসাবে পুস্তকের মূল্য কখনও অস্বীকার করা যায় না। কাজেই অন্য যে-কোন আদর্শ বিদ্যালয়ের মত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পক্ষেও গ্রন্থাগার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। বরঞ্চ এখানে পুস্তকের প্রয়োজন গতানুগতিক বিদ্যালয় থেকে আরও বেশী। কর্ম্মমাধ্যমে শিক্ষার ফলে এখানে প্রাসঙ্গিক শিক্ষার অবকাশ যে

খুবই বেশী একথা আমরা আগে বলেছি। এর ফলে কোন বাঁধাধরা পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করে ক্লাশে পড়ান সবসময় সম্ভব নাও হতে পারে। তখন বিভিন্ন তথ্য ও ঘটনা সংগ্রহের জন্য ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের পক্ষেই প্রামাণ্য পুস্তকের একান্ত প্রয়োজন। মনে করুন, বস্ত্রবিদ্যা প্রসঙ্গে বস্ত্রবিদ্যার ইতিহাস আলোচনা করা দরকার; যেসব পাঠ্যপুস্তক ক্লাশে পড়ান হয় তার মধ্যে এসব বিষয়গুলো কতটুকু থাকে—অথবা আদৌ থাকে কি না—তা প্রত্যেক শিক্ষকই জানেন। কাজেই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই প্রয়োজনে একটি সুবিন্যস্ত গ্রন্থাগার অবশ্যই থাকা উচিত। সেখানে শিশুপাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষকদের জন্য প্রামাণ্য পুস্তক দুই-ই থাকবে।

খুব আক্ষেপের কথা হচ্ছে এই যে ভারতীয় ভাষায় লেখা এই সব শিশুপাঠ্য ও প্রামাণ্য পুস্তকের একান্ত অভাব। ছড়া, শিশু-কবিতা, অভিনয়, জ্ঞানবিজ্ঞানের সহজবোধ্য সুচিত্রিত গ্রন্থাবলী আমাদের দেশে এখনও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রকাশিত হচ্ছে না। শিক্ষকদের প্রয়োজনের প্রশ্ন নাই বা তুললাম—তাঁরা হয়তো ইংরেজী ভাষায় রচিত বিভিন্ন বিশ্বকোষ থেকে কাজ চালাতে পারেন। কিন্তু আমাদের শিশুদের অভাব এখনও অপূর্ণ। শ্রী কে. জি. সৈদিন এ বিষয়ে বলেছেন যে—"শিশুদের মানসিক শূন্যতা, সাধারণ জ্ঞানের অভাব, সংবাদসংগ্রহ বিষয়ে স্বভাবসিদ্ধ অনাসক্তি—যে সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষাবিদগণ প্রায়ই আক্ষেপ করে থাকেন—এর প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে—কি বাড়ী, কি স্কুল কোথাও আমাদের শিশুরা সুন্দর বইয়ের মুখ দেখতে পায় না। এই সমস্যাটি এত জটিল ও ব্যাপক যে এর সমাধানের জন্য আমাদের শিক্ষক, অভিভাবক, লেখক ও প্রকাশকদের এক সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হওয়া দরকার।"

পুস্তক সম্বন্ধে বুনিয়াদী শিক্ষার এই হল চিন্তাধারা। কাজেই বুনিয়াদী শিক্ষায় পুস্তককে আমল দেওয়া হয় না কথাটা ভিত্তিহীন।

বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা গ্রামের লোকদের জন্য আবিষ্কৃত এক প্রকার নিকৃষ্ট ধরণের শিক্ষা পরিকল্পনা একথাও নিতান্ত ভুল। একথা অবশ্য ঠিক যে প্রথম যখন বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ আরম্ভ হয়, তখন খের কমিটি বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলের জন্যই এই শিক্ষাকাজ পরিচালিত করতে নির্দ্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু আমাদের একথা মনে রাখতে হবে খের কমিটির সেই মতামত বুনিয়াদী শিক্ষার বিশেষ এক প্রারম্ভিক পর্য্যায়ে প্রকাশিত হয়েছিল। বুনিয়াদী শিক্ষাকর্ম্মিরা কখনও একথা বলেননি যে চিরকাল ধরে এই শিক্ষা কেবল গ্রামগুলোতেই চলবে। ভারতবর্ষ গ্রামপ্রধান দেশ—এই দেশে যদি বাধ্যতামূলক সার্ব্বজনীন শিক্ষা প্রচলিত হয়, তা হলে স্বভাবতই গ্রামের দিকে বেশী জোর পড়বে, কারণ সহর অঞ্চল আমাদের দেশে কতটুকু? বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ থেকে বুনিয়াদী শিক্ষাকেই যে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত জাতীয় শিক্ষার নমুনা বলে গ্রহণ করা হয়েছে একথা আমরা আগেই বলেছি। বুনিয়াদী শিক্ষার সারবত্তা উপলব্ধি করে সহরেও আজকাল বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলা হচ্ছে। ত্রিপুরার অধিকাংশ বুনিয়াদী স্কুলই যে সহর অথবা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ অঞ্চলে একথা সকলেই জানেন। অবশ্য একথা ঠিক যে সহরের বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আরব্ধ শিল্পকর্ম্মের সঙ্গে গ্রামের বুনিয়াদী শিল্পকর্ম্মের পার্থক্য থাকতে পারে। গ্রামাঞ্চলে কৃষিকাজের জন্য বেশী পরিমাণ জায়গা পাওয়া যায় বলে সেখানে স্কুলের তরফ থেকে কৃষিকাজ আরম্ভ করবার সুবিধা অনেক বেশী। সহর অঞ্চলে স্থানাভাব হেতু দারুশিল্প অথবা বস্ত্রশিল্প প্রবর্ত্তন করার সুবিধা বেশী। এ ছাড়া অন্য কোন রকম উদ্দেশ্য নেই। সহর অঞ্চলের কোন বিদ্যালয়ে যদি উপযুক্ত পরিমাণ জমি পাওয়া যায় তা হলে সেখানেও কৃষিকাজ করাতে কোন বাধা নাই। কাজেই অবস্থা বিশেষে শিল্পকাজের পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু মূল নীতি ও শিক্ষণপদ্ধতি দুইয়েরই এক হবে।

শহর অঞ্চল
ও
বুনিয়াদী শিক্ষা

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী কে. এল. শ্রীমালী যন্ত্রযুগে বুনিয়াদী শিক্ষার কয়েকটি বিশেষ অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতিসাধন করে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলো যে জাগতিক জীবনের ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গেছে একথা আমরা সকলেই জানি। কৃষি, শিল্প, জনস্বাস্থ্য, যানবাহন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইত্যাদি প্রত্যেক বিভাগেই পাশ্চাত্ত্য দেশগুলো প্রাচ্য দেশগুলোকে অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। অবশ্য আমাদের অতীত পরাধীনতা যে এই অনগ্রসরতার প্রধানতম কারণ একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু স্বাধীন ভারতে এই অনগ্রসরতা বেশী দিন থাকতে পারে না—শত বছরের অসম্পূর্ণতা আমাদের অল্প সময়ের মধ্যেই অপসারিত করতে হবে; এবং এর জন্য যে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন করা দরকার একথাও সকলেই স্বীকার করেন। দেশে আজ ব্যাপক শিল্প-প্রসারের চেষ্টা চলছে—সর্ব্বার্থসাধক একাধিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে—গ্রামাঞ্চলেও বৈদ্যুতিক শক্তি-পরিচালিত কৃষি ও কুটীরশিল্পের আবির্ভাব হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। যে ভারতবর্ষকে কৃষিপ্রধান গ্রাম্য অর্থনীতির দেশ হিসাবে বিদেশী শাসক রাখতে চেয়েছিল, সেই দেশের চেহারা অতি দ্রুত পরিবর্ত্তিত হতে চলেছে। এর ফলে ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হবে তার ফলও সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য এবং এই যুগান্তকারী ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে জাতির কর্ত্তব্য হচ্ছে নবযুগের উপযোগী শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন করা।

যন্ত্রযুগে বুনিয়াদী শিক্ষা

শিল্প ও কর্ম্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষা এই যুগপ্রয়োজনের দাবী মেটাতে পারে। দেশের বর্ত্তমান প্রয়োজনের অনুপাতে প্রায় সকল প্রকার অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনই যে কম একথা জাগতিক জীবনের যে-কোন দিকে চাইলেই চোখে পড়ে। প্রধান যে তিনটি

বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা গ্রামের লোকদের জন্য আবিষ্কৃত এক প্রকার নিকৃষ্ট ধরণের শিক্ষা পরিকল্পনা একথাও নিতান্ত ভুল। একথা অবশ্য ঠিক যে প্রথম যখন বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ আরম্ভ হয়, তখন খের কমিটি বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলের জন্যই এই শিক্ষাকাজ পরিচালিত করতে নির্দ্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু আমাদের একথা মনে রাখতে হবে খের কমিটির সেই মতামত বুনিয়াদী শিক্ষার বিশেষ এক প্রারম্ভিক পর্য্যায়ে প্রকাশিত হয়েছিল। বুনিয়াদী শিক্ষাকর্ম্মিরা কখনও একথা বলেননি যে চিরকাল ধরে এই শিক্ষা কেবল গ্রামগুলোতেই চলবে। ভারতবর্ষ গ্রামপ্রধান দেশ—এই দেশে যদি বাধ্যতামূলক সার্ব্বজনীন শিক্ষা প্রচলিত হয়, তা হলে স্বভাবতই গ্রামের দিকে বেশী জোর পড়বে, কারণ সহর অঞ্চল আমাদের দেশে কতটুকু? বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ থেকে বুনিয়াদী শিক্ষাকেই যে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত জাতীয় শিক্ষার নমুনা বলে গ্রহণ করা হয়েছে একথা আমরা আগেই বলেছি। বুনিয়াদী শিক্ষার সারবত্তা উপলব্ধি করে সহরেও আজকাল বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলা হচ্ছে। ত্রিপুরার অধিকাংশ বুনিয়াদী স্কুলই যে সহর অথবা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ অঞ্চলে একথা সকলেই জানেন। অবশ্য একথা ঠিক যে সহরের বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আরব্ধ শিল্পকর্ম্মের সঙ্গে গ্রামের বুনিয়াদী শিল্পকর্ম্মের পার্থক্য থাকতে পারে। গ্রামাঞ্চলে কৃষিকাজের জন্য বেশী পরিমাণ জায়গা পাওয়া যায় বলে সেখানে স্কুলের তরফ থেকে কৃষিকাজ আরম্ভ করবার সুবিধা অনেক বেশী। সহর অঞ্চলে স্থানাভাব হেতু দারুশিল্প অথবা বস্ত্রশিল্প প্রবর্ত্তন করার সুবিধা বেশী। এ ছাড়া অন্য কোন রকম উদ্দেশ্য নেই। সহর অঞ্চলের কোন বিদ্যালয়ে যদি উপযুক্ত পরিমাণ জমি পাওয়া যায় তা হলে সেখানেও কৃষিকাজ করাতে কোন বাধা নাই। কাজেই অবস্থা বিশেষে শিল্পকাজের পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু মূল নীতি ও শিক্ষণপদ্ধতি দুইয়েরই এক হবে।

শহর অঞ্চল ও বুনিয়াদী শিক্ষা

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী কে. এল. শ্রীমালী যন্ত্রযুগে বুনিয়াদী শিক্ষার কয়েকটি বিশেষ অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতিসাধন করে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলো যে জাগতিক জীবনের ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গেছে একথা আমরা সকলেই জানি। কৃষি, শিল্প, জনস্বাস্থ্য, যানবাহন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইত্যাদি প্রত্যেক বিভাগেই পাশ্চাত্ত্য দেশগুলো প্রাচ্য দেশগুলোকে অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। অবশ্য আমাদের অতীত পরাধীনতা যে এই অনগ্রসরতার প্রধানতম কারণ একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু স্বাধীন ভারতে এই অনগ্রসরতা বেশী দিন থাকতে পারে না—শত বছরের অসম্পূর্ণতা আমাদের অল্প সময়ের মধ্যেই অপসারিত করতে হবে; এবং এর জন্য যে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন করা দরকার একথাও সকলেই স্বীকার করেন। দেশে আজ ব্যাপক শিল্প-প্রসারের চেষ্টা চলছে—সর্ব্বার্থসাধক একাধিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে—গ্রামাঞ্চলেও বৈদ্যুতিক শক্তি-পরিচালিত কৃষি ও কুটীরশিল্পের আবির্ভাব হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। যে ভারতবর্ষকে কৃষিপ্রধান গ্রাম্য অর্থনীতির দেশ হিসাবে বিদেশী শাসক রাখতে চেয়েছিল, সেই দেশের চেহারা অতি দ্রুত পরিবর্ত্তিত হতে চলেছে। এর ফলে ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হবে তার ফলও সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য এবং এই যুগান্তকারী ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে জাতির কর্ত্তব্য হচ্ছে নবযুগের উপযোগী শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন করা।

যন্ত্রযুগে বুনিয়াদী শিক্ষা

শিল্প ও কর্ম্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষা এই যুগপ্রয়োজনের দাবী মেটাতে পারে। দেশের বর্ত্তমান প্রয়োজনের অনুপাতে প্রায় সকল প্রকার অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনই যে কম একথা জাগতিক জীবনের যে-কোন দিকে চাইলেই চোখে পড়ে। প্রধান যে তিনটি

অপরিহার্য্য প্রয়োজন—অন্ন, বস্ত্র, আবাসস্থান—তার কোনটির দিক দিয়েই দেশ আমাদের সচ্ছল হয়নি। অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও প্রায় একই অবস্থা। উৎপাদন বাড়ান যে দেশের সামনে এক বিরাট সমস্যা একথা সকলেই স্বীকার করেন, এবং এই উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যাপারে ব্যাপক শিল্পীকরণ এখনই সম্ভব না হলেও কারিগরী বিদ্যা যে ছোটখাট অনেক কাজেই বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াতে পারে একথাও স্বীকার্য্য। বিভিন্ন পাওয়ার প্রজেক্টের রূপায়ণের ফলে আমাদের গ্রামাঞ্চলেও আজ বিদ্যুৎশক্তি ছড়িয়ে পড়ছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের কাজের সুবিধা যেমন একদিকে বাড়বে, অন্যদিকে তাদের বাড়তি জ্ঞান, কৌশল, দক্ষতা ইত্যাদি লাভের সম্ভাবনাও দেখা দেবে। কৃষিকাজ-পদ্ধতির রূপান্তর, সার ব্যবহার, জমি-সংরক্ষণ প্রচেষ্টা, সরল পশুপালন, পণ্য বিক্রীর বন্দোবস্ত ইত্যাদি প্রত্যেকটি কাজেই আশা করা যায় নিকট-ভবিষ্যতে যুগান্তকারী সব পবিবর্ত্তন সাধিত হবে। মোটর মেশিন, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যবহারের বাস্তব প্রয়োজন থেকেই আমাদের কারিগরী বিষয়ে দক্ষতা অর্জ্জন করতে হবে। যন্ত্রশিল্পের আবির্ভাবের ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমাজজীবনে এই যে অবস্থান্তর ঘটতে যাচ্ছে, বুনিয়াদী শিক্ষার ফলে সেই পরিবর্ত্তিত অবস্থায় ভাবী নাগরিকদের কোন অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই। আমরা একথা বলতে পারি যে বুনিয়াদী শিক্ষা শিল্পকর্ম্মের মধ্য দিয়ে ভাবী নাগরিকদের যুগোপযোগী প্রস্তুতিমূলক ট্রেনিং দিচ্ছে।

জাতীয় জীবনের যে সময়ে প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় সব ক্ষেত্রেই অপ্রতুল, তখন শিশুবয়স থেকে ছেলে-মেয়েদের সামর্থ্য অনুযায়ী উৎপাদনাত্মক শিল্পকর্ম্মে শিক্ষা দেওয়ার সুফল অবশ্যই আছে। একটা কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বর্ত্তমান উৎপাদন-স্বল্পতার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে

উৎপাদনের কাজে হাত লাগছে কম। সে ক্ষেত্রে শৈশবের এই কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষার উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে শৈশব থেকে শিল্পকাজ করার ফলে ছেলেমেয়েদের যন্ত্রপাতি, কলকব্জার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি হয় এবং আংশিকভাবে কারিগরী কাজে তারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তাঁত, চরকা ও অন্যান্য হাতিয়ার সব সময়ই তাদের ব্যবহার করতে হয়—এবং দরকার হলে এগুলোকে সারাই করে কাজের উপযোগী করেও রাখতে হয়। নিছক জ্ঞানমুখী উচ্চশিক্ষার পরিবর্ত্তে দেশে যখন কারিগরী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কথা আজ সকলেই বলছেন তখন শিশুশিক্ষার স্তরে এই ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। শ্রীযুত শ্রীমালী একথা বলেছেন—"...Basic education makes a positive effort to promote industrial production by introducing the children to the actual methods of production from the very initial stages of their education. It develops those qualities of character and habits of work which will make a person successful in an industrial society." কাজেই আমরা যদি অন্য সব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ নাও করি, তা হলে কেবলমাত্র বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের ব্যবহারিক উৎকর্ষতার দিক থেকেও বুনিয়াদী শিক্ষার এই ঐতিহাসিক অবদানকে স্বীকার করতে হয়।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলো আবাসিক হলে কাজের সুযোগ আরও বেড়ে যেত এবং এই শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো আরও সার্থকভাবে রূপ পেত। মূল শিল্পকাজগুলো তা হলে আরও ব্যাপকভাবে করার অবকাশ ঘটত এবং বিদ্যালয়গুলোও সত্যিকার যৌথ সমাজজীবনে পরিণত হবার সুযোগ পেত। প্রবীণ বুনিয়াদী শিক্ষাব্রতী শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত বুনিয়াদী শিক্ষার ফলে শিশুরা যেসব গুণাবলী অর্জ্জন করতে পারে তার

অপরিহার্য্য প্রয়োজন—অন্ন, বস্ত্র, আবাসস্থান—তার কোনটির দিক দিয়েই দেশ আমাদের সচ্ছল হয়নি। অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও প্রায় একই অবস্থা। উৎপাদন বাড়ান যে দেশের সামনে এক বিরাট সমস্যা একথা সকলেই স্বীকার করেন, এবং এই উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যাপারে ব্যাপক শিল্পীকরণ এখনই সম্ভব না হলেও কারিগরী বিদ্যা যে ছোটখাট অনেক কাজেই বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াতে পারে একথাও স্বীকার্য্য। বিভিন্ন পাওয়ার প্রজেক্টের রূপায়ণের ফলে আমাদের গ্রামাঞ্চলেও আজ বিদ্যুৎশক্তি ছড়িয়ে পড়ছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের কাজের সুবিধা যেমন একদিকে বাড়বে, অন্যদিকে তাদের বাড়তি জ্ঞান, কৌশল, দক্ষতা ইত্যাদি লাভের সম্ভাবনাও দেখা দেবে। কৃষিকাজ-পদ্ধতির রূপান্তর, সার ব্যবহার, জমি-সংরক্ষণ প্রচেষ্টা, সরল পশুপালন, পণ্য বিক্রীর বন্দোবস্ত ইত্যাদি প্রত্যেকটি কাজেই আশা করা যায় নিকট-ভবিষ্যতে যুগান্তকারী সব পরিবর্ত্তন সাধিত হবে। মোটর মেশিন, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যবহারের বাস্তব প্রয়োজন থেকেই আমাদের কারিগরী বিষয়ে দক্ষতা অর্জ্জন করতে হবে। যন্ত্রশিল্পের আবির্ভাবের ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমাজজীবনে এই যে অবস্থান্তর ঘটতে যাচ্ছে, বুনিয়াদী শিক্ষার ফলে সেই পরিবর্ত্তিত অবস্থায় ভাবী নাগরিকদের কোন অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই। আমরা একথা বলতে পারি যে বুনিয়াদী শিক্ষা শিল্পকর্ম্মের মধ্য দিয়ে ভাবী নাগরিকদের যুগোপযোগী প্রস্তুতিমূলক ট্রেনিং দিচ্ছে।

জাতীয় জীবনের যে সময়ে প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় সব ক্ষেত্রেই অপ্রতুল, তখন শিশুবয়স থেকে ছেলে-মেয়েদের সামর্থ্য অনুযায়ী উৎপাদনাত্মক শিল্পকর্ম্মে শিক্ষা দেওয়ার সুফল অবশ্যই আছে। একটা কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বর্ত্তমান উৎপাদন-স্বল্পতার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে

উৎপাদনের কাজে হাত লাগছে কম। সে ক্ষেত্রে শৈশবের এই কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষার উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে শৈশব থেকে শিল্পকাজ করার ফলে ছেলেমেয়েদের যন্ত্রপাতি, কলকব্জার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি হয় এবং আংশিকভাবে কারিগরী কাজে তারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তাঁত, চরকা ও অন্যান্য হাতিয়ার সব সময়ই তাদের ব্যবহার করতে হয়—এবং দরকার হলে এগুলোকে সারাই করে কাজের উপযোগী করেও রাখতে হয়। নিছক জ্ঞানমুখী উচ্চশিক্ষার পরিবর্ত্তে দেশে যখন কারিগরী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কথা আজ সকলেই বলছেন তখন শিশুশিক্ষার স্তরে এই ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। শ্রীযুত শ্রীমালী একথা বলেছেন—"···Basic education makes a positive effort to promote industrial production by introducing the children to the actual methods of production from the very initial stages of their education. It develops those qualities of character and habits of work which will make a person successful in an industrial society." কাজেই আমরা যদি অন্য সব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ নাও করি, তা হলে কেবলমাত্র বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের ব্যবহারিক উৎকর্ষতার দিক থেকেও বুনিয়াদী শিক্ষার এই ঐতিহাসিক অবদানকে স্বীকার করতে হয়।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলো আবাসিক হলে কাজের সুযোগ আরও বেড়ে যেত এবং এই শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো আরও সার্থকভাবে রূপ পেত। মূল শিল্পকাজগুলো তা হলে আরও ব্যাপকভাবে করার অবকাশ ঘটত এবং বিদ্যালয়গুলোও সত্যিকার যৌথ সমাজজীবনে পরিণত হবার সুযোগ পেত। প্রবীণ বুনিয়াদী শিক্ষাব্রতী শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত বুনিয়াদী শিক্ষার ফলে শিশুরা যেসব গুণাবলী অর্জ্জন করতে পারে তার

একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। অবশ্য একথা ঠিক যে পুরোপুরিভাবে এই সব গুণাবলী কেবলমাত্র আবাসিক বিদ্যালয়েই শিশুদের অর্জ্জন করা সম্ভব। আমরা কয়েকটি গুণাবলী এখানে উদ্ধৃত করছি।

১। সুগঠিত, স্বাস্থ্যপূর্ণ চটপটে দেহ হবে এদের (শিশুদের)। এরা কঠিন শারীরিক শ্রম করতে পারবে।

২। গ্রাম্য অর্থনীতিতে কুটীরশিল্পের স্থান এবং নব-পরিকল্পিত গ্রামকেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পিছনে যে জীবনদর্শন আছে সে সম্পর্কে এরা সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারবে।

৩। এরা কার্পাস থেকে বস্ত্র তৈরী করার সকল প্রক্রিয়াই শিখবে।

৪। নিজেদের সুষম খাদ্যের জন্য যথেষ্ট শাকসব্জী এরা উৎপন্ন করতে পারবে।

৫। এরা রান্না করার নিপুণতা ও তৎসম্পর্কিত সকল প্রকার জ্ঞান লাভ করবে। কি করে আহার্য্য ভাঁড়ারে রাখতে হয়, রাঁধতে হয়, পরিবেশন করতে হয় তা এরা শিখবে এবং রান্নাঘর-সম্পর্কিত সমুদয় হিসাবপত্র রাখা এবং বাজেট তৈরী করতে সক্ষম হবে।

৬। খাদ্যবিজ্ঞান এবং ব্যক্তিগত ও জনস্বাস্থ্য-সম্পর্কিত মূল তত্ত্বগুলি এরা শিখবে।

৭। এরা প্রাথমিক চিকিৎসা, সাধারণ লোকের পরিচর্য্যা ও চিকিৎসা করতে শিখবে।

৮। এরা সমবায় সমিতি পরিচালনের নীতিগুলি শিখবে, সমবায় ভাণ্ডার পরিচালনা ও তার হিসাবপত্রাদি রাখতে শিখবে।

৯। এরা সুস্পষ্ট ভাষায় দ্রুত জনসভাতে বক্তৃতা দিতে পারবে।

১০। এরা সুস্পষ্ট ভাষায় নিজের মনোভাব লিখিতভাবে প্রকাশ করতে পারবে এবং বিবরণাদি লিখতে পারবে।

১১। মাতৃভাষায় ভাল সাহিত্যের রসগ্রহণ এরা করতে পারবে এবং হিন্দুস্থানীতে কাজ চালাবার মত জ্ঞান এদের থাকবে।

১২। এরা সমবেত প্রার্থনা করতে ও জাতীয় সঙ্গীত গাইতে শিখবে।

১৩। চিত্রের রসগ্রহণের ক্ষমতা ও চিত্রাঙ্কনে দক্ষতা এদের জন্মাবে।

১৪। এরা বিদ্যালয়ের ও গ্রামের উৎসব পরিকল্পনা ও পরিচালনা করতে শিখবে।

১৫। সাময়িক পত্রিকাদি পাঠ এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে এরা জগতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভ করবে।

১৬। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির যন্ত্রবিজ্ঞান এরা শিখবে।

১৭। তুলা-উৎপাদন, রান্না, মূল উদ্যোগ, বাগানের কাজ, ব্যক্তিগত ও গ্রাম্য স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এরা মৌলিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির সঙ্গে পরিচিত হবে।

১৮। অন্নবস্ত্র-সম্পর্কিত প্রক্রিয়াদির মধ্য দিয়ে এরা ভারত ও পৃথিবীর ভূগোলের সঙ্গে পরিচিত হবে।

১৯। এরা বুদ্ধিযুক্তভাবে সংবাদপত্র ও পত্রিকাদি ব্যবহার করতে পারবে।

২০। ভারতবর্ষের জাতীয়তার ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান এদের জন্মাবে।

২১। এরা বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং সাম্প্রদায়িক সংহতির জন্য উদ্যোগী হবে।

২২। এরা বর্ণভেদের কুসংস্কার মুক্ত হবে।

২৩। গ্রাম ও গ্রাম্য পরিবেশের প্রতি এদের ভালবাসা থাকবে এবং গ্রামে থেকে গ্রামের সেবা করার জন্য এরা ইচ্ছুক হতে পারে।

সর্ব্বশেষ কথা হচ্ছে এই যে বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি এবং পদ্ধতিসমূহকে একটা পরীক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষার তত্ত্ব একটি শাশ্বত অপরিবর্ত্তনীয় মন্ত্র নয়। এর মধ্যে কোন রক্ষণশীলতা নেই। একটি গতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার যে বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার বুনিয়াদী শিক্ষায়ও সেগুলো থাকতে হবে। জীবন ও শিক্ষার মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। জীবন গতিশীল—যুগে যুগে তার শুভ জয়যাত্রা নূতন রূপে উদ্ভাসিত হচ্ছে। কাজেই শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্যও যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হয়। এই সহজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে কাজ না করলে বুনিয়াদী শিক্ষার সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বুনিয়াদী বিদ্যালয় সংগঠন

গতানুগতিক বিদ্যালয় বলতে আমরা বৃটিশ আমলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকেই মনে করব। এ কথা সর্ব্বজনবিদিত যে তদানীন্তন সরকার প্রাথমিক শিক্ষাসংস্কারকে জাতীয় সমস্যা বলে মনে করতেন না এবং জনসাধারণেরও এ বিষয়ে আগ্রহের তেমন বিশেষ আধিক্য ছিল না। যে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র একদল রাজভক্ত সরকারী কর্ম্মচারী সৃষ্টি করা সেই শিক্ষার কাছে যুগের দাবী পূরণের আশা করা দুরাশা মাত্র। ফলে অনেক গলদ সেখানে ঢুকেছিল এবং সেগুলো মোটামুটি হচ্ছে এই—

১। শিশুদের সামগ্রিক বিকাশের পরিবর্ত্তে লিখন, পঠন ও গণিতের উপর বেশী জোর দেওয়া হত।

২। বয়স, যোগ্যতা এবং প্রবণতার আলোকে শিশুদের লেখা-পড়ার সুযোগ দেওয়া হত না। পাইকারী ঢালাই ব্যবস্থার ফলে সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ লাভের সুযোগ অনেকেই পেত না।

৩। বিদ্যালয়ে প্রাধান্য ছিল বই, পাঠ্যতালিকা এবং শিক্ষকের—শিশুর নয়।

৪। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষক শিশুর কাছ থেকে ভয় ও ভক্তি হয়তো পেতেন, কিন্তু ভালবাসা পেতেন না। কারণ শিশুর বিচিত্র মনোজীবনে প্রবেশ করতে হলে শিশুমনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে যে অন্তর্দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন, আগের দিনে শিক্ষক মহলে তার অনুশীলনের ব্যাপক কোন সুযোগ ছিল না।

৫। সামান্য মাত্রাভেদে শাস্তিদানের প্রথা সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে এই পীড়নের ইতিহাস একদিকে যেমন কৌতুকাবহ অন্যদিকে তেমনই মর্ম্মান্তিক।

৬। পরীক্ষায় পাশ অথবা ফেলের মধ্যেই ছাত্রের কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ থাকত এবং কর্ম্মক্ষমতা, উদ্ভাবনীশক্তি, সামাজিকতা ইত্যাদির চেয়ে পাঠ্যপুস্তক এবং তোতাবৃত্তির উপরই জোব দেওয়া হত বেশী।

৭। স্বাধীনতা এবং আত্মপ্রকাশেব সুযোগের অভাবে শিক্ষার্থীব ব্যক্তিতা ও বহুমুখী সুপ্ত সম্ভাবনা বিকাশ লাভের কোন সহজ মুক্ত পথ পেত না।

৮। এর ফলে স্বভাবতঃই শিক্ষা ছিল কষ্টকল্পিত এবং বাস্তববোধ-বর্জ্জিত। জীবনের প্রয়োজনবোধের সঙ্গে এর কোন সেতুমুখ ছিল না।

৯। শিক্ষা ছিল বিদ্যালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ—সমাজ ও প্রাকৃতিক জগতে একে সম্প্রসারিত করার কোন চেষ্টা করা হয় নি।

১০। সর্ব্বোপরি, রবীন্দ্রনাথের কথার প্রতিধ্বনি কবে বলা যায়—শিশুর কাছে বিদ্যালয় ছিল শত শৃঙ্খলবেষ্টিত কারাগারের মত—বিপুল প্রাণের স্পন্দনমুখর আনন্দ-নিকেতন নয়। কাজেই শিশুরা স্কুলকে ভয় করত, ভালবাসত না। পথে 'হল্লা' হত ছুটির পব—স্কুলে আসবার সময় নয়।

এসব অভাব দূর করার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে নীতিগতভাবে যেসব সংস্কারের কথা নূতন শিক্ষায় বলা হয়েছে তার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। এবার আমরা বিদ্যালয় সংগঠনের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব।

স্থান—সহর অথবা গ্রাম যে-কোন অঞ্চলেই যে বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এ কথা আগেই স্বীকার করা হয়েছে।

যেখানেই হোক্ না কেন বিদ্যালয়ের স্থান লোকালয়ের কেন্দ্রস্থলে যাতায়াতের সুবিধাজনক স্থানে নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। জলাভূমি, বড় রাস্তা, বাজার অথবা শ্মশান ইত্যাদির কাছে কোন স্কুল থাকা উচিত নয়—বড় রাস্তার পাশে বাই-লেনে স্কুল থাকলে ভাল হয়। ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ ও বিদ্যালয় পরিবর্দ্ধনের দিকে লক্ষ্য রেখে স্থান নির্দ্দিষ্ট করা উচিত।

জমির আয়তন—একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে গতানুগতিক বিদ্যালয় থেকে বেশী জমিব প্রয়োজন হয় ক্ষেতের কাজ, বাগানের কাজ, আবাসিক বন্দোবস্ত ইত্যাদি প্রয়োজন মেটাবার জন্য একটি নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কমপক্ষে ছয় বিঘা জমি থাকা দরকার। খেলার মাঠও এর মধ্যেই থাকবে। উচ্চ-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে জমির প্রয়োজন আরও বেশী—কমপক্ষে দশ বিঘা। সহর অঞ্চলে জমির অভাবের জন্য ক্ষেতেব কাজ করান কঠিন হয়। কিন্তু তা হলেও সেখানেও কমপক্ষে ছয় বিঘা জমি না হলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজ কবা অসুবিধাজনক হবে।

বিদ্যালয় ভবন—বিদ্যালয় ভবন স্বাস্থ্যসম্মত, মজবুত এবং আকর্ষণীয় হওয়া উচিত। বাড়ীটি দক্ষিণ-পূর্ব্বমুখী হলে সবচেয়ে ভাল হয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অনেক সময় শিশুদের মাটিতে বসে কাজ করতে হয়। কাজেই মেঝে সব সময়ই পাকা হওয়া উচিত। শিশুরা আবার কখন কখন দলে ভাগ হয়ে কাজ করে; তখন বারান্দায় বসেও তাদের কাজ করতে হয়। কাজেই বারান্দাটি কমপক্ষে আট ফুট চওড়া হওয়া উচিত। টিনের চাল স্বাস্থ্যের দিক থেকে খুব গ্রহণীয় না হলেও স্থায়িত্ব বিচার করে ও ক্রমাগত মেরামতের খরচ কমাবার জন্য টিনের চালই সুবিধাজনক। অবশ্য চালের নীচে তাপ প্রতিরোধের জন্য সিলিং অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। শ্রেণীকক্ষগুলো ২৫′×২০′ আয়তনের হলে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ

জন শিক্ষার্থীর জন্য জায়গা হতে পারে। ক্লাশের মধ্যবর্তী বেড়াগুলো যাতে সহজেই অপসারিত করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। অনেক বিদ্যালয়ে স্থানাভাবের জন্য কোন সভাকক্ষ থাকে না। এই সব স্কুলে সহজে অপসারণযোগ্য বেড়া থাকলে প্রয়োজনমত হলঘর তৈরী করে নেওয়া যায়। হলঘর করতে হলে কমপক্ষে ৬০′×২০′ আয়তনের করা দরকার।

আট শ্রেণীর একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কমপক্ষে আটটি শ্রেণী-কক্ষ থাকা বাঞ্ছনীয়। অনেকে মনে করেন যে পাঁচটি ক্লাশঘর থাকলেই চলে—আর বাকী ক্লাশগুলো বাইরে গাছের ছায়ায়ও করা চলতে পারে। স্থায়ী শ্রেণীকক্ষের অভাবে শ্রেণীপাঠনার কাজ সুসমঞ্জস হওয়া খুবই দুরূহ। কাজেই পাঁচ কক্ষের প্রস্তাব আমাদের কাছে খুব যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। এ ছাড়া একটি অফিস-ঘর, একটি হলঘর, একটি বিজ্ঞানাগার ও একটি গ্রন্থাগারও থাকা উচিত। শিল্পকাজের জন্য একটি পৃথক শিল্পভবন থাকা উচিত, এবং এই শিল্পভবনের সঙ্গেই একটি ভাণ্ডারকক্ষ থাকা প্রয়োজন। একটি সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত শিল্পভবন ও ভাণ্ডারকক্ষ শিশুদের দায়িত্ব-পালন, শৃঙ্খলাবোধ, পরিচ্ছন্নভাবে কাজ করা, অপচয় নিবারণ ও সু-অভ্যাস গঠন ইত্যাদি বিষয়ে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করে। শিল্পভবনটি মূল বিদ্যালয় থেকে অবশ্যই কিছুটা দূরে হওয়া উচিত। এ ছাড়া যদি সম্ভব হয় তা হলে একটি স্থায়ী যাদুঘরও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে থাকতে পারে।

আসবাবপত্র—শিশুদের বসবার আসন দুজনের বসবার উপযোগী ড্রয়ার সহ যুক্ত ডেস্ক্ ও বেঞ্চ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনেক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য মাটিতে চাটাই ও নীচু ডেস্কে বসবার বন্দোবস্ত আগে থেকেই করা হয়েছে। কিন্তু এই বন্দোবস্ত স্বাস্থ্য-সম্মত বলে বিবেচিত হতে পারে না। অনেক সময়ই দেখা যায় এই

বন্দোবস্তে শিশুরা কাৎ হয়ে বেঁকে বসে ও অনেকক্ষণ বসতে অস্বস্তি বোধ করে। পা গুটিয়ে বসতে হয় বলে পায়ে অতিরিক্ত চাপ পড়ে এবং রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরে। তা ছাড়া আমাদের দেশে অনেক স্কুলের মেঝেই এখনও পাকা নয়। ধীরে ধীরে এই সব চাটাই ও নীচু ডেস্‌ক্ বিদ্যালয় থেকে সরিয়ে নেওয়া দরকার। অবশ্য কর্ম্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে এই সব ডেস্‌কের একটা সুবিধা হচ্ছে এই যে সুবিধামত এগুলোকে একপাশে সরিয়ে ক্লাশে শিল্প অথবা হাতের কাজের জন্য জায়গা করে নেওয়া যায়। কিন্তু কোন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় এই ধরণের আসবাবপত্র শিশু-বিদ্যালয়ে থাকতে পারে কিনা তা ভাববার বিষয়। বসবার আসনগুলো বয়স অনুযায়ী হওয়া উচিত।

এ ছাড়া আমরা এখানে আধুনিক শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে কয়েকটি সামগ্রীর উল্লেখ করছি—

১। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে সামনেব বারান্দায় কয়েকটি বুলেটিন বোর্ড থাকা প্রয়োজন। এই বুলেটিন বোর্ডে দেশবিদেশের খবর, আবহাওয়ার খবর, উল্লেখযোগ্য সাধারণ জ্ঞানের খবর, বিদ্যালয়ের দেয়াল পত্রিকা ইত্যাদি থাকতে পারে। এই সব বুলেটিন বোর্ডে প্রদত্ত সংবাদ, তথ্য ও সুনির্ব্বাচিত ছবি শিশুদের কৌতূহল জাগ্রত করে এবং তাদের স্বাধীনভাবে তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টাকে উদ্দীপিত করে।

২। এই বুলেটিন বোর্ডের পাশে ছোট প্রদর্শনী টেবিলে উল্লেখ-যোগ্য কৌতূহলোদ্দীপক ছোটখাট জিনিস থাকতে পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে এই টেবিলে যাতে একসঙ্গে অনেকগুলো জিনিস না থাকে।

৩। প্রত্যেক ক্লাশেই প্রদীপন ও চিত্রসম্বলিত উপকরণাদি

টানাবার জন্য দেয়ালে বোর্ডফ্রেম বাঁধিয়ে রাখা যায়। কোন কোন প্রদীপন প্রয়োজনমত একাধিক দিন এই ফ্রেমে টাঙিয়ে রাখা যায়—পেরেক অথবা লোহায় সেগুলো নষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

৪। শ্রেণীকক্ষে প্রকৃতিকোণ, সংগৃহীত দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য জিনিসপত্র রাখবার জন্য যে সব ছোট টেবিল ও আলমারীর প্রয়োজন হবে সেগুলো শ্রেণীশিক্ষকগণ প্রয়োজন অনুযায়ী করে নিতে পারেন।

৫। আসল কথা হচ্ছে এই যে শিশুদের ব্যবহার করতে হয় এমন প্রত্যেকটি জিনিসের জন্যই একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকা প্রয়োজন। ভাণ্ডারকক্ষের জিনিস থেকে আরম্ভ কবে শ্রেণী-পাঠনার প্রদীপন সব কিছুই একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে সুশৃঙ্খল অবস্থায় থাকলে শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে কতগুলো সুঅভ্যাস গড়ে ওঠে। কাজেই একথা বলা বাহুল্য যে আসবাব-পত্রগুলোও শিশুদেব প্রয়োজন অনুযায়ী হওয়া উচিত। গ্রন্থাগারেও শিশুদের জন্য একপ্রস্থ ছোট চেয়ার থাকা দরকার।

৬। স্কুলের সামনের বারান্দায় একটি টেবিল ও বড় আয়নাও থাকা প্রয়োজন। পাশে সাবান ও তোয়ালে থাকবে। টেবিলে কয়েকখানা চিরুণী থাকবে। আয়নাটি থাকলে শিশুরা সব সময়ই দেখতে পারে তারা মার্জ্জিত অবস্থায় আছে কিনা। আয়নাটি বেশ বড় হওয়া দরকার যাতে সব বয়সের শিশুরাই নিজেদের দেখতে পারে।

এ ছাড়া পানীয় জল, খেলার সামগ্রী, শিল্পকাজের যন্ত্রপাতি, পতাকাদণ্ড ইত্যাদি যে প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অবশ্যই থাকবে একথা বলা বাহুল্য।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সাধারণ পরিবেশ—গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শই বর্ত্তমান সমাজের তথা রাষ্ট্রের চরম লক্ষ্য। বুনিয়াদী শিক্ষাকে আমরা যদি জীবন-কেন্দ্রিক শিক্ষা বলে গ্রহণ করে থাকি, তা হলে একথাও মানতে হবে যে—আজকের শিশুকে একটি গণতান্ত্রিক সমাজের ভাবী উপযুক্ত নাগরিক করে তুলতে এই শিক্ষার সাহায্য করা উচিত। এজন্য আমাদের বিদ্যালয়গুলোকেও একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক পরিবেশে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। অনেকে বর্ত্তমান দিনের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে শিশুরাষ্ট্র হিসাবে অভিহিত করে থাকেন। জন ডিউই বলেছেন যে বিদ্যালয়ে শিশুদের সুখী করে তুলতে পারলেই সব হল—আর যা বাকী রইল তা আপনা থেকেই আসবে। রবীন্দ্রনাথও এই ধরণের আনন্দমুখর শিশু-নিকেতনের কল্পনা করতেন। কাজেই প্রত্যেকটি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এমন একটি পরিবেশ গঠিত হওয়া দরকার যে পরিবেশে শিশুরা নির্ভীক ও আনন্দিত চিত্তে দিনের পর দিন বেড়ে উঠতে পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে এই পরিবেশে শিশুরা নিজেদের রুচি, প্রবণতা ও যোগ্যতা অনুসারে সমষ্টিগত জীবনের সঙ্গে মিল রেখে ব্যক্তিগত জীবনে বিকাশ লাভের সুযোগ পায়। একে অপরের প্রতি সহিষ্ণু ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া, সহযোগিতার ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের সমাজজীবনের বুনিয়াদ গড়ে তোলা—এই হবে পবিবেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর এই পটভূমিকায় শিক্ষক আদর্শ উপদেষ্টা, বন্ধু ও পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে শিশুদের জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা করবেন। শিশুর মত তিনিও এই সমাজজীবনের একজন সক্রিয় সভ্য। নায়ক হিসাবে বিদ্যালয়-জীবনের বিভিন্ন বিভাগগুলো—যেমন স্বাস্থ্য, সাফাই, খেলা, সংস্কৃতি, শিল্প ইত্যাদি হয়তো শিশুরাই পরিচালিত করছে, কিন্তু শিক্ষকের সহযোগিতা না পেলে শিশুদের পক্ষে এগুলো করা যে অসম্ভব একথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তাঁকে এমনভাবে

অংশ গ্রহণ করতে হবে যাতে শিশুরা বুঝতে পারে যে তিনি তাদের একজন নির্ভরযোগ্য বন্ধু—উচ্চ ক্ষমতাসীন ভাগ্যনিয়ন্তা নন। এই রমণীয় পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে প্রত্যেকটি শিক্ষাকর্ম্মীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা

বিদ্যালয় পরিচালনার বিষয়ে প্রধান শিক্ষক কর্ণধার। সহজ ও স্বাভাবিকভাবে নেতৃত্ব করবার যোগ্যতা ছাড়া যে গুণাবলী তাঁর পক্ষে অত্যাবশ্যক তা হচ্ছে নিজের কাজে পরিপূর্ণ দক্ষতা এবং সহকর্ম্মিগণকে অনুপ্রাণিত করবার অখণ্ড বিশ্বাস ও উদ্দীপনা। তাঁকে চিন্তাশীলতা এবং সংগঠন-প্রতিভা দুই দিকেই উৎকর্ষতা লাভ করতে হবে। বলা বাহুল্য সহকারী শিক্ষকগণের উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক হিসাবে তাঁকে যথাসম্ভব তৎপর হতে হবে। সহকর্ম্মিগণের অকুণ্ঠ আস্থা এবং সহযোগিতা অর্জন করতে না পারলে তাঁর পক্ষে কোন বিষয়ে সাফল্য অর্জন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যে-কোন আদর্শ বিদ্যালয়ে একটি ঘরোয়া ভাব, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও রমণীয় পরিবেশ থাকা প্রয়োজন। প্রধান শিক্ষক মনে রাখবেন তাঁর কাজ হবে অনুরোধে—আদেশে নয়। তাঁর সততা, ন্যায়পরায়ণতা, পাণ্ডিত্য এবং সহৃদয়তায় সকলের বিশ্বাস স্থাপিত না হলে যুগপৎ শিক্ষক ও ছাত্রসমাজকে পরিচালিত করা তাঁর পক্ষে খুবই মুস্কিল হবে। তাঁর আদর্শ ও কর্ম্মনিষ্ঠা এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সমাজের কাছেও দৃষ্টান্তস্থল হয়। যে-কোন শিক্ষাকেন্দ্রের প্রধানের পক্ষে উপরিলিখিত গুণাবলী অপরিহার্য্য।

বিদ্যালয়ের প্রায় সব কাজের সঙ্গেই প্রধান শিক্ষকের বিশেষ যোগাযোগ রাখা প্রয়োজন। তবু বিশেষ কয়েকটি কাজের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি।

১। তাঁকে রোজ অন্ততঃপক্ষে দুই-তিন ঘণ্টা (period) করে ক্লাশে পড়াতে হবে।

২। মাঝে মাঝে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর কাজের উন্নতির পরীক্ষা করবেন।

৩। তিনি সহকারী শিক্ষকগণের কাজ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তত্ত্বাবধান করবেন। প্রয়োজনবোধে কাজের উন্নতিকল্পে তিনি উপযুক্ত পরামর্শ দেবেন। কাজটি এভাবে হতে পারে। প্রত্যেকটি সহকারী শিক্ষকের জন্য তিনি একখানা করে নোটবই রাখতে পারেন। কোন শিক্ষকের পাঠদান লক্ষ্য করে তিনি সেই পাঠ সম্বন্ধে নোটবইতে আপন মতামত লিখে রাখবেন এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে দেখিয়ে তাঁকে দিয়েও সই করিয়ে রাখবেন। শ্রেণীপাঠনা ছাড়া অন্যান্য কাজের বিষয়েও তিনি এইরূপ মতামত লিখে শিক্ষকদের দেখিয়ে রাখতে পারেন। শিক্ষক সমিতির বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ায় তিনি সহকারী শিক্ষকগণকে এই বিষয়টি খোলাখুলি বলেও দিতে পারেন যে এই পদ্ধতিতে তিনি অগ্রসর হবেন। এই ব্যবস্থায় অকারণ সন্দেহ ও পুলিশী মনোভাবের উদ্রেক হতে পারে না।

৪। বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব, ছাত্রসংখ্যা, ভর্ত্তির হিসাব, বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজন ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে তিনি সব সময়েই সচেতন থাকবেন। এই বিষয়ে সর্ব্বশেষ তথ্য সকলের গোচরীভূত করার উদ্দেশ্যে তিনি রেখাচিত্রের সাহায্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে বাৎসরিক সংখ্যাদি পরিবেশন করতে পারেন—ছাত্রসংখ্যা, আয়-ব্যয়, বিদ্যালয় ভবনের আয়তন, পুস্তকের সংখ্যা, শতকরা পাশের হার ইত্যাদি। প্রধান শিক্ষকের অফিস-ঘরে এই রেখাচিত্রটি থাকতে পারে।

৫। শিক্ষক সমিতির সহযোগিতায় তিনি বিত্তালয়ের আইন-কানুন প্রণয়ন করবেন।

৬। বিত্তালয়ের মূল লক্ষ্য কি—কোন্ ভিত্তির উপর বিত্তালয় সংগঠিত হবে—লেখাপড়া, শিল্পকাজ ইত্যাদি বিতর্কিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে বিত্তালয়ের মূল নীতি কি—এই সব বিষয়ে শিক্ষক সমিতির সভায় কতগুলো সুস্পষ্ট প্রস্তাব গৃহীত হওয়া উচিত। প্রধান শিক্ষকের এদিকে বিশেষ যত্নবান হওয়া দরকার, কারণ বুনিয়াদী শিক্ষার একাধিক বিষয় সম্বন্ধে বর্ত্তমানে সুস্পষ্ট মতামত ও চিন্তাধারার অভাব যে রয়েছে একথা অস্বীকাব করা যায় না। বিষয়টি নূতন। কাজেই খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয়ে বিত্তালয়েব একটি দ্বিধাহীন নীতি না থাকলে কাজে দানা বাঁধবে না।

৭। অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা প্রধান শিক্ষকের আর একটি প্রধান কাজ। তা ছাড়া উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষেব সঙ্গে পত্রাদি বিনিময়ের প্রশ্ন তো আছেই।

৮। প্রধান শিক্ষকের আর একটি প্রয়োজনীয় কাজ হচ্ছে গঠনমূলক ও সৃষ্টিধর্ম্মী চিন্তাধারার প্রবর্ত্তন করা এবং বিত্তালয়েব উন্নতিকল্পে নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করা। অতন্দ্র প্রহবীব মত তাঁর সদাজাগ্রত চিন্তাধারা ও নিষ্ঠা বিত্তালয়কে গতিশীল রাখবে। বুনিয়াদী শিক্ষার বর্ত্তমান প্রারম্ভিক পর্ব্বে এই গতিশীলতা না থাকলে বিত্তালয়গুলোর জীর্ণ অচলায়তনে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

৯। প্রত্যেক বুনিয়াদী বিত্তালয়ে একটি শিক্ষক সমিতি গঠিত হওয়া প্রয়োজন। সভাপতিরূপে প্রধান শিক্ষকের এই সমিতিকে আধুনিক শিক্ষার বাহন হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব সমধিক।

১০। এই সব কাজ ছাড়া বিদ্যালয়ের গতানুগতিক অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের সঙ্গেও যে প্রধান শিক্ষকের যোগাযোগ রাখতে হবে সে কথা বলা বাহুল্য। এ কাজগুলো হচ্ছে সময়সূচী নির্ম্মাণ, পাঠ্যতালিকার মান নির্দ্ধারণ, পরীক্ষা পরিচালনা, শিল্পকাজের হিসাব, মেরামতের কাজকর্ম্ম ইত্যাদি।

সহকারী শিক্ষক ও শিক্ষক সমিতি

বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে সহকারী শিক্ষকের দায়িত্ব কম নয়। সহযোগী বন্ধু হিসাবে সহশিক্ষকের মর্য্যাদা প্রত্যেক আদর্শ বিদ্যালয়েই স্বীকৃত হয়েছে। তাঁর প্রধান কর্ত্তব্য আগ্রহ ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁর উপর ন্যস্ত কাজ প্রতিপালন করা। বিদ্যালয়ের কোন ব্যবস্থা যদি তাঁর নিকট আপত্তিকর বা অবাঞ্ছিত মনে হয় তা হলে সে সম্পর্কে যোগ্য সহকর্ম্মী হিসাবে বন্ধুভাবাপন্ন আলোচনার দ্বারা সেই ত্রুটি সংশোধনে তিনি প্রয়াসী হবেন। সহকারী শিক্ষকগণের যদি শিক্ষাসাধনায় আন্তরিক নিষ্ঠা না থাকে তা হলে বিদ্যালয়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হতে পারে না—স্কুল শেষ পর্য্যন্ত কলে পরিণত হয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের একটি মূল কথা হচ্ছে এই যে শিক্ষা প্রসারিত হবে জীবন থেকে জীবনে—মাথা থেকে মাথায় নয়। এইদিক থেকে প্রত্যেক বুনিয়াদী শিক্ষাকর্ম্মীর ব্যক্তিগত জীবনে আদর্শবাদের স্থান থাকা দরকার। শিশু মাত্রই অনুকরণপ্রিয়। অতি শৈশবে তারা বাবা-মার সান্নিধ্য লাভ করে, তারপর আসে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। শিশুদের কাছে বাবা, মা, বড় ভাইবোন, শিক্ষকমশায় সকলেই অনুকরণ করার মত নিকটতম আদর্শ-বিশেষ। এইজন্য শিক্ষকের কাজকর্ম্ম, আচরণ ও নিয়মশৃঙ্খলা শিশুর চরিত্র গঠনে অতি সহজেই প্রতিফলিত হয়। শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব শিশুকে সহজেই প্রভাবিত করে।

একথা বলাই বাহুল্য যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রত্যেকটি শিক্ষকের ট্রেনিংপ্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন।

প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকগণ শিক্ষক সমিতির সভায় এক সঙ্গে বসে বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজগুলোকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করে ফেলতে পারেন—

১। স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা
২। খেলাধূলা ও ব্যায়াম
৩। উদ্যান পরিকল্পনা এবং বিদ্যালয়ের সৌষ্ঠববৃদ্ধি
৪। শ্রেণীপাঠনা ও পাঠ পরিকল্পনা
৫। শিল্পকাজ সংগঠন ও উৎকর্ষতা
৬। গ্রন্থাগার, শ্রেণী পাঠাগার ও নীরব পঠন
৭। সাময়িকী ও পত্রিকাদি রচনা
৮। জাতীয় উৎসব, অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী
৯। পরীক্ষা পরিচালনা ও পর্য্যবেক্ষণের কাজ
১০। বিদ্যার্থী পরিষদ ও বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠা
১১। বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজজীবনের সংযোগ সাধন

অতঃপর এইসব কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য ছোট ছোট কয়েকটি উপসমিতি গঠন করে এক একটি উপসমিতির উপর বিশেষ কোন বিভাগের কাজের ভার দেওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য একই শিক্ষককে একাধিক উপসমিতিতে কাজ করতে হবে। নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষকসংখ্যা কম থাকে বলে উপসমিতি গঠনের প্রশ্ন আসে না। সেখানে শিক্ষক সমিতি সামগ্রিকভাবে সবগুলো কাজই গ্রহণ করতে পারেন। মনে রাখতে হবে এইসব কাজে সংশ্লিষ্ট ছাত্রনায়কদের সক্রিয় অংশগ্রহণের অবকাশ থাকবে।

উচ্চ-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যেখানে শিক্ষকসংখ্যা বেশী সেখানে এভাবে কর্ম্মবন্টন করে বিদ্যালয় পরিচালনা করা যেতে পারে। এতে পারস্পরিক সহযোগিতা বেড়ে ওঠে, সহকারী শিক্ষকগণ স্কুল পরিচালনা বিষয়ে সক্রিয় দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পান এবং শ্রম বিভাগের ফলে কর্ম্মসম্পাদনা অধিকতর প্রণালীবদ্ধ, নিয়মতান্ত্রিক ও সুশৃঙ্খল হয়। এতে বিদ্যালয়ের আদর্শগত মানদণ্ডের উন্নতি হয়।

বিশেষভাবে কয়েকটি বিভাগ সম্বন্ধে এখানে বিশদ আলোচনা করা হচ্ছে।

পাঠ্যতালিকা ও শ্রেণীপাঠনা

পাঠক্রম ও পাঠ্যতালিকার বিষয়ে সাধারণতঃ কোন বিদ্যালয়ের বলার বিশেষ কিছু থাকে না, কারণ প্রত্যেক বিদ্যালয়কেই বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত পাঠ্যতালিকা অনুসরণ করতে হয়। আজকাল অবশ্য আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান একই ছকে ফেলা বাঁধাধরা পাঠ্যতালিকা প্রত্যেক বিদ্যালয়কে যান্ত্রিক নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে হবে এমন কথা সমর্থন করে না। ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজনমত পাঠ্যতালিকায়ও বৈচিত্র্যের অবকাশ থাকতে পারে একথা সকলেই স্বীকার করেন এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের স্বাধীনতাও মেনে নেওয়া হয়। বিশেষ করে বুনিয়াদী শিক্ষায় প্রাসঙ্গিক শিক্ষার অবকাশ খুব বেশী বলে পাঠ্যতালিকার এই নমনীয়তা এক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। কিন্তু তা হলেও বর্ত্তমানে আমরা পাঠ্যতালিকার বন্ধন অপসারিত করতে পারি না, কারণ শিক্ষাধারার যে সুদৃঢ় বনিয়াদ ও যুগসঞ্চিত ঐতিহ্য গড়ে ওঠার পর পাঠ্যতালিকার দায়িত্ব স্কুলের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, সেই ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা আমাদের বিদ্যালয়সমূহে—বিশেষতঃ প্রারম্ভিক স্তরে—এখনও গড়ে ওঠে নি। তা ছাড়া শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা আমাদের দেশে মোটেই পর্য্যাপ্ত

নয়। কাজেই শিক্ষাব্যবস্থার বর্ত্তমান যুগসন্ধিক্ষণে বিশেষ কোন রকম লণ্ডভণ্ডকারী পরীক্ষার মধ্যে না গিয়ে পূর্ব্বনির্দ্ধারিত পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী কাজ করে যাওয়াই নিরাপদ। অবশ্য এই নিরাপদ রাস্তা ধরে চলার নাম পাঠ্যতালিকার উৎপীড়নকে স্বীকার করে নেওয়া নয়। শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে কাজ করলে পাঠ্যতালিকার পীড়ন-জর্জ্জরতা অনেকাংশে লাঘব করতে পারেন। বুনিয়াদী শিক্ষায় পাঠক্রম নির্ম্মাণের কাজ কি কি নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সে কথা সংক্ষেপে আলোচনা করে আমরা শ্রেণীপাঠনার সাংগঠনিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব।

"বুনিয়াদী শিক্ষার কথায়" বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো ব্যাখ্যা করে সংক্ষিপ্তাকারে লিখলে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি তথ্য পাব—

১। বিদ্যালয়ে শিশু তার সহজাত কর্ম্মপ্রবণতার চরিতার্থতালাভের সুযোগ পাবে। এমন পরিবেশ স্কুলে থাকবে যাতে শিশু বিভিন্ন রকম কাজ করার সুযোগ পায়। এর মধ্যে উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক দুরকম কাজই থাকবে। এই কাজের মাধ্যমে সে যে অভিজ্ঞতা লাভ করবে তার সঙ্গে পাঠ্য বিষয়ের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র থাকবে। এই অভিজ্ঞতাই হবে শিশুর জ্ঞানের প্রথম সোপান। ব্যক্তিগত বিকাশের জন্য এই কর্ম্মাবতারণা স্কুলে করতে হবে।

পাঠক্রম প্রণয়নের ভিত্তি

২। প্রত্যেক শিশুই আপন সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে অন্যের সামনে প্রকাশ করতে চায়। এই সৃষ্টিপ্রেরণা ও আত্মপ্রকাশের জন্য খেলা, গল্প, অভিনয়, পুতুলগড়া এবং অন্যান্য সৃজনাত্মক কর্ম্ম তার দরকার।

৩। শিশুকে পরিবেশ পর্য্যবেক্ষণ ও পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত

হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। স্বদেশের এবং বিদেশের মানুষের গল্প, তাদের জীবন, আশা-আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস তাকে জানতে হবে। বিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধ জীবনে যে অভিজ্ঞতা সে লাভ করে তাকে যথাসময়ে সম্প্রসারিত করতে হবে বৃহত্তর সমাজজীবনে—গৃহে ও লোকালয়ে।

৪। মাতৃভাষার উপর তাকে সুস্পষ্ট অধিকার লাভ করতে হবে যাতে সে সুশৃঙ্খলভাবে চিন্তা করতে পারে এবং নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। প্রাথমিক স্তরের পর উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহিত্যপুস্তক পাঠ, জাতির ইতিহাস অনুধাবন, সামাজিক ক্রিয়াকলাপে পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ ইত্যাদির জন্য মাতৃভাষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

৫। বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হবে কতগুলো স্বাস্থ্যকর ও রুচিসম্মত সু-অভ্যাস গঠনে শিশুদের সাহায্য করা। সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করা, পরমতকে সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করা, সমালোচনার সম্মুখীন হওয়া এবং দায়িত্ব নিয়ে কাজ করা—এই অভিজ্ঞতা শিশুদের পেতে হবে। উত্তরজীবনে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় আপনার নাগরিক দায়িত্ব পালন করতে হলে শৈশবের বিদ্যালয়-জীবনে এই অভিজ্ঞতা অপরিহার্য্য।

৬। বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুরা যাতে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে অবহিত হয় তার জন্য বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা ও সৌষ্ঠববৃদ্ধির কাজে শিশুদের নিজেদের হাত লাগান দরকার। এই সু-অভ্যাস স্কুল থেকে গৃহে সঞ্চারিত হওয়া প্রয়োজন।

৭। ব্যক্তিগত বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে শিশুশিক্ষার পরিকল্পনা রচিত হবে। বয়স, সামর্থ্য ও প্রবণতার উপর ভিত্তি করে লেখাপড়ার কাজ চলবে।

নেওয়া যায়। এখন, পাঠ্যতালিকায় নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয়ের বিশেষ পাঠ-গুলোকে (topics) প্রয়োজনীয় পাঠসংখ্যায় বিস্তৃত করে এই মোট বাৎসরিক পিরিয়ড সংখ্যার মধ্যে সুবিধামত ভাগ করে দেওয়া যায়। মনে করুন তৃতীয় শ্রেণীর ইতিহাস পাঠ্যতালিকায় মোট ১০টি বিষয় অথবা টপিক আছে। কোন শিক্ষক অনুমান করে দেখলেন যে এই ১০টি বিষয় ভালমত পড়াতে হলে সারা বছরে তাঁর অন্ততঃ ৬০টি পাঠের (lesson) দরকার। সারা বছরে বর্ত্তমানে আমরা ৩০ সপ্তাহ কাজ করছি। কাজেই প্রতি সপ্তাহে তিনি যদি দুটো করে পিরিয়ড পান তা হলে পাঠ্যতালিকার এই বিষয়টি তিনি সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত করতে পারেন। তৃতীয় শ্রেণীর সময়-তালিকায় তা হলে ইতিহাসের জন্য প্রতি সপ্তাহে দুটো করে পিরিয়ড রাখা যেতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ের সিলেবাসে নির্দ্দিষ্ট কাজের পরিমাণকে এভাবে সমগ্র বছরের প্রাপ্য সময়ের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য একথা ঠিক যে প্রথম বছরে শিক্ষকগণকে সমস্ত পরিকল্পনাটিই অনুমানের উপর নির্ভর করে করতে হবে। কিন্তু তাতে কোন দোষ হবে না—কারণ পাঠ-পরিকল্পনার কাজটিই ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি মাত্র। কোন শিক্ষকই বলতে পারেন না শ্রেণীকক্ষে তিনি ঠিক কি রকম বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হবেন। তার জন্য পাঠটীকা তৈরীর কোন প্রয়োজন নেই একথা আমরা বলব না। দু-এক বছর পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠদান কাজ চালিয়ে গেলে প্রকৃত অভিজ্ঞতার আলোকে বোঝা যায় পরিকল্পনার কোথায় পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন, অথবা সিলেবাস নিজেই অবাস্তব ও অতিশয় তথ্য-ভারাক্রান্ত কি না। পরিকল্পনাটিকে প্রয়োজন ও সুবিধামত ত্রৈমাসিক অথবা ষাণ্মাসিক খণ্ড সময়েও ভাগ করে নেওয়া চলে।

কেবলমাত্র বিশেষ পাঠ ও পাঠসংখ্যা দিয়ে পরিকল্পনাটি রচনা না করে একে আরও ব্যাপকভাবে করা যায় এবং এতে জিনিসটি

আরও পূর্ণাঙ্গ হবে। পরিকল্পনার ছকটি মোটামুটি এরকম হতে পারে—

বিত্যালয়ের নাম..............................

শ্রেণী....................................

বিষয় / শিল্প......... ....

...............সাল.................মাস

ক্রমিক সংখ্যা	বিশেষ পাঠ/কাজ	পাঠসংখ্যা বা কাজের সংখ্যা	পদ্ধতি	শিশুর কাজ	প্রদীপন ও উপকরণ	মন্তব্য
১						
২						
৩						
৪						
৫						

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর · ....

তারিখ... ....

সহকারী শিক্ষকের স্বাক্ষর........ ....

তারিখ.. .. ..

বিত্যালয়ের কাজ এখন এপ্রিল মাস থেকে আরম্ভ হয়। জুন মাসে গরমের ছুটি পড়ে। জুন মাসে গরমের ছুটির আগে যদি এই পরিকল্পনাটি করে ফেলা যায়, তা হলে গ্রীষ্মাবকাশের পর থেকে নিয়মিত পাঠদান কাজ চলতে পারে। ভর্ত্তি ও পাঠ্য বই নির্ব্বাচনের কাজও গরমের ছুটির আগেই শেষ হয়ে যায়।

নিম্ন-বুনিয়াদী স্তরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে একই শিক্ষিকাকে শ্রেণীর সমস্ত কাজ করাতে হয়, কারণ এই শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়গুলোকে খুব ন্যায়নিষ্ঠভাবে বিচ্ছিন্ন জ্ঞানপ্রকোষ্ঠের আধাররূপে বিবেচনা করা যায় না। কাজেই বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন এই স্তরে বিশেষ অনুভূত হয় না। বড়জোর খেলাধূলার কাজগুলো আর একজন শিক্ষক নিতে পারেন। কাজেই এই শ্রেণীদ্বয়ের বিভিন্ন কাজ এবং লেখাপড়ার বিস্তৃত পরিকল্পনা নির্দ্দিষ্ট কোন শিক্ষিকার করাই ভাল। তৃতীয় শ্রেণী থেকে আরম্ভ করে উঁচুর দিকে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত এক একটি ক্লাশে বিভিন্ন শিক্ষককে একাধিক বিষয় পড়াতে হয়। সমবায় পদ্ধতিতে (correlated method) পাঠদানের নীতি মেনে দিলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে ইংরেজী, সংস্কৃত, বীজগণিত, জ্যামিতি এবং উচ্চ-বুনিয়াদী স্তরের ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান এবং সর্ব্বোপরি মাতৃভাষা ও সাহিত্য পড়াবার জন্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। কাজেই এই স্তরে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ বিভিন্ন বিষয়ের পাঠপরিকল্পনা তৈরী করতে পারেন। বিশেষ করে উচ্চ-বুনিয়াদী স্তরের জন্য (৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণী) এই ব্যবস্থা অবশ্যই প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ একদিকে পাঠ্যবিষয়সমূহের (content subjects) বিস্তৃত পরিকল্পনা তৈরী করবেন; অন্যদিকে শিল্প-শিক্ষকগণ (craft instructors) শিল্পকাজের পরিকল্পনা তৈরী করবেন। এই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কাজের মোট সময়, কোন্ কাজে কত সময় লাগতে পারে, উৎপাদনের সম্ভাব্য পরিমাণ, কাঁচামালের সম্ভাব্য খরচ ইত্যাদি সব কিছুরই উল্লেখ থাকবে। এই দুটি পরিকল্পনা রচিত হলে সমবায় পদ্ধতিতে পাঠদানের কাজেও অনেক সাহায্য পাওয়া যাবে। কারণ দুটি বিস্তৃত পরিকল্পনা পাশাপাশি নিয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ও শিল্প-শিক্ষকগণ সম্মিলিতভাবে বসলে অতি সহজেই সহজ ও স্বাভাবিক

ভাবে সমবায় পদ্ধতিতে পড়াবার বিষয়গুলো অথবা অধ্যায়গুলো তাঁরা বেছে নিতে পারবেন। এইরূপ যুক্তভাবে আলোচনা করে যে অধ্যায়গুলো সমবায় পদ্ধতিতে পড়ান যায় সেগুলো শিল্পকাজের মাধ্যমে পড়ান যেতে পারে; আর যেগুলো বাদ পড়বে সেগুলো বিজ্ঞানসম্মত উত্তম প্রচলিত পদ্ধতিতে পড়ান যেতে পারে। বর্তমানে এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই—বিশেষ করে উচ্চ-বুনিয়াদী স্তরে।

স্বল্পকালীন অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলা যায় যে নিম্ন-বুনিয়াদী স্তরে শিল্প, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর ভিত্তি করে সমবায় পদ্ধতিতে সিলেবাস মোটামুটি শেষ করা চলে। অবশ্য কবিতা, সৃজনাত্মক রচনা, ইতিহাসের কয়েকটি বিষয় ইত্যাদির বেলায় উত্তম প্রচলিত পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু উচ্চ-বুনিয়াদী স্তরে

উচ্চ বুনিয়াদী স্তর ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষক

কেবলমাত্র সমবায় পদ্ধতির উপর ভরসা করে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের নগণ্য মনে করলে শিক্ষাকর্মে অনগ্রসরতা আসতে বাধ্য। আমাদের মনে রাখতে হবে যে উচ্চ-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণী থেকে পাশ করে ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতা করবে; আর প্রতিযোগিতা হবে এমন সব ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে যারা একটা পুস্তক-কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে স্মৃতিশক্তিকে বেশ ভালভাবেই ধারাল করে এসেছে। আর নবম শ্রেণীতে এই ভর্তির ব্যাপারে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যদি সাফল্য লাভ করতে না পারে তবে বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষতবিক্ষত মস্তকে পুনরায় দণ্ডপ্রহারের কোন অভাব হবে না। অবশ্য একথা ঠিক যে বুনিয়াদী শিক্ষার ছাঁচে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তবক্ষেত্রে বাধ্যতা-মূলকভাবে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত (১৪ বছর) প্রসারিত করলে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে নবম শ্রেণী থেকে আরম্ভ করলে এই কৃত্রিম প্রতিযোগিতার কোন অবকাশ থাকত না। বুনিয়াদী শিক্ষার

আসল পরিকল্পনায় অবশ্য একথাই ছিল। আর ১৪ বছর পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে বুনিয়াদী শিক্ষায় রূপান্তরিত করলে নবগঠিত উচ্চতর মাধ্যমিক সর্ব্বার্থসাধক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার একটি সেতুমুখ যোজনা করাও বেশ স্বাভাবিক ও আয়াসসাধ্য হত। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে বর্ত্তমানে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে আরম্ভ করে সর্ব্বার্থসাধক শিক্ষাধারার মূল উদ্দেশ্যটিকেও ব্যাহত করা হচ্ছে। কারণ নবম শ্রেণীতে যাবার আগের তিন বছরে (৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে) শিক্ষার্থিদের একমাত্র তোতাবৃত্তি ব্যতীত বহুমুখী কর্ম্মানুসরণের কোন সুযোগই দেওয়া হয় না। কাজেই নবম শ্রেণীতে শিক্ষার্থিগণের যোগ্যতা, রুচি, প্রবণতা ইত্যাদি বিচার করে তাদের বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করার কাজও অনেকটা আন্দাজের উপর হতে বাধ্য, কেননা যথাযথভাবে পর্য্যবেক্ষণের ক্ষেত্র আগের তিন বছরে ছিল না। কাজেই আমরা যে-কোন দিক থেকেই বিচার করি না কেন, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে পঞ্চম শ্রেণীর পর বুনিয়াদী বিদ্যালয় পরিত্যাগ করার যে সুবিধা বর্ত্তমানে রয়েছে তার ফলে একদিকে যেমন উচ্চ-বুনিয়াদী শিক্ষাকে ব্যাহত করা হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি মাধ্যমিক শিক্ষাধারার মধ্যেও একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। অভিভাবক এবং শিক্ষার্থিগণ একথা বেশ ভাল করেই জানে যে পঞ্চম শ্রেণীর পর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পড়ার আর কোন মানে হয় না এবং সময় থাকতে সরে পড়া ভাল। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর পর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যদি স্থানাভাব হয় তা হলে সবই গেল। কাজেই ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেই সুযোগ নেওয়া ভাল। উচ্চ-বুনিয়াদী শিক্ষা বর্ত্তমানের যুগসন্ধিক্ষণে অনেকটা নো-ম্যানস্ ল্যাণ্ডের মত আছে বলে এই অসুবিধা চলছে। এই অবস্থা সম্পূর্ণ সাময়িক।

ফলে বুনিয়াদী শিক্ষাকর্ম্মিদের দায়িত্ব আরও বাড়ছে। আমরা পূর্ব্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসছি। আসল কথা হচ্ছে এই যে—উচ্চ

বুনিয়াদী শিক্ষায় সাফল্যলাভ করতে হলে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত এর জ্ঞানমুখী উৎকর্ষ প্রচলিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমান রাখতেই হবে—শ্রেষ্ঠতর করতে পারলে আরও ভাল। ফলে এই স্তরে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন থাকবেই এবং পাঠ্যবিষয়গুলোকেও (content subjects) খুব প্রণালীবদ্ধভাবে পড়াতে হবে। যে বিস্তৃত পাঠ-পরিকল্পনার কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি তা থেকে আশা করা যায় যে ক্লাশে পড়ানর ব্যাপারে কোন ফাঁক থাকতে পারে না। এবং যেহেতু শিল্পশিক্ষকগণকেও একটি নিদ্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্পকাজ করাতে হবে তার ফলে শিল্পকাজেও শৈথিল্য আসতে পারে না। আর শিল্পজাত দ্রব্য সম্বন্ধে যদি এমন সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকে যে তাদের একটা ন্যূনতম মান অর্জ্জন করতে হবেই এবং বাজারে বিক্রীর উপযোগী হতে হবে তা হলে তাদের গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধেও আশঙ্কার কোন কারণ থাকবে না।

আমরা এখানে কয়েকটি শ্রেণীর জন্য বিশদভাবে তৈরী চারটি পাঠপরিকল্পনার পরীক্ষামূলক নমুনা দিচ্ছি। সব সময়েই একথা মনে রাখতে হবে এই নমুনা কোন চূড়ান্ত বা অপরিবর্ত্তনীয় কিছু নয়—এদের উন্নততর করার প্রচেষ্টা সর্ব্বদাই বাঞ্ছনীয়।

শ্রেণী — প্রথম

বিষয় — মাতৃভাষা

মোট পাঠসংখ্যা ঃ—২১০

ছড়ার জন্য—৬০টি (সপ্তাহে ২ দিন করে)

গল্পের জন্য—৩০টি (সপ্তাহে ১ দিন করে)

পড়া ও লেখা—১২০টি (সপ্তাহে ৪ দিন করে)

ছড়া, গল্প, পড়া ও লেখা সব মিলিয়ে মাতৃভাষার জন্য সপ্তাহে ৭টি করে ৩০ সপ্তাহ হিসাবে মোট ২১০টি পাঠের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। বিস্তৃত বিবরণ পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	বিশেষ পাঠ	পাঠ-সংখ্যা	পদ্ধতি	শিশুর কাজ	প্রদীপন ও উপকরণ	মন্তব্য
১	ছড়া					
	(১) হাট্টিমা টিম্ টিম্ তারা মাঠে পাড়ে ডিম	১	আধুনিক প্রচলিত ছড়া শেখাবার পদ্ধতি।	ছড়াগুলো শেখা, সুস্পষ্ট উচ্চারণ করা, শিক্ষিকার সঙ্গে তালে তালে ছড়া আবৃত্তি করা এবং ছন্দানুভঙ্গী অভ্যাস করা।	ছবি সম্বলিত ছড়ার চার্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ঘুঙুর ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র।	বাস্তব প্রয়োগ-ক্ষেত্রে এই পরিকল্পিত কাজ কমান অথবা বাড়ান যেতে পারে। এই পরিবর্তন নির্ভর করবে প্রকৃত প্রয়োজনের উপর।
	(২) চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে	১				
	(৩) আতা গাছে তোতা পাখী	১				
	(৪) খোকা বাবু যায় লাল মোজা পায়	১				
	(৫) আয়রে পাখী লেজ ঝোলা	১				
	(৬) আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি	৩				
	(৭) আম পাতা জোড়া জোড়া	৩				
	(৮) আয়রে সবাই মিলে কুটনো কুটব	৩				
	(৯) আঁচড়াও আঁচড়াও চুল	৩				

(১০) ওপারে কে রে আমি খোকা	৩	পূর্ব্ববৎ	পূর্ব্ববৎ	পূর্ব্ববৎ
(১১) নোটন নোটন পায়রাগুলো	৪			
(১২) ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ে মাথায় খোলা ছাতা	৪			
(১৩) নেমন্তন্ন খাবার লোভে কাপড়-চোপড় নিয়ে	৪			
(১৪) রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে পাঁতালপুরীতে	৪			
(১৫) ঠ্যাং খোঁড়া ঐ হ্যাংলা ঘোড়া নাইকো জুড়ি তার	৪			
(১৬) ফড়িং বাবুর বিয়ে টিকটিকিতে ঢোলক বাজায়	৪			
(১৭) চিংড়িমণির বিয়ে ট্যাংরা দাদা ঢোলক বাজায়	৪			
(১৮) লাল রঙা ঘুড়ি আয় না উড়ি	৪			

ক্রমিক সংখ্যা	বিশেষ পাঠ	পাঠ-সংখ্যা	পদ্ধতি	শিশুর কাজ	প্রদীপন ও উপকরণ	মন্তব্য
	(১৯) মাসী গো মাসী পাচ্ছে হাসি	৪	পূর্ব্ববং	পূর্ব্ববং	পূর্ব্ববং	
	(২০) ডালে বসে কাক ডাকে কা কা কা	৪				
		মোট ৬০				

২ গল্প ও অভিনয়

ক্রমিক সংখ্যা	বিশেষ পাঠ	পাঠ-সংখ্যা	পদ্ধতি	শিশুর কাজ	প্রদীপন ও উপকরণ	মন্তব্য
	(১) খাবারের দেশে খোকন	৩	গল্প বলার আধুনিক পদ্ধতি।	গল্পগুলোকে নিজেদেব ভাষায পুনরাবৃত্তি করা, সংশ্লিষ্ট ছবি থেকে গল্পের সূত্রযোজনা করার চেষ্টা করা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গল্পগুলোকে	ধারাবাহিক গল্প-চিত্র এবং গল্পের বিশেষ কোন কর্ম্মাংশের ছবি, গল্পগুলোর শিরোনামা এবং পাত্রপাত্রীর বড় করে নাম লেখা কার্ড।	
	(২) রাক্ষসপুরীতে রাজকন্যা	৪				
	(৩) মায়াপুরী	৫				
	(৪) মাযাকানন	৬				
	(৫) নাপিত ও তাঁতি	৬				
	(৬) আজবপুব	৬				
		মোট ৩০				

			অভিনয়ের আকারে শ্রেণী-কক্ষে রূপদান করা।		

৩ পড়া ও লেখা

(১) গৃহের বিষয়বস্তু থেকে পড়া ও লেখা	১০	সাঙ্গীকৃত ও আধুনিক প্রচলিত পদ্ধতি	শিশুরা আগে পড়তে শিখবে; পরে লেখার কাজ আরম্ভ হবে।	ছবি সহ শব্দের কার্ড, বাক্যের কার্ড, ছবি সহ ছড়া ও গল্পের চার্ট, বড় করে লেখা অক্ষরের কার্ড এবং প্রত্যক্ষ কাজের উপাদান-সমূহ।	লক্ষ্য রাখা হবে যাতে এই শ্রেণীর শেষে শিশুরা ৪৫০ থেকে ৫০০ শব্দ আয়ত্ত করতে পারে।
(২) বিদ্যালয়ের বিষয়বস্তু থেকে পড়া ও লেখা	১০				
(৩) শিল্পকাজ থেকে	৩০				
(৪) ছড়া থেকে	২৫				
(৫) গল্প ও অভিনয় থেকে	৩০				
(৬) হাতের কাজ থেকে	১৫				
	মোট ১২০				

শ্রেণী—পঞ্চম

বিষয়—কাতাই শিল্প

মোট কাজের সংখ্যা—প্রতি সপ্তাহে ৬ দিন করে ৩০ সপ্তাহ হিসাবে ১৮০ দিন

ক্রমিক সংখ্যা	বিশেষ কাজ	কাজের সংখ্যা	উপকরণ	সম্ভাব্য সাঙ্গীকৃত পাঠ	মন্তব্য
১	কার্পাস ক্ষেত্রের জমি তৈরী	১০	কোদাল, ফিতা	মাতৃভাষা—নূতন কর্মপরিকল্পনার মৌখিক বিবরণ ও প্রত্যক্ষ কাজের বিবরণ লেখা। গণিত—জমির আয়তন, বর্গক্ষেত্র ও আয়তক্ষেত্র, বিঘা, কাঠা ও কালি। প্রকৃতি বিজ্ঞান—মাটির প্রকৃতি, প্রকারভেদ, কার্পাস-উৎপাদনে উৎকৃষ্ট জমি, ত্রিপুরার মাটি। নাগরিক শিক্ষা—সহযোগিতা ও দলীয় মনোভাবের সৃষ্টি, ব্যক্তিগত ও দলীয় পরিচ্ছন্নতা।	দশটি পিরিয়ডে জমি তৈরীর কাজ শেষ না হলে অতিরিক্ত কাজ বাগানের কাজের সময় করা হবে।

২	কার্পাস বীজ বপন ও চারা রোপণ। চারা প্রতিপালন ও সারের ব্যবহার।	১০	ফিতা, কোদাল, দা, নিড়ানি। ডি. ডি. টি, হুঁকোর জল, গোবর সার, সবুজ সার।	**মাতৃভাষা**—ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানে সার ও বীজের জন্য চিঠি লেখা। বৈজ্ঞানিক তথ্যসংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণ। **গণিত**—বীজ ও সারের খরচ-পত্রের হিসাব। **প্রকৃতি বিজ্ঞান**—অঙ্কুরণ, আলো ও বাতাসের প্রয়োজনীয়তা, গাছের অংশ, পাতা ও ফুল। পোকা, মাকড়, পতঙ্গ। সারের প্রয়োজনীয়তা।	নির্দ্ধারিত কাজের সংখ্যার অতিরিক্ত কাজ বাগানের কাজের সময় করা হবে।
৩	তুলা চয়ন ও সংরক্ষণ	১০	ঝুড়ি, কেড়কী, সলাই পাটারী।	**মাতৃভাষা**—কাজের বিবরণ রচনা। **গণিত**—ওজন, আয় ব্যয়ের হিসাব। **প্রকৃতি বিজ্ঞান**—আবহাওয়া পর্য্যবেক্ষণ, তুলা সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক উপায়। **ভূগোল**—ত্রিপুরার কার্পাস উৎপাদন, আমদানী ও রপ্তানী। বিভিন্ন দেশে মাল চলাচল।	নির্দ্ধারিত সময় ছাড়া তুলা চয়নের কাজ বাগানের কাজের সময়ও হতে পারে।

ক্রমিক সংখ্যা	বিশেষ কাজ	কাজের সংখ্যা	উপকরণ	সম্ভাব্য সাঙ্গীকৃত পাঠ	মন্তব্য
৪	তুনাই, ধুনাই ও পাঁজ তৈরী, বাঁশের ধনুক, ছুরি ও পাঁজ কাঠি তৈরী।	৬০	ছুরি, বাঁশের ধনুক, বালপিঙ্গন, পাঁজপিড়ি, হাতল ইত্যাদি। বাঁশ, দা, শিরীষ কাগজ।	**মাতৃভাষা**—তুনাই, ধুনাই ও পাঁজ তৈরীর বিভিন্ন প্রক্রিয়া আলোচনা এবং কাজের বিবরণী লেখা। **গণিত**—ওজন, আয় ব্যয়ের হিসাব, সময় ও কাজ। **ভূগোল**—কার্পাসের প্রকার-ভেদ, বিভিন্ন দেশের কার্পাসের তুলনামূলক আলোচনা।	তুনাই করার বিভিন্ন পদ্ধতি দেখানোর পর শিশুরা নিজ নিজ বাড়ীতে তুনাই করবে। শিক্ষক মাঝে মাঝে সেই তুলা পরীক্ষা করে দেখবেন।
৫	সূতা কাটা— (ক) তকলিতে গড়ে ঘণ্টায় ৮০ তার (খ) চরকায় ঘণ্টায় ১৬০ তার	৯০ মোট ১৮০টি	তকলী, দক্তি, কিষাণ অথবা বাক্স চরকা, পাঁজ, চকের গুঁড়ো, তেল, নাটাই ইত্যাদি।	**মাতৃভাষা**—তুলা থেকে কাপড় প্রস্তুত করবার বিভিন্ন প্রক্রিয়া, কাপড় সম্বন্ধে রচনা লেখা, তৈরী সূতা এবং তুলা ইত্যাদি সম্বন্ধে খাদি প্রতিষ্ঠান, অভয় আশ্রম	শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সূতা কাটা অভ্যাস করবার পর শিশুরা তকলি ও চরকা বাড়ী নিয়ে যেতে পারবে

ক্রমিক সংখ্যা	বিশেষ পাঠ	পাঠ সংখ্যা	পদ্ধতি	উপকরণ	শিশুর কাজ	মন্তব্য
৭	উদ্যান ও কার্পাস ক্ষেত্রের আয়তন নির্দ্ধারণ, স্কুল প্রাঙ্গণ ও শ্রেণীকক্ষের আয়তন।	৫	সম্বন্ধিত পদ্ধতি	গজফুট ফিতা	হাতে কলমে জমির আয়তন মাপা।	
৮	বর্গক্ষেত্র ও আয়তক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা, বিভিন্ন জ্যামিতিক ক্ষেত্র সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া।	৬	সম্বন্ধিত ও উত্তম প্রচলিত পদ্ধতি	চরকার বাক্স, ক্ষেত্রের আকৃতি		
৯	কালবিষয়ক অঙ্ক	৬	প্রচলিত পদ্ধতি	ঘড়ি ও দিনপঞ্জী	ক্ষিপ্রতা ও নির্ভুলতার জন্য শিশুরা এই সব	
১০	গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক, লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক।	৮	প্রচলিত সাধারণ পদ্ধতি		অঙ্কগুলোর অনুশীলন করবে।	
১১	সামান্য ভগ্নাংশ, বিবিধ প্রশ্ন	৯	প্রচলিত সাধারণ পদ্ধতি	সমান ভাগবিশিষ্ট কার্ডবোর্ডের ফালি, গজকাঠি, ফুটকাঠি		

১২	দশমিক ও দশমিকের ভগ্নাংশ, দশমিক সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রশ্ন	৯	প্রচলিত সাধারণ পদ্ধতি		
১৩	চলিত নিয়ম—সাঙ্কেতিক	৯	সম্বন্ধিত ও সাধারণ পদ্ধতি		
১৪	ঐকিক নিয়ম ও অনুপাত	১০	সম্বন্ধিত ও সাধারণ পদ্ধতি		
১৫	সরল সুদকষা	১০	প্রচলিত উত্তম পদ্ধতি		
১৬	হাতের কাজের কার্য্যোন্নতির রৈখিক চিত্র	৪	সম্বন্ধিত ও সাধারণ	গ্রাফ্ কাগজ	গ্রাফ্ কাগজে কার্য্যোন্নতির রৈখিক চিত্র শিশুরা আঁকবে।

ক্রমিক সংখ্যা	বিশেষ পাঠ	পাঠ সংখ্যা	পদ্ধতি	উপকরণ	শিশুর কাজ	মন্তব্য
১৭	কম্পাস, রুলার ও প্রোটাক্‌টরের ব্যবহার	২	প্রচলিত সাধারণ	জ্যামিতির বাক্‌স	চাঁদা, কম্পাস, রুলার প্রভৃতির ব্যবহার। ঘনবস্তু তৈরী	
১৮	ঘন পদার্থ (প্রকারভেদ)	২	সাধারণ উত্তম পদ্ধতি	মাটির তৈরী বিভিন্ন ঘন পদার্থের নমুনা		
১৯	বিন্দু	১	”	জ্যামিতির বাক্‌স		
২০	সরলরেখা, বক্ররেখা, সরল রেখা সমানভাবে দুভাগ করা	৩	”	”		
২১	লম্ব অঙ্কন	৩		”		

২২	ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র	৬	সম্বন্বিত ও প্রচলিত উত্তম পদ্ধতি	"	কার্ডবোর্ডের ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র তৈরী
২৩	কোণ অঙ্কন (বিভিন্ন প্রকার)	৪	"	"	
২৪	বৃত্ত অঙ্কন—পরিধি, কেন্দ্র, ব্যাস ইত্যাদি	৩	"	"	
		মোট ১৫০			

শ্রেণী—অষ্টম

বিষয়—ইতিহাস

মোট পাঠসংখ্যা—প্রতি সপ্তাহে ৩টি করে ৩০ সপ্তাহ হিসাবে মোট ৯০টি।

ক্রমিক সংখ্যা	বিশেষ পাঠ	পাঠসংখ্যা	প্রয়োজনীয় প্রদীপন	শিক্ষার্থীর কর্মের সুযোগ	মন্তব্য
১	ইয়োরোপে নবজাগরণ ও ধর্ম্মসংস্কার	৯	(ক) রেনেসাঁর যুগে ইটালীর মানচিত্র। (খ) সেই যুগের প্রসিদ্ধ শিল্পী, কবি, বৈজ্ঞানিক ও চিন্তানায়কদের ছবি। (গ) ঘটনাপঞ্জীর তালিকা (ঘ) সময়রেখা	মানচিত্র ও সময়রেখা অঙ্কন, ঘটনাপঞ্জীর তালিকা তৈরী	পুনরনুশীলনের কাজ নির্দ্দিষ্ট পাঠসংখ্যার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত।
২	ভৌগোলিক আবিষ্কার, ইয়োরোপীয় বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যের প্রসার	৪	(ক) বিভিন্ন অভিযাত্রীর গতিপথ নির্দ্দেশক মানচিত্রসমূহ (খ) ইয়োরোপীয় উপনিবেশসমূহের মানচিত্র (গ) বিভিন্ন অভিযাত্রীর ছবি (ঘ) ঘটনাপঞ্জীর তালিকা	মানচিত্র অঙ্কন ও ঘটনাসমূহের তালিকা তৈরী, আবিষ্কারক ও অভিযাত্রিদের জীবনী পাঠ	

৩	ভারতে মুঘল শাসন	১০	(ক) ভারতের মানচিত্র (খ) বিভিন্ন মুঘল সম্রাটের সাম্রাজ্য নির্দ্দেশক মানচিত্র (গ) মুঘল শিল্পকলার ছবি (ঘ) ঘটনাপঞ্জীর তালিকা এবং সময়রেখা (ঙ) বিখ্যাত ঐতিহাসিক চরিত্র-সমূহের ছবি	মানচিত্র অঙ্কন, পাণিপথ, হলদিঘাট প্রভৃতি যুদ্ধের নক্সা অঙ্কন, ঘটনাপঞ্জীর তালিকা তৈরী	বিশেষ কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাণাপ্রতাপ, শিবাজী, প্রতাপাদিত্য, চাঁদরায়, কেদাররায় এই সব চরিত্রসম্বলিত কোন ঐতিহাসিক অভিনয় উপরের কয়েকটি শ্রেণী মিলে মঞ্চস্থ করতে পারে।
৪	ইংল্যাণ্ডে রাষ্ট্রবিপ্লব	৪	(ক) ইংল্যাণ্ডের মানচিত্র (খ) ঘটনাপঞ্জীর তালিকা ও সময়-রেখা (গ) ইংল্যাণ্ডের রাজাদের ছবি	ঘটনাপঞ্জীর তালিকা তৈরী এবং সময়রেখা অঙ্কন	

ক্রমিক সংখ্যা	বিশেষ পাঠ	পাঠসংখ্যা	প্রয়োজনীয় প্রদীপন	শিক্ষার্থীর কর্মের সুযোগ	মন্তব্য
৫	ভারতে ইংরেজের সাম্রাজ্য বিস্তার	১০	(ক) ভারতের মানচিত্র (খ) বিভিন্ন ইংরেজশাসকের আমলে ক্রমবর্দ্ধমান সাম্রাজ্যের মানচিত্র (গ) বিখ্যাত ঐতিহাসিক নেতৃবৃন্দ, যুদ্ধ ও দুর্গের ছবি (ঘ) ঘটনাপঞ্জীর তালিকা ও সময়রেখা	মানচিত্রসমূহ অঙ্কন, বিভিন্ন যুদ্ধের নক্‌সা অঙ্কন, ঘটনাপঞ্জীর তালিকা তৈরী ও সময়-রেখা অঙ্কন	বিশেষ কোন উৎসবের সময় বছরের একটা সময়ে বৃটিশ আমলের জাতীয়তা-বোধক কোন অভিনয় অনুষ্ঠিত হতে পারে।
৬	আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ	৩	(ক) আমেরিকার মানচিত্র (খ) স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা এবং বিভিন্ন ঘটনার প্রামাণ্য ছবি (গ) ঘটনাপঞ্জীর তালিকা	মানচিত্র অঙ্কন ও ঘটনা-পঞ্জী তৈরী	

৭	ফরাসী বিপ্লব	৫	(ক) ফ্রান্সের মানচিত্র (খ) রুশো, ভল্‌টেয়ার, ষোড়শ লুই, নেপোলিয়ন প্রভৃতির ছবি, গিলোটিনের ছবি (গ) নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের মানচিত্র (ঘ) ঘটনাপঞ্জীর তালিকা	মানচিত্র অঙ্কন ও ঘটনা-পঞ্জীর তালিকা তৈরী, ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ন সম্বন্ধে শিশু-পাঠ্য পুস্তক পাঠ, ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে রচিত বিখ্যাত পুস্তকাবলীর তথ্য সংগ্রহ
৮	শিল্প বিপ্লব—কারখানার যুগ	৪	(ক) জেমস ওয়াট্, ষ্টিভেন্‌সন্ প্রভৃতির আবিষ্কৃত যন্ত্রসমূহের ছবি (খ) ঘটনাপঞ্জীর তালিকা	ঘটনাপঞ্জীর তালিকা নির্মাণ
৯	নব্য ইটালী ও আধুনিক জার্মানী	৫	(ক) ইটালী ও জার্মানীর মানচিত্র (খ) নেতৃবর্গের ছবি (গ) ঘটনাপঞ্জীর তালিকা ও সময়রেখা	মানচিত্র অঙ্কন ও সময়-রেখা তৈরী

ক্রমিক সংখ্যা	বিশেষ পাঠ	পাঠসংখ্যা	প্রয়োজনীয় প্রদীপন	শিক্ষার্থীর কর্মের সুযোগ	মন্তব্য
১০	দাসত্ব প্রথার বিলোপ	৩	(ক) আমেরিকার মানচিত্র (খ) এব্রাহাম লিঙ্কনের ছবি ও লিঙ্কন স্মৃতিসৌধ (গ) আফ্রিকার মানচিত্র ও দাসব্যবসায়ের চলাচল পথ	মানচিত্র অঙ্কন ও ঘটনার তালিকা তৈরী, 'টম কাকার কেবিন' প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্য পুস্তক পাঠ, রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও মানবিক অধিকারের ঘোষণা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ	
১১	ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য	৫	(ক) পৃথিবীর মানচিত্র (খ) আফ্রিকার মানচিত্র (গ) ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্য-নির্দ্দেশক পৃথিবীর মানচিত্র (ঘ) ঘটনার তালিকা	কয়েকটি মানচিত্র অঙ্কন ও ঘটনার তালিকা তৈরী	

১২	চীন ও জাপান	৬	(ক) এশিয়ার মানচিত্র (খ) চীন ও জাপানের মানচিত্র (গ) রুশ-জাপান যুদ্ধের নক্‌সা (ঘ) চীন ও জাপানের সংস্কারক-দের ছবি (ঙ) ঘটনার তালিকা	মানচিত্র অঙ্কন ও ঘটনার তালিকা তৈরী, চীন ও জাপান সম্বন্ধে আধুনিক কালে রচিত শিশুপাঠ্য পুস্তক পাঠ
১৩	রুশ বিপ্লব	৪	(ক) রাশিয়ার মানচিত্র (খ) কার্ল মার্কস্‌, এঙ্গেল্‌স্‌, লেনিন, ট্রট্‌স্কী, ষ্ট্যালিন প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের ছবি (গ) মস্কো ও লেনিনগ্রাডের প্রামাণ্য ছবি (ঘ) ঘটনার তালিকা তৈরী	রাশিয়ার নেতৃবৃন্দের সহজপাঠ্য জীবনী পাঠ, সময়রেখা অঙ্কন

ক্রমিক সংখ্যা	বিশেষ পাঠ	পাঠসংখ্যা	প্রয়োজনীয় প্রদীপন	শিক্ষার্থীর কর্মের সুযোগ	মন্তব্য
১৪	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, লীগ অব নেশান্‌স, শান্তি-প্রচেষ্টা	৯	(ক) পৃথিবীর মানচিত্র, ইউরোপের মানচিত্র, মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র, এশিয়ার মানচিত্র (খ) যুদ্ধকালীন বিভিন্ন দেশের নেতার ছবি (গ) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন অস্ত্রের ছবি (ঘ) ঘটনার তালিকা	বিভিন্ন যুদ্ধের পরিকল্পনা ও নক্‌সা তৈরী, বিভিন্ন যুদ্ধ ও অস্ত্রশস্ত্রের ছবি সংগ্রহ, ঘটনার তালিকা তৈরী	
১৫	জাতীয় জাগরণ	৯	(ক) ভারতের মানচিত্র (খ) জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের ছবি (গ) আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর ছবি (ঘ) ঘটনার তালিকা তৈরী	জাতীয় জাগরণের ইতিহাস সম্বন্ধে সহজ-পাঠ্য গল্পের বই পড়া, বিভিন্ন নেতাদের জীবনী-পাঠ, সময়রেখা অঙ্কন	২৬শে জানুয়ারী, ১৫ই আগষ্ট ইত্যাদি বিশেষ কোন দিনে সমগ্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উচ্চতর শ্রেণীর পরিচালনায় জাতীয় নবজাগরণ বিষয়ক ঐতিহাসিক অভিনয় মঞ্চস্থ করতে পারে

মোট ৯০টি

শ্রেণীপাঠনা প্রসঙ্গে এখন সময়সূচী, শ্রেণীর বিবরণ, পাঠটীকা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়েও সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে। আমরা একথা সকলেই জানি যে সময়সূচীর মধ্যে দুটো জিনিস থাকে :—

(ক) বিদ্যালয়ে কি কি কাজ করান হচ্ছে, কি কি বিষয় পড়ান হচ্ছে সময়সূচী থেকে তা পাওয়া যায়, এবং এ থেকে বিদ্যালয়ের কর্ম্মানুসরণের একটি সামগ্রিক চিত্র ভেসে ওঠে।

(খ) এই সব বিভিন্ন কাজ ও লেখাপড়ার মধ্যে স্কুলের সময়টুকু কি ভাবে বণ্টন করা হয়েছে সে ধারণাও সময়সূচী থেকে পাওয়া যায়। এই সময় বণ্টন থেকে বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধেও একটা ধারণা হয়।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের নীচের শ্রেণীগুলোর জন্য সময়সূচী তৈরীর বিষয়ে যে কথা আগে মনে রাখা দরকার তা হচ্ছে কর্ম্ম ও কর্ম্ম-অনুসৃত পাঠের (follow-up lessons) বন্দোবস্ত করা। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে ঐ সব শ্রেণীতে একই শিক্ষককে একাধিক বিষয় পড়াতে হয়, কারণ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা সেখানে খুব বেশী নেই। সাঙ্গীকৃত পাঠদানের নীতি অনুসরণের ফলে ঐ সব শ্রেণীতে আগে কোন কর্ম্ম অথবা শিল্পের পিরিয়ড রাখাই বিধেয়। পরে পাঠ্য বিষয়গুলো আসতে পারে। এই অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীপাঠনার ফলে (block teaching) কোন বাঁধাধরা পিরিয়ড নির্দ্দিষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা আসে না—বিরতির আগে ও পরে শ্রেণীশিক্ষিকা এবং তাঁর কোন সহকর্ম্মী সমস্ত সময়টাকে নিজেদের সুবিধামত ভাগ করে নিতে পারেন। অবশ্য এই বিষয়ে তাঁদের কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা আগে থেকেই করে নিতে হবে—নইলে অসংলগ্ন ও এলোমেলো পাঠদান হতে পারে। আমাদের মনে হয় নীচের দিকে শ্রেণীশিক্ষিকাগণ যদি

সময়সূচী

নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে এইরূপ কোন নমনীয় সময়সূচী করে নেন তাহলে শিশুদের কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই; আর এতে শ্রেণীপাঠনাও অনেকটা নীতিসম্মত হবে। কিন্তু এতে শ্রেণীশিক্ষিকার দায়িত্ব অনেক বাড়বে, তাঁকে অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে এবং সতর্ক নিষ্ঠার সঙ্গে একটি পরিকল্পনা অনুসরণ করতে হবে। কখন তাঁকে কি করতে হবে তার খসড়া সর্ব্বদাই প্রস্তুত রাখতে হবে। এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী করতে আপাততঃ যদি কোন অসুবিধা দাঁড়ায়, তাহলে অবশ্য বিশদভাবে তৈরী সময়সূচী গ্রহণ করাই ভাল। এতে অনিশ্চয়তার কোন আশঙ্কা থাকবে না।

উপরের দিকে এই block teaching এর অবকাশ খুবই কম, কারণ সেখানে পাঠ্যতালিকার বিষয়বস্তু এমন যে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। আর তাছাড়া, পাঠ্যতালিকার যে অবিভাজ্যতার কথা বিবেচনা করে নীচের ক্লাশগুলোতে সমবায় পদ্ধতিতে পাঠদানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে, উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের উপরের দিকের ক্লাশগুলোতে—যখন শিক্ষার্থিরা maturation এর দিক থেকে অনেক পরিণত এবং কৈশোরে পদার্পণ করেছে এবং সুসম্বন্ধ চিন্তা ও সিদ্ধান্ত-গ্রহণ-ক্ষমতার স্তরে (age of precision and generalisation) এসে গেছে—তখনও ঠিক সেই অবিভাজ্যতার প্রশ্ন তুলে সমবায় পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন আছে কি না সে সম্বন্ধে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। কাজেই এই স্তরে সময়-সূচী বিশেষ করে বিষয় শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত হতে পারে। এর মধ্যে শিল্পও থাকবে এবং এই স্তরে যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে শিল্পকাজ করা দরকার, সময়সূচীতেও তদনুরূপ সময় নির্দ্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। মোটামুটি বলতে গেলে, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত কোন সৃজনাত্মক কর্ম্ম অথবা শিল্পকাজ দিয়ে ক্লাশের কাজ আরম্ভ হতে পারে; আর তার উপরের দিকে কোন পাঠ্যবিষয় নিয়ে পড়ান যেতে পারে।

এতদ্ব্যতীত সময়সূচী রচনার সময় আরও কয়েকটি সাধারণ প্রচলিত নিয়ম মেনে চলতে হয় এবং এই প্রসঙ্গে নীচের বিষয়গুলো অনুধাবনযোগ্য। এই প্রচলিত নিয়মগুলো যে কোন বিদ্যালয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য।

১। **শ্রান্তি ও অবসাদ**—কতকগুলো বিষয় আছে যেগুলোতে শ্রান্তি বেশী আসে—যেমন, গণিত, ইংরেজী। আবার কতগুলো বিষয় অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা—যেমন, ইতিহাস, ভূগোল। দুরূহ বিষয়গুলো পরপর আসা উচিত নয়; আর এগুলোকে দিয়ে ক্লাশের পড়া আরম্ভ করাও উচিত নয়। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে এই বিষয়গুলো মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় ঘণ্টায় রাখা যেতে পারে। তারপর, একটি কঠিন বিষয় শেষ হলে যাতে একটি অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা বিষয় আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এছাড়া বিরতি ও শিক্ষকগণের অবসরের প্রশ্ন তো আছেই। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে প্রত্যেক শিক্ষকের দৈনিক অন্ততঃ দুটি পিরিয়ড করে অবসর পাওয়া বাঞ্ছনীয়।

২। **সময়সূচীতে বৈচিত্র্য**—সময়সূচী রচনার সময় কর্ম্ম ও বিষয়গুলোকে এমনভাবে সাজান দরকার যাতে কোনরকম একঘেয়েমি অথবা অবসাদ না আসে। কতগুলো দুরূহ পাঠ্য বিষয় পরপর এসে গেলে শিক্ষার্থিদের আগ্রহে ভাঁটা পড়ার সম্ভাবনা থাকবে। বিজ্ঞান অথবা হাতের কাজের ক্লাশে কখনও কখনও একসঙ্গে একাধিক পিরিয়ড কাজ করতে হয়। কিন্তু তাতে কোন একঘেয়েমি আসে না। একটি কঠিন বিষয়ের পরে অপেক্ষাকৃত একটু লঘু বিষয় দিলেও বৈচিত্র্যের অভাব হয় না। অঙ্কন, গান অথবা শিল্প-কাজের ঘণ্টাগুলোও একঘেয়েমি অনেকাংশে দূর করতে পারে।

৩। **পাঠের দীর্ঘতা**—পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে কম বয়সের শিক্ষার্থিরা একটানা মনোযোগ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে না। শিক্ষার্থীর

বয়স, বিষয়বস্তুর গুরুত্ব, দিনের কোন্ সময়ে কি পড়ান হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠের দীর্ঘতা ঠিক করা উচিত। শিল্পের ঘণ্টার দীর্ঘতা ঠিক করা একটি জটিল প্রশ্ন এবং এই বিষয়ে গবেষণার অবকাশ রয়েছে। শিল্পকাজের জন্য কোন্ শ্রেণীতে কতটুকু সময় দেওয়া উচিত এ সম্বন্ধে নির্ভুল গবেষণাপ্রসূত প্রামাণ্য কোন সিদ্ধান্ত বুনিয়াদী শিক্ষকের কাছে এখনও উপস্থিত হয় নি। কতটুকু সময় কাঠের কাজ অথবা তাঁতের কাজ করলে পঞ্চম শ্রেণীর (মানে ১১ বছরের) একটি শিশুর অবসাদ আসবে কিংবা কাজের উন্নতি নিম্নমুখী হবে এ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক তথ্যসমৃদ্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত কোন মতবাদ এখনও জানা যায় নি। যে-কোন শ্রেণী সম্বন্ধেই একথা বলা যেতে পারে। সাধারণভাবে লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে তৃতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েরা ৪৫ থেকে ৭৫ মিনিট পর্য্যন্ত অখণ্ড একাগ্রতা ও আগ্রহের সঙ্গে শিল্পকাজ করে যেতে পারে। শ্রেণীবিশেষে তাই শিল্পকাজের পিরিয়ডকে এই সময়ের মধ্যেই সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ রাখা হয়ে থাকে। এই সময়ের মধ্যে অবশ্য মূল কাজের প্রস্তুতি হিসাবে আনুষঙ্গিক ছোটখাট কাজগুলোকেও ধরা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিল্পকাজের সম্ভাবনা এমনিতেই কম—উৎপাদনাত্মক শিল্প থেকে বৈচিত্র্যমূলক সৃজনাত্মক কর্ম্মের প্রতি আগ্রহই এখানে বেশী লক্ষ্য করা যায়। তার জন্য এই স্তরে 'craft practice' এর পরিবর্ত্তে 'craft play' এর উপর গুরুত্ব দেওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং সময়সূচীতেও অনুরূপ নিয়মেই পিরিয়ডের দীর্ঘতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত।

৪। **নমনীয়তা**—প্রয়োজনবোধে সময়সূচীর নমনীয়তা সর্ব্বদাই স্বীকৃত। কেবলমাত্র প্রকল্প কাজ অথবা শিল্পের ক্ষেত্রেই যে সময়সূচীর পরিবর্ত্তন সাধিত হতে পারে এমন কোন কথা নেই। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায়ও সময়সূচীর এই নমনীয়তা স্বীকার করা হয়ে থাকে।

কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষা বলে বুনিয়াদী শিক্ষায় এই নমনীয়তার প্রয়োজন অধিকতর অনুভূত হয়। কোন প্রদর্শনীর কাজ সাময়িকী, পত্রিকাদি রচনা, কোন প্রকল্প কাজ অথবা পরিবেশ পরিক্রমা ইত্যাদি কাজের সময় খুব বাঁধাধরাভাবে সময়স্থচী অনুসরণ করা সব সময় সম্ভব নাও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের লেখায়ও দেখতে পাওয়া যায় যে তিনি 'ঘণ্টা দ্বারা তাড়া দিয়া' শিশুশিক্ষাকে খুব নিয়মমাফিক করার বিরোধী ছিলেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ সতর্কতার সঙ্গে সময়সূচীর প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সাধন করলে শ্রেণীপাঠনা অথবা কাজের কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

শিক্ষক ও শ্রেণীর পৃথক সময়সূচী—প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন শ্রেণীতে কখন কোন্ কাজ করান অথবা কোন্ বিষয় পড়ান হচ্ছে তা লিপিবদ্ধ করে শ্রেণীর সময়সূচী নির্ম্মাণ করা যায় এবং এগুলো বিভিন্ন ক্লাশে থাকতে পারে। অনুরূপভাবে কোন্ শিক্ষকের কখন কি কাজ করতে হবে সে বিষয়েও আলাদা সময়সূচী রচনা করা যায়। শ্রেণীর সময়সূচী থেকে সেগুলো তুলে নিলেই হয়। শিক্ষকদের এই সময়সূচী শিক্ষকদের বসবার ঘরে এবং প্রধান শিক্ষকের কাছে রাখা যেতে পারে। অনেক সময় নিয়োগ ও বদলি, পদত্যাগ, শিক্ষণকেন্দ্রে যোগদান ইত্যাদির ফলে স্কুলের নির্দ্ধারিত সময়সূচীতে আকস্মিক পরিবর্ত্তন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য এরূপ অবস্থায় সহকারী শিক্ষকবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে পরিবর্ত্তন সাধন করা বা[illegible] ময়সূচী রচনার বিষয়ে সাধারণ অবস্থায়ও সর্ব্বদাই সহকর্ম্মিদের [illegible]মত গ্রহণ করা উচিত।

আমরা এখানে পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর সময়সূচীর কয়েকটি সম্ভাব্য নমুনা দিচ্ছি। প্রয়োজনবোধে এরা পরিবর্ত্তিত হতে পারে।

প্রথম শ্রেনী

	১০-৪৫ — ১১-০০	১১-০০ — ১১-৩০	১১-৩০ — ১২-১৫	১২-১৫ — ১-০০	১-০০ — ১-৪০	১-৪০ — ২-১৫	২-১৫ — ৩-৫
সোম	সাফাই, প্রার্থনা ইত্যাদি	খবর বলা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, আবহাওয়ার খবর ইত্যাদি	ছড়া ও ছন্দানুভঙ্গী	পড়া ও লেখা	অঙ্ক	বিরতি	খেলা (২০ মিনিট)
মঙ্গল	ঐ	ঐ	সৃজনাত্মক কর্ম (হাতের কাজ)	পড়া ও লেখা	অঙ্ক	ঐ	খেলা (২০ মিনিট)
বুধ	ঐ	ঐ	ছড়া ও ছন্দানুভঙ্গী	পড়া ও লেখা	অঙ্ক	ঐ	পরিবেশ পরিচিতি
বৃহস্পতি	ঐ	ঐ	সৃজনাত্মক কর্ম	পড়া ও লেখা	অঙ্ক	ঐ	গল্প বলা ও অভিনয়
শুক্র	ঐ	ঐ	তকলি	অঙ্ক	অঙ্কন	ঐ	খেলা (২০ মিনিট)
শনি	ঐ	ঐ	তকলি	অঙ্ক	অঙ্কন	সাহিত্য সভা (প্রয়োজনবোধে)	

মন্তব্য—

১। মোট পিরিয়ড সংখ্যা—২৯

মাতৃভাষা ও সাহিত্য

(ক) ছড়া— ২

(খ) গল্প বলা— ১

(গ) পড়া ও লেখা—৪

—

৭

অঙ্ক— ৬

অঙ্কন— ২

সৃজনাত্মক কর্ম—

(হাতের কাজ) ২

তকলি— ২

পরিবেশ পরিচিতি— ১

খেলা— ৩

দিনের খবর, স্বাস্থ্য

পরীক্ষা ইত্যাদি— ৬

—

২৯

২। মোট পাঠ সময় ২০ ঘণ্টা ১০ মিঃ। ১৯৫৮ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত পূর্বভারতের পরিদর্শকবৃন্দের আঞ্চলিক সেমিনারের সুপারিশ হচ্ছে এই যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রতি সপ্তাহে মোট ২০ ঘণ্টা পাঠ সময় নির্দ্ধারিত হলেই যথেষ্ট। এখানে সাহিত্যসভার সময় মোট পাঠের সময়ে ধরা হয় নি।

৩। সকালে স্কুল হলেও এই সময়সূচী কার্য্যকরী করা চলে। শুধু সময়টা পাল্টে দিতে হয়, আর কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতি পাঠের দীর্ঘতার কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার।

৪। সকালে স্কুল হলে সময়পত্রে বাগানের কাজের বন্দোবস্ত করাও চলে। দুপুরে স্কুল হলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে সপ্তাহে ৩ দিন খেলার পিরিয়ড শেষ হলে বাগানের কাজ করা যায়, কারণ খেলার সময় পুরো পিরিয়ড থাকে না।

দ্বিতীয় শ্রেণী

	১০-৪৫ — ১১-০০	১১-০০ — ১১-৩০	১১-৩০ — ১২-১৫	১২-১৫ — ১-০০	১-০০ — ১-৪০	১-৪০ — ২-১৫	২-১৫ — ৩-৫
সোম ...	সাফাই, প্রার্থনা ইত্যাদি	দিনের খবর, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, আবহাওয়া ইত্যাদি	তকলি	মাতৃভাষা ও সাহিত্য	অঙ্ক	বিরতি	অঙ্কন
মঙ্গল	ঐ	ঐ	গল্প বলা	ঐ	ঐ	ঐ	খেলা (২০।২৫ মিনিট)
বুধ	ঐ	ঐ	তকলি	ঐ	ঐ	ঐ	পরিবেশ পরিচিতি
বৃহস্পতি	ঐ	ঐ	অঙ্কন	ঐ	ঐ	ঐ	খেলা (২০।২৫ মিনিট)
শুক্র	ঐ	ঐ	তকলি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
শনি	ঐ	ঐ	সৃজনাত্মক কর্ম (হাতের কাজ)	ঐ	ঐ	সাহিত্যসভা (প্রয়োজনবোধে)	

১। মোট পিরিয়ড সংখ্যা—২৯

দিনের খবর ইত্যাদি— ৬

মাতৃভাষা ও সাহিত্য— ৬

অঙ্ক— ৬

তকলি— ৩

অঙ্কন— ২

গল্প বলা— ১

সৃজনাত্মক কর্ম—

(হাতের কাজ) ১

পরিবেশ পরিচিতি— ১

খেলা— ৩

—

২৯

২। মোট পাঠ সময়

২০ ঘণ্টা ১০ মিঃ

৩। ছড়া ও ছন্দানুভঙ্গী মাতৃভাষার পাঠের মধ্যে থাকবে।

তৃতীয় শ্রেণী

	১০-৪৫ — ১১-০০	১১-০০ — ১১-২৫	১১-২৫ — ১২-১৫	১২-১৫ — ১-০০	১-০০ — ১-৪০	১-৪০ — ২-১৫	২-১৫ — ২-৫৫	২-৫৫ — ৩-৩৫
সোম	সাফাই প্রার্থনা ইত্যাদি	দিনের খবর, উপস্থিতি, আবহাওয়া, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদি	তকলি	মাতৃভাষা	অঙ্ক	বিরতি	সমাজবিজ্ঞান	প্রকৃতিবিজ্ঞান
মঙ্গল	ঐ	ঐ	ঐ	মাতৃভাষা	অঙ্ক	বিরতি	সমাজবিজ্ঞান	প্রকৃতিবিজ্ঞান
বুধ	ঐ	ঐ	ঐ	মাতৃভাষা	অঙ্ক	বিরতি	অঙ্কন	সমাজবিজ্ঞান
বৃহস্পতি	ঐ	ঐ	ঐ	অঙ্ক	মাতৃভাষা	বিরতি	অঙ্কন	খেলা (২৫ মিনিট)
শুক্র	ঐ	ঐ	ঐ	অঙ্ক	মাতৃভাষা	বিরতি	সমাজবিজ্ঞান	খেলা (২৫ মিনিট)
শনি	ঐ	ঐ	ঐ	অঙ্ক	মাতৃভাষা	সাহিত্য সভা অথবা সঙ্গীত (প্রয়োজনবোধে)		

১। মোট পিরিয়ড সংখ্যা—৩৪

দিনের খবর ইত্যাদি—	৬
মাতৃভাষা ও সাহিত্য—	৬
অঙ্ক—	৬
কাতাই শিল্প—	৬
সমাজবিজ্ঞান—	৪
প্রকৃতিবিজ্ঞান—	২
অঙ্কন—	২
খেলা—	২
	৪৩

২। মোট পাঠের সময় ২৪ ঘণ্টা ১০ মিনিট—এর মধ্যে সাহিত্যসভার সময় ধরা হয় নি। খেলার সময়ের জন্য সময় কম ধরা আছে।

দ্বিতীয় শ্রেণী

[বার]	১০-৪৫ — ১১-০০	১১-০০ — ১১-৩০	১১-৩০ — ১২-১৫	১২-১৫ — ১-০০	১-০০ — ১-৪০	১-৪০ — ২-১৫	২-১৫ — ৩-৫
সোম	সাফাই, প্রার্থনা ইত্যাদি	দিনের খবর, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, আবহাওয়া ইত্যাদি	তকলি	মাতৃভাষা ও সাহিত্য	অঙ্ক	বিরতি	অঙ্কন
মঙ্গল	ঐ	ঐ	গল্প বলা	ঐ	ঐ	ঐ	খেলা (২০।২৫ মিনিট)
বুধ	ঐ	ঐ	তকলি	ঐ	ঐ	ঐ	পরিবেশ পরিচিতি
বৃহস্পতি	ঐ	ঐ	অঙ্কন	ঐ	ঐ	ঐ	খেলা (২০।২৫ মিনিট)
শুক্র	ঐ	ঐ	তকলি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
শনি	ঐ	ঐ	সৃজনাত্মক কর্ম্ম (হাতের কাজ)	ঐ	ঐ	সাহিত্যসভা (প্রয়োজনবোধে)	

১। মোট পিরিয়ড সংখ্যা—২৯

দিনের খবর ইত্যাদি— ৬

মাতৃভাষা ও সাহিত্য— ৬

অঙ্ক— ৬

তকলি— ৩

অঙ্কন— ২

গল্প বলা— ১

সৃজনাত্মক কর্ম্ম—

(হাতের কাজ) ১

পরিবেশ পরিচিতি— ১

খেলা— ৩

—

২৯

২। মোট পাঠ সময়

২০ ঘণ্টা ১০ মিঃ

৩। ছড়া ও ছন্দানুষঙ্গী মাতৃভাষার পাঠের মধ্যে থাকবে।

তৃতীয় শ্রেণী

	১০-৪৫ — ১১-০০	১১-০০ — ১১-২৫	১১-২৫ — ১২-১৫	১২-১৫ — ১-০০	১-০০ — ১-৪০	১-৪০ — ২-১৫	২-১৫ — ২-৫৫	২-৫৫ — ৩-৩৫
সোম	সাফাই প্রার্থনা ইত্যাদি	দিনের খবর, উপস্থিতি, আবহাওয়া, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদি	তকলি	মাতৃভাষা	অঙ্ক	বিরতি	সমাজবিজ্ঞান	প্রকৃতিবিজ্ঞান
মঙ্গল	ঐ	ঐ	ঐ	মাতৃভাষা	অঙ্ক	বিরতি	সমাজবিজ্ঞান	প্রকৃতিবিজ্ঞান
বুধ	ঐ	ঐ	ঐ	মাতৃভাষা	অঙ্ক	বিরতি	অঙ্কন	সমাজবিজ্ঞান
বৃহস্পতি	ঐ	ঐ	ঐ	অঙ্ক	মাতৃভাষা	বিরতি	অঙ্কন	খেলা (২৫ মিনিট)
শুক্র	ঐ	ঐ	ঐ	অঙ্ক	মাতৃভাষা	বিরতি	সমাজবিজ্ঞান	খেলা (২৫ মিনিট)
শনি	ঐ	ঐ	ঐ	অঙ্ক	মাতৃভাষা	সাহিত্য সভা অথবা সঙ্গীত (প্রয়োজনবোধে)		

১। মোট পিরিয়ড সংখ্যা—৩৪

দিনের খবর ইত্যাদি—	৬
মাতৃভাষা ও সাহিত্য—	৬
অঙ্ক—	৬
কাতাই শিল্প—	৬
সমাজবিজ্ঞান—	৪
প্রকৃতিবিজ্ঞান—	২
অঙ্কন—	২
খেলা—	২
	৪৩

২। মোট পাঠের সময় ২৪ ঘণ্টা ১০ মিনিট—এর মধ্যে সাহিত্যসভার সময় ধরা হয় নি। খেলার সময়ের জন্য সময় কম ধরা আছে।

চতুর্থ শ্রেণী

	১০-৪৫ — ১১-০০	১১-০০ — ১১-২৫	১১-২৫ — ১২-১৫	১২-১৫ — ১-০০	১-০০ — ১-৪০	১-৪০ — ২-১৫	২-১৫ — ২-৫৫	২-৫৫ — ৩-৩৫
সোম	সাফাই, প্রার্থনা ইত্যাদি	দৈনিক সংবাদ, উপস্থিতি লেখা, আবহাওয়া ইত্যাদি	কাতাই (তকলি)	মাতৃভাষা	অঙ্ক	বিরতি	সমাজবিজ্ঞান	প্রকৃতিবিজ্ঞান
মঙ্গল	ঐ	ঐ	কাতাই (তকলি)	ঐ	ঐ	বিরতি	সমাজবিজ্ঞান	প্রকৃতিবিজ্ঞান
বুধ	ঐ	ঐ	কাতাই (তকলি)	ঐ	ঐ	বিরতি	অঙ্কন	সমাজবিজ্ঞান
বৃহস্পতি	ঐ	ঐ	কাতাই (চরকা)	অঙ্ক	মাতৃভাষা	বিরতি	অঙ্কন	খেলা (২০ মিনিট)
শুক্র	ঐ	ঐ	কাতাই (চরকা)	ঐ	ঐ	বিরতি	সমাজবিজ্ঞান	ঐ
শনি	ঐ	ঐ	নীরব পাঠ	কাতাই (চরকা)	অঙ্ক	সাহিত্যসভা অথবা সঙ্গীত (প্রয়োজনবোধে)		

১। মোট পিরিয়ড সংখ্যা—৩৪

দিনের খবর ইত্যাদি—৬
মাতৃভাষা— ৫
নীরব পাঠ— ১
কাতাই— ৬
অঙ্ক— ৬
সমাজবিজ্ঞান— ৪
প্রকৃতিবিজ্ঞান— ২
অঙ্কন— ২
খেলা— ২
—
৩৪

২। মোট পাঠের সময় ২৪ ঘণ্টা ১০ মিনিট। খেলার সময় কম ধরা আছে। এর মধ্যে সাহিত্য সভার সময় ধরা হয় নি।

পঞ্চম শ্রেণী

	১০-৪৫ — ১১-০০	১১-০০ — ১১-২০	১১-২০ — ১২-১০	১২-১০ — ১২-৫৫	১২-৫৫ — ১-৪০	১-৪০ — ২-১৫	২-১৫ — ২-৫৫	২-৫৫ — ৩-৩৫	৩-৩৫ — ৪-১৫
সোম	সাফাই, প্রার্থনা ইত্যাদি	দিনের খবর, উপস্থিতি লেখা, আবহাওয়া ইত্যাদি	কাতাই শিল্প (চরকা)	অঙ্ক	মাতৃভাষা	বিরতি	ইংরেজী	সমাজ বিজ্ঞান	প্রকৃতি বিজ্ঞান
মঙ্গল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	মাতৃভাষা	ঐ	ঐ	অঙ্কন	প্রকৃতি বিজ্ঞান
বুধ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	মাতৃভাষা	ঐ	ঐ	অঙ্কন	সমাজ বিজ্ঞান
বৃহস্পতি	ঐ	ঐ	ঐ	মাতৃভাষা	অঙ্ক	ঐ	ঐ	সমাজ বিজ্ঞান	খেলা (২০।৩০ মিঃ)
শুক্র	ঐ	ঐ	ঐ	মাতৃভাষা	অঙ্ক	ঐ	ঐ	সমাজ বিজ্ঞান	খেলা (২৫।৩০ মিঃ)
শনি	ঐ	ঐ	নীরব পাঠ	কাতাই (চরকা)	সমাজ বিজ্ঞান		সাহিত্যসভা অথবা সঙ্গীত (প্রয়োজনবোধে)		

১। মোট পিরিয়ড সংখ্যা—৩৯

দৈনিক সংবাদ ইত্যাদি—	৬
শিল্প—	৬
মাতৃভাষা—	৫
নীরব পাঠ—	১
গণিত—	৫
সমাজ বিজ্ঞান—	৫
ইংরাজী—	৫
প্রকৃতিবিজ্ঞান—	২
অঙ্কন—	২
খেলা—	২
	৩৯

২। মোট পাঠের সময় ২৭ ঘণ্টা ৩০ মিঃ।

ষষ্ঠ শ্রেণী

	১০-৪৫ — ১১-০০	১১-০০ — ১১-৪০	১১-৪০ — ১২-২০	১২-২০ — ১-০০	১-০০ — ১-৪০	১-৪০ — ২-১৫	২-১৫ — ৩-১৫	৩-১৫ — ৩-৫৫	৩-৫৫ — ৪-৩০
সোম	সাফাই, প্রার্থনা ইত্যাদি	মাতৃভাষা ও সাহিত্য	গণিত	সমাজ বিজ্ঞান	ইংরেজী	বিরতি	শিল্পকাজ	বিজ্ঞান	হিন্দী
মঙ্গল	ঐ	ঐ	গণিত	সমাজ বিজ্ঞান	ইংরেজী	বিরতি	শিল্পকাজ	ইংরেজী	হিন্দী
বুধ	ঐ	ঐ	গণিত	সমাজ বিজ্ঞান	ইংরেজী	বিরতি	শিল্পকাজ	নীরব পঠন	
বৃহস্পতি	ঐ	ঐ	গণিত	সমাজ বিজ্ঞান	ইংরেজী	বিরতি	শিল্পকাজ	বিজ্ঞান	ইংরেজী
শুক্র	ঐ	ঐ	গণিত	সমাজ বিজ্ঞান	ইংরেজী	বিরতি	শিল্পকাজ	ঐ	ড্রিল
শনি	ঐ	ঐ	গণিত	ইংরেজী	শিল্পকাজ		সঙ্গীত অথবা অঙ্কন (প্রয়োজন অনুসারে)		

১। মোট পিরিয়ড সংখ্যা—৩৯

মাতৃভাষা ও সাহিত্য—	৬
ইংরেজী—	৮
গণিত—	৬
শিল্পকাজ—	৬
সমাজবিজ্ঞান—	৫
বিজ্ঞান—	৩
হিন্দী—	২
নীরব পঠন—	২
ড্রিল—	১
	৩৯

২। মোট পাঠের সময় ২৮ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। শনিবারের শেষের দিকে সঙ্গীত অথবা অঙ্কনের কাজ হতে পারে। সেই সময় এখানে দেখান হয় নি।

সপ্তম শ্রেণী

	১০-৪৫ — ১১-০০	১১-০০ — ১১-৪০	১১-৪০ — ১২-২০	১২-২০ — ১-০০	১-০০ — ১-৪০	১-৪০ — ২-১৫	২-১৫ — ৩-১৫	৩-১৫ — ৩-৫৫	৩-৫৫ — ৪-৩০
সোম	সাফাই, প্রার্থনা ইত্যাদি	ইংরেজী	মাতৃভাষা	গণিত	বিজ্ঞান	বিরতি	শিল্পকাজ	সমাজ বিজ্ঞান	সংস্কৃত
মঙ্গল	ঐ	ইংরেজী	মাতৃভাষা	গণিত	সমাজ বিজ্ঞান	বিরতি	শিল্পকাজ	নীরব পঠন	
বুধ	ঐ	ইংরেজী	মাতৃভাষা	গণিত	বিজ্ঞান	বিরতি	শিল্পকাজ	ইংরেজী	সমাজ বিজ্ঞান
বৃহস্পতি	ঐ	ইংরেজী	মাতৃভাষা	গণিত	সমাজ বিজ্ঞান	বিরতি	শিল্পকাজ	ইংরেজী	হিন্দী
শুক্র	ঐ	ইংরেজী	মাতৃভাষা	গণিত	বিজ্ঞান	বিরতি	শিল্পকাজ	সমাজ বিজ্ঞান	ড্রিল
শনি	ঐ	ইংরেজী	মাতৃভাষা	গণিত	শিল্পকাজ	সঙ্গীত অথবা চিত্রাঙ্কন (প্রয়োজন অনুসারে)			

১। মোট পিরিয়ড সংখ্যা—৩৯

মাতৃভাষা ও সাহিত্য—	৬
ইংরেজী—	৮
গণিত—	৬
শিল্পকাজ—	৬
সমাজবিজ্ঞান—	৫
বিজ্ঞান—	৩
হিন্দী—	১
সংস্কৃত—	১
নীরব পঠন—	২
ড্রিল—	১
	৩৯

২। মোট পাঠের সময় ২৮ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট।

অষ্টম শ্রেণী

	১০-৪৫ — ১১-০০	১১-০০ — ১১-৪০	১১-৪০ — ১২-২০	১২-২০ — ১-০০	১-০০ — ১-৪০	১-৪০ — ২-১৫	২-১৫ — ৩-১৫	৩-১৫ — ৩-৫৫	৩-৫৫ — ৪-৩০
সোম	সাফাই, প্রার্থনা ইত্যাদি	গণিত	ইংরেজী	মাতৃভাষা	বিজ্ঞান	বিরতি	শিল্পকাজ	ইংরেজী	সমাজ বিজ্ঞান
মঙ্গল	ঐ	গণিত	ইংরেজী	মাতৃভাষা	সমাজ বিজ্ঞান	বিরতি	শিল্পকাজ	সমাজ বিজ্ঞান	ইংরেজী
বুধ	ঐ	গণিত	ইংরেজী	মাতৃভাষা	বিজ্ঞান	বিরতি	শিল্পকাজ	সংস্কৃত	হিন্দী
বৃহস্পতি	ঐ	গণিত	ইংরেজী	মাতৃভাষা	সমাজ বিজ্ঞান	বিরতি	শিল্পকাজ	নীরব পাঠ	
শুক্র	ঐ	গণিত	ইংরেজী	মাতৃভাষা	বিজ্ঞান	বিরতি	শিল্পকাজ	সমাজ বিজ্ঞান	ড্রিল
শনি	ঐ	গণিত	ইংরেজী	মাতৃভাষা	শিল্পকাজ		সঙ্গীত অথবা চিত্রাঙ্কন (প্রয়োজন অনুসারে)		

১। মোট পিরিয়ড সংখ্যা—৩৯

মাতৃভাষা ও সাহিত্য—	৬
ইংরেজী—	৮
গণিত—	৬
শিল্পকাজ—	৬
সমাজবিজ্ঞান—	৫
বিজ্ঞান—	৩
হিন্দী—	১
সংস্কৃত—	১
নীরব পঠন—	২
ড্রিল—	১
	৩৯

২। মোট পাঠের সময় ২৮ ঘণ্টা ৪০ মিনিট।

শ্রেণীর বিবরণ ও পাঠটীকা

শ্রেণীপাঠনার সাংগঠনিক দিক থেকে আর দুএকটি বিষয়ের আলোচনা করে আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করব। প্রথমটি (১) শ্রেণীর বিবরণ ; দ্বিতীয় (২) পাঠটীকা।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে পড়াতে গেলে শিক্ষককে ক্লাশের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা রাখতে হবে। একই ক্লাশে সকলে যে যোগ্যতার দিক থেকে সমান থাকে না একথা আমরা জানি। ৩০ জন ছেলেমেয়ের মধ্যে হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে যে ৫।৭ জন সবচেয়ে ভাল, ১৫।২০ জন মাঝারি, আর অবশিষ্ট মাঝারিদের চেয়েও খারাপ। এই অবস্থায় সমস্ত ক্লাশকে একই ভাবে পড়াতে গেলে বিভিন্ন দলের প্রয়োজন মিটবে না। যারা সবচেয়ে দুর্বল তাদের মত করে সমস্ত ক্লাশকে পড়াতে গেলে যারা এগিয়ে আছে তাদের প্রতি অবিচার করা হয় ; আবার যারা সবচেয়ে সেরা কেবলমাত্র তাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখলে ক্লাশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতি অবিচার হয়। ক্লাশে প্রয়োজনমত এই দলগঠনের একাধিক নীতি আছে ; এই নীতি পাঠদান পদ্ধতির সঙ্গেই বেশী সম্বন্ধযুক্ত। আমরা তার বিস্তারিত আলোচনা এখানে করলাম না। যা হোক, একথা ঠিক যে শিক্ষকের দৈনিক পাঠ-পরিকল্পনা যাতে সত্যি সত্যিই বিজ্ঞানসম্মত ও প্রণালীবদ্ধ হয়, তার জন্য তাঁকে শ্রেণীর বিবরণ রাখতেই হবে। বিবরণের ছক পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এতে শিক্ষকের পক্ষে ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে পড়াতে অনেক সুবিধা হয়। ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্যতা বিচারের সময় ক, খ, গ এর একটি নির্দ্দিষ্ট মান নির্দ্ধারণ করে ক খ ইত্যাদি প্রতীকের ব্যবহার করা চলে।

শিল্পকাজ সংগঠন ও উৎকর্ষ

শিল্পকাজের সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে শিল্পশিক্ষকের উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রধান শিক্ষক তাঁর সহকর্ম্মিদের নিয়ে পরিকল্পনা রচনা করতে পারেন, কিন্তু যে কোন পরিকল্পনাই হোক না কেন—তার সফল রূপায়ণের ভার পড়বে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের উপর। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষকের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে—দায়িত্ব তাঁর সমধিক। এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য শিল্পশিক্ষকের বিশেষভাবে আত্মপ্রস্তুতি প্রয়োজন। তাঁকে সর্ব্বাগ্রে মনে রাখতে হবে যে শিল্পকাজের অন্তর্নিহিত জ্ঞানমুখী সারবত্তার জন্যই বিদ্যালয়ে শিল্পের আবির্ভাব হয়েছে—কারিগরী বৃত্তিশিক্ষা অথবা কেবলমাত্র ব্যবসার জন্য নয়। লেখাপড়ার বিষয় থেকে শিল্পকাজ আলাদা—বিষয়শিক্ষক এবং শিল্পশিক্ষক বিভিন্ন শ্রেণীর লোক—শিল্পকাজ লেখাপড়ার উপরে একটি আনুষ্ঠানিক সৌষ্ঠবমাত্র—বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এবম্বিধ চিন্তাধারার কোন স্থান নেই। অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় যে শিল্পশিক্ষকগণ বিদ্যালয়ের লেখাপড়া সম্বন্ধীয় মূল প্রচেষ্টা থেকে নিজেদের যেন অনেকটা বিচ্ছিন্ন করে দেখবার প্রয়াসী—কেবলমাত্র শিল্পকাজ নিয়ে ব্যাপৃত থাকাটাই তাঁরা নিজেদের একমাত্র কাজ বলে মনে করতে চান। এই ধারণা অত্যন্ত ভ্রমপ্রদ—এতে যে কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের ক্ষতি হবে তা নয়, এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হলে শিল্পশিক্ষকগণ নিজেদের প্রতিও অবিচার করবেন এবং নূতন যুগের পরিবর্ত্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় আপনাদের প্রাপ্য স্থান অধিকার করতে পারবেন না। আংশিক অন্তরালে থাকার এই প্রচ্ছন্ন মনোবৃত্তির পেছনে অবশ্য কতগুলো বাস্তব কারণও রয়েছে। শিল্পশিক্ষকগণ সাধারণতঃ বৃত্তিশিক্ষামূলক কারিগরী শিক্ষণকেন্দ্র থেকে পাশ করে আসেন। শিল্পের শিক্ষাগত তাৎপর্য্য—শিশুশিক্ষায় শিল্পের অবদান সম্ভাবনা—আধুনিক শিক্ষার ভাবধারা ইত্যাদি শিক্ষাবিষয়ক তাত্ত্বিক দর্শন সম্বন্ধে সেখানে তাঁরা কোন ধারণাই পান না। কাজেই

বুনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োজনের সঙ্গে একেবারে প্রথম অবস্থায়ই খাপ খাওয়ানো তাঁদের পক্ষে যে একটু কষ্টকর হবে এতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। আসল কথা হচ্ছে এই যে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের যেমন একদিকে শিক্ষণীয় বিষয় ও শিল্প দুটোর উপরই দখল রাখতে হবে, ঠিক তেমনি শিল্পশিক্ষকদেরও শুধুমাত্র শিল্প নিয়ে বসে থাকলে চলবে না—তাঁদেরও জানতে হবে নূতন শিক্ষার ভাব ও রূপ—শিল্প ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এটি একটি সমস্যা—এবং এই সমস্যা কেবলমাত্র আমাদের দেশেই সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শিল্পকাজ কেমন চলছে সে বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য ১৯৫১ সালে রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে একটি কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল। এই কমিশন ৪৮টি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষা করে শিল্পশিক্ষকদের সম্বন্ধে যে মতামত লিপিবদ্ধ করেছিল তার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। কমিশন বলেছিল—"Ideally speaking, handicraft teachers should be qualified both technically and professionally. Time must elapse however before all such teachers are qualified in these two ways." কাজেই শিল্পশিক্ষকগণ যত তাড়াতাড়ি আধুনিক শিক্ষার মূল ভাবধারার সঙ্গে নিজেদের পরিচিত করে তুলতে পারেন ততই মঙ্গল। শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ এই বিষয়ে শিল্পশিক্ষকগণকে সাহায্য করতে পারেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পকাজের আবির্ভাব নূতন বলে যথেষ্ট সাবধানতা ও নিয়মতান্ত্রিকতার সঙ্গে অগ্রসর না হলে এই বিভাগে উৎকর্ষ লাভ করা যাবে না। বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার শিল্পকাজে যাতে কোনরকম ছেলেখেলার দায়িত্বহীনতা না আসতে পারে। চিত্তাকর্ষক কর্মের অবতারণার জন্যই শিল্প—লেখাপড়ার আনন্দজনক পরিপূরক ছাড়া এটা আর কিছু নয়—এই ধরণের মনোবৃত্তি

শিল্পকাজকে একটা এলোমেলো ও উদ্দেশ্যহীন পণ্ডশ্রমে পরিণত করতে পারে এবং তাতে বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ ব্যাহত হবে। বিশেষ করে উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে এর বাস্তব গুরুত্ব আরও বেশী। কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি খরিদ থেকে আরম্ভ করে দ্রব্য উৎপাদন, তার সংরক্ষণ ও বিক্রীর বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরে বিশেষ পরিকল্পনা ও নিশ্ছিদ্র হিসাবের প্রয়োজন। ভাণ্ডারকক্ষের সুবিন্যস্ত শৃঙ্খলা, সাধারণ ও বিভাগীয় ষ্টক্ বই রাখা, কাঁচামাল নেওয়া, ব্যবহার করা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থিদের শৃঙ্খলা ও মিতব্যয়িতা অবলম্বন করা, অপচয় নিবারণ, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দাম ফেলা এবং সর্ব্বোপরি বিভিন্ন শিল্পকাজে নিযুক্ত মূলধন ও উৎপন্ন দ্রব্যমূল্যের তুলনামূলক হিসাব ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়েই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রশ্ন বাদ দিলেও এই সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। তা না হলে শিল্পকাজেব সামগ্রিক চিত্রটি বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষের সামনে পরিষ্কার হবে না এবং শিথিলতার আড়ালে শিল্পকাজ একদিন 'degenerating pastime'এ পরিণত হবে। যে শিল্পশিক্ষার জন্য বুনিয়াদী শিক্ষাকে অনেক লগুড়াঘাত সহ্য করতে হয়েছে, সেই শিল্পশিক্ষা যে বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে ও প্রণালীবদ্ধভাবে করা দরকার আশা করি সে কথা বিশেষ জোর দিয়ে না বললেও চলে।

বিদ্যালয়ে কোন জিনিস কেনা হলে তা সর্ব্বপ্রথমেই সাধারণ ষ্টক্ বইতে জমা পড়ে। শিল্পশিক্ষকগণ এখান থেকে তাদের বিভাগীয় ষ্টক্ বইতে শিল্পকাজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব বুঝে নিয়ে তুলে নিতে পারেন। শিল্পকাজের জিনিসপত্র অফিস থেকে এই হস্তান্তরের পর শিল্পশিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে থাকতে পারে। বিভাগীয় ষ্টক্ বইয়ের একটি সম্ভাব্য নমুনা এখানে দেওয়া হল :—

জমার তারিখ	জিনিসের বিবরণ	সংখ্যা বা পরিমাণ	প্রতিটির দর	মোট মূল্য	বিল নং ও তারিখ	খরচের তারিখ	সংখ্যা বা পরিমাণ	মোট মূল্য	অবশিষ্ট	মন্তব্য	স্বাক্ষর

উৎপাদনের জন্যও একটি বই রাখা দরকার। প্রত্যেকটি শিল্পের জন্য একটি বিভাগীয় ষ্টক্ রেজিষ্টার এবং উৎপাদন রেজিষ্টার থাকলে (এগুলো অবশ্যই রাখতে হবে) এবং প্রণালীবদ্ধভাবে এই রেজিষ্টারগুলো সংরিক্ষত হলে সমস্ত স্কুলের শিল্পকাজের একটি সামগ্রিক ছবি যে কোন সময়েই পাওয়া যেতে পারে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই এই হিসাব ঠিকমত না রাখলে শিল্পকাজের জন্য মোট ব্যয় এবং শিল্পজাত দ্রব্যের মোট আমদানীর কোন পূর্ণাঙ্গ চিত্র সহসা পাওয়া যাবে না। প্রত্যেক কাজেরই একটি প্রণালীবদ্ধ শৃঙ্খলা থাকা দরকার। উৎপাদন, শ্রমনিয়োগ ও অর্থনৈতিক দিক থেকে শিল্পকাজে শৃঙ্খলারক্ষার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। এই বিভাগে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা থাকলে কেবলমাত্র শিক্ষার্থিদের সামনে অব্যবস্থার দৃষ্টান্ত স্থাপন করাই হবে না, অধিকন্তু বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষকেও কালক্রমে অসুবিধায় পড়তে হবে। আর এই বিষয়ে একবার কাজ জমে গেলে পরে সমস্ত বিষয়টিকে নিয়মানুগ করে তুলতে প্রচুর সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে। শিল্পকাজকে সুশৃঙ্খল ও নিয়মসঙ্গত করে তুলতে প্রারম্ভিক পর্য্যায়ে হয়তো সময়ের প্রয়োজন হবে। কিন্তু ধীরে ধীরে আরম্ভ হলেও শিল্পকাজের সংগঠন বেশ সুদৃঢ় বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। এই বিষয়ে শিল্পশিক্ষকদের দায়িত্ব খুবই বেশী এবং প্রথম থেকেই তাঁরা যথেষ্ট মনোযোগ ও নিয়মানুবর্ত্তিতা সহকারে কাজ করলে বিষয়টি এলোমেলো পণ্ডশ্রমে পরিণত হতে পারবে না। পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় উৎপাদন রেজিষ্টারের নমুনা দেওয়া হল।

জিনিসের বিবরণ	কাঁচামালের বিবরণ			তৈরী জিনিসের দাম মোট দাম—			বিলি ও বন্দোবস্ত		বিক্রী হলে			মন্তব্য	প্রধান হিসাব রক্ষকের স্বাক্ষর
	নাম	ব্যবহৃত পরিমাণ	অপচয়	কাঁচা মালের খরচ	অপচয়	শ্রমের মূল্য	অফিসে জমা	বিক্রী	মোট আদায়	ক্যাস মেমো ও বইএর নং	প্রধান হিসাব রক্ষকের সই		

শিক্ষার্থিদের শিল্পকাজের প্রগতি-পত্র রাখাও বিশেষ দরকার। দিনের পর দিন শিক্ষার্থিগণ যে কাজ করে যাচ্ছে তাতে তাদের উন্নতি-অবনতি কি হচ্ছে, কার কোন্ দিকে বিশেষ সাহায্য অথবা যত্নের প্রয়োজন, বিভিন্ন শিক্ষার্থীর দক্ষতার তুলনামূলক বিচার ইত্যাদি বিষয়ে ভালমত লক্ষ্য রাখতে হলে নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষার্থিদের প্রগতি-পত্র রাখা দরকার। প্রগতি-পত্রের একটি নমুনা এখানে দেওয়া হল। শিল্পশিক্ষক শিক্ষার্থীর কাজ পর্য্যবেক্ষণ করে প্রত্যেক সপ্তাহে নিজের মতামত লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারেন। কাজেই এক একটি পৃষ্ঠায় এক মাসের কাজ চলতে পারে। শিল্পশিক্ষক সাধারণ মন্তব্যের ঘরে ক, খ, গ এই তিনটি মাননিরূপক প্রতীকের ব্যবহার করতে পারেন এবং বিভিন্ন প্রতীকের গাণিতিক মান আগে থেকে ঠিক করে রাখতে পারেন।

বিদ্যালয়ের নাম ____________

শিল্পকাজের প্রগতি-পত্র

শিক্ষার্থীর নাম ____________

রোল নং ____________ মাস ________ সাল ________ শিল্পের নাম ____________

কর্মব্যাপ্তির তারিখ	মোট সময়	উপস্থিত	কাজের বিবরণ	কর্মকুশলতা						সাধারণ মন্তব্য সামগ্রিক মান	শিল্প শিক্ষকের স্বাক্ষর
				মনোযোগ	পরিচ্ছন্নতা	যন্ত্রপাতির যত্ন	অপচয় নিবারণ	গতি	সমাপন দক্ষতা		
১ম সপ্তাহ	৬ দিন										
২য় সপ্তাহ											
৩য় সপ্তাহ											
৪র্থ সপ্তাহ											

শিল্পকাজে উৎকর্ষ লাভ করতে হলে গতানুগতিক এইসব হিসাব, প্রগতি-পত্র ইত্যাদি বিষয় ছাড়া শিল্পশিক্ষককে আরও অন্যান্য বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থিদের যথার্থভাবে শিল্পকাজের প্রতি অনুরাগ জন্মায়, তারা আন্তরিকভাবে কাজটি সম্পন্ন করতে যত্নশীল হয় এবং তাচ্ছিল্যের মনোবৃত্তি নিয়ে একে নিতান্ত অর্থহীন কর্ম্মবিলাস বলে মনে না করে। এ পর্য্যন্ত আমরা বিদ্যালয়কে নিছক মস্তিষ্কচর্চ্চার একটি অভিজাত অনুশীলন-কেন্দ্র বলে জেনে এসেছি—এই শতাব্দীসঞ্চিত অভিশপ্ত ধারণা কাটিয়ে উঠতে আমাদের আরও সময় লাগবে। অনেক অভিভাবক আছেন যাঁরা স্কুলে তাঁত-চরকা, হাতুড়ী-বাটালের "অনধিকারের" সঙ্গে আজও সন্ধি স্থাপন করেন নি। কি পদ্ধতিতে শিল্পকাজ করাতে হবে তার বিশদ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই যে শিল্পশিক্ষকদের যদি নিজেদের কাজের উপর দখল থাকে এবং আপন কাজকে যদি তাঁরা ভালবাসেন, তা হলে পদ্ধতির দিক থেকে তাঁরা বিশেষ কোন অসুবিধার সম্মুখীন হবেন না।

বিদ্যালয়ে শিল্পকাজের উপর কোন পরীক্ষা থাকবে কি না—এটি হচ্ছে আর একটি প্রশ্ন। পৃথিবীর অনেক দেশ আছে যেখানে অন্যান্য পাঠ্যবিষয়ের মত শিল্পকাজের পরীক্ষাও গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কোন কোন দেশে প্রগতি-পত্রের মতামত থেকেই শিক্ষার্থিদের শিল্পকাজের দক্ষতার বিচার হয়ে থাকে। আমাদের দেশে যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে প্রগতি-পত্র রাখবার রীতি এখনও ভালভাবে প্রবর্ত্তিত হয় নি—বিষয়টি একেবারেই নূতন। অথচ একথা অস্বীকার করা যায় না যে শিল্পকাজ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে করা উচিত। কাজেই সব রকম শিথিলতা পরিহার করার জন্য আপাততঃ অন্যান্য পাঠ্যবিষয়ের মত শিল্পকাজের উপরও পরীক্ষা

থাকা বাঞ্ছনীয় এবং একে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে বিচার করা উচিত। একেবারে নীচের ক্লাশে অবশ্য এই পরীক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণী থেকে এই পরীক্ষা আরম্ভ হবে কি না বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তা বিচার করে নিতে পারেন।

গ্রন্থাগার ও উৎসব অনুষ্ঠানাদি

গ্রন্থাগার ও শ্রেণীপাঠাগার, পত্রিকাদি রচনা, জাতীয় উৎসব-অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী ইত্যাদি বিষয়ের কাজ যে-কোন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই চলতে পারে। শুধুমাত্র বুনিয়াদী বিদ্যালয়েই এগুলো হবে এমন কোন কথা নেই—এবং এই কাজগুলো এমন যে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক না হলেও এগুলো চলতে পারে। এই কাজগুলো চালু হলে যে-কোন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় আপনা থেকেই কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আংশিক ভাবে পরিচিত হবে এবং কালক্রমে সার্ব্বজনীন বুনিয়াদী শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের পথ সুগম হবে। আমাদের দেশে প্রাথমিক ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পড়তে পারে এমন বইয়ের সংখ্যা কোন স্কুলেই বেশী নেই। অথচ একথা আমরা স্বীকার করি যে কোন আধুনিক বিদ্যালয়ের মত বুনিয়াদী বিদ্যালয়েও পুস্তকাগার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গবিশেষ। পুস্তকের অভাবে শ্রেণীপাঠাগার সংগঠন করা সম্ভব না হলেও প্রত্যেক বিদ্যালয়েই একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থাকা আবশ্যক। এখানে প্রত্যেক ক্লাশের শিশুদের পড়বার উপযোগী বইগুলো আলাদাভাবে তালিকাভুক্ত হতে পারে এবং সেই তালিকা দেখে সেই বিশেষ শ্রেণীর শিশুরা বই বেছে নিতে পারে। প্রত্যেক ক্লাশের জন্য আলাদা বই নেবার খাতা অবশ্যই থাকা দরকার এবং ছাত্রছাত্রীরা যাতে নিজেরাই এই issue book ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। শ্রেণীপাঠাগার থাকলে

সুবিধা হয় এই যে শিক্ষার্থিরা বই কেনার জন্য ক্লাশে চাঁদা দিতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করে না। প্রত্যেক বছর কিছু কিছু করে বই কিনলে কালক্রমে খুব সামান্য হলেও স্কুলে ছোটখাট একটি লাইব্রেরী গড়ে তোলা যায়।

দেশনেতা, কবি, সাহিত্যিক এবং মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ও তিরোধান দিবস প্রত্যেক বিদ্যালয়েই পালিত হওয়া উচিত। এই সব অনুষ্ঠান উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীরা কাজের অনেক সুযোগ পায় এবং এদের জ্ঞানমুখী প্রভাবের ফলে জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রাণধর্ম্মের সঙ্গে পরিচিত হয়। বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ কাজগুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করবার জন্য আগে থেকেই পূজ্যপূজাতিথি-সম্বলিত একটি তালিকা তৈরী করে রাখতে পারেন এবং কোন্ তিথিতে অনুষ্ঠানের প্রকৃতি কি রকম হবে তা স্থির করে নিতে পাবেন। সভা, আলোচনা, সাময়িকী-পত্রিকাদি রচনা, অভিনয় ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই স্মবণীয় দিনগুলো উদ্‌যাপিত হতে পারে। এ ছাড়া অন্যান্য জাতীয় অনুষ্ঠান-দিবস, ঋতু উৎসব ইত্যাদিও আছে। সারা বছরের জন্য একটি তালিকা যত্নসহকারে আগে থেকে তৈরী করলে কোথাও ভাবসাম্য নষ্ট হবার এবং তার ফলে পঠন-পাঠনেব ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে না। বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষের এ বিষয়ে পূর্ব্বপ্রস্তুতি থাকলে বিভিন্ন দেওয়াল পত্রিকা রচনা, হাতে লেখা পত্রিকা রচনা, গান শেখা এবং সাহিত্য পাঠের অনেক বিষয় বেশ সুপরিকল্পিত উপায়ে দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা চলে এবং তাতে অনুষ্ঠানগুলোর শিক্ষাগত সম্ভাবনা কাজে পরিণত হওয়ার আশা বেশী থাকে। এই সব উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে তৈরী অনেক জিনিসই পরে প্রদর্শনীর কাজে আসে।

বছরে একবার বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রদর্শনী হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই প্রদর্শনী উপলক্ষে অনাবশ্যক তোড়জোড় অথবা কৃত্রিম প্রচেষ্টা

কোন অবস্থাতেই সমর্থনযোগ্য নয়। সারা বছরের শিল্প, হাতের কাজ, সৃজনাত্মক রচনা, শিক্ষকদের প্রদীপন তৈরী, শিশুদের সংগ্রহ, অঙ্কন ইত্যাদি বিষয় নিয়েই অনাড়ম্বর প্রদর্শনীর উদ্বোধন হতে পারে। অন্য কোন সময় না হলে অভিভাবক-শিক্ষকদের মিলনের দিনে এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হতে পারে।

পরীক্ষা পরিচালনা ও পর্য্যবেক্ষণের কাজ

প্রচলিত গতানুগতিক পরীক্ষাপদ্ধতির উপর অনেক সমালোচনা হয়েছে। একথা আজ সর্ব্বজনস্বীকৃত যে এই পরীক্ষাপদ্ধতি আধুনিক শিক্ষার যুগে অচল—বিশেষ করে বিত্থালয়ের স্তরে এর সংস্কার অত্যাবশ্যক। এই পদ্ধতিতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে শিক্ষার্থিদের যোগ্যতার বিচার হয় না, পবীক্ষকের খেয়ালখুসী এতে বিশেষভাবে কাজ করে, এর অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়তাব সুযোগ নিয়ে শিক্ষার্থিরা পাঠ্যপুস্তক অবহেলা করে নোট, মেড্-ইজি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে একরকম জুয়াখেলায় মেতে ওঠে, এর কৃত্রিম আবহাওয়ায় একমাত্র তোতাবৃত্তি ব্যতীত শিক্ষার্থিদের অন্য কোন গুণাবলীর বিচার হয় না, এব প্রশ্ন করা অত্যন্ত সোজা এবং তাতে পাঠ্যবিষয়ের অনেক অংশ বাদ যায়, আবার খাতা দেখার মধ্যেও কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই—ইত্যাদি নানাবিধ বিরূপ সমালোচনা বিশেষজ্ঞগণ গতানুগতিক পরীক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে করে থাকেন। ৩০০ নম্বরের মধ্যে ১০০ নম্বর পেয়ে যে ভাগ্যবান পাশ করল, আর ৯৯ পেয়ে যে ভাগ্যহত ফেলের দলে চলে গেল—এ দুয়ের মধ্যে যোগ্যতার কোন সত্যি সত্যিই তারতম্য আছে কি না এ প্রশ্ন দকলেই করতে পারেন। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান এই বিষয়ে গভীর বিবেচনা সহকারে গবেষণা করে যাচ্ছে এবং আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে গতানুগতিক পরীক্ষাপদ্ধতির ক্রটিবিচ্যুতিসমূহ সম্পূর্ণভাবে নির্ম্মূল হবে। এই সম্বন্ধে সুবিস্তৃত

আলোচনার অবকাশ আমাদের এখানে নেই। কেবলমাত্র দু-একটি বিষয়েই আমরা আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

গতানুগতিক পরীক্ষায় প্রশ্নগুলো বড় থাকে না, কিন্তু উত্তর হয় অনেক বড়। আর প্রশ্নগুলো সমস্ত পাঠ্যবিষয়ের উপর বিস্তৃত থাকে না, সামান্য অংশবিশেষ থেকেই সেগুলো নির্ব্বাচিত হয়ে থাকে। এতে সাধারণ শিক্ষার্থিদের কাছে ভাগ্যের খেলাটা খুব মজাদার হয়ে দেখা দেয়। বইয়ের বিস্তৃত অংশ বাদ দিয়ে অনেকেই সাধারণতঃ বাছাবাছা প্রশ্ন নিয়ে এই ভাগ্যপরীক্ষায় নামে। ফলে সাধারণতঃ কি হয়ে থাকে তা আমরা অহরহই দেখতে পাচ্ছি। এতে মৌলিক চিন্তাধারা অথবা জ্ঞানের পরিধি কোন কিছুরই উৎকর্ষ অথবা প্রসারলাভ ঘটে না এবং যোগ্যতার বিচার একটা প্রহসনে পরিণত হয়। দ্বিতীয়তঃ এই সব প্রশ্নের উত্তর বিচার করবার কোন বাঁধাধরা নির্ভুল নিয়ম নেই। যে একটি প্রশ্নে ১০ পেল, সে কেন ১০ পেল, আর যে ৮ পেল, সে কেন ৮ পেল—এ বিষয়ে পরীক্ষক নিঃসন্দিগ্ধভাবে কোন কিছু বলতে পারেন না। একই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন পরীক্ষকের কাছে বিভিন্ন রকমের নম্বর পেয়েছে এমন অনেক মজার ঘটনা দেশে বিদেশে অনেক আছে। আর সে সব বিভিন্ন নম্বরের পার্থক্যও অত্যন্ত চমকপ্রদ। আজকাল যে অব্‌জেকটিভ অথবা বস্তুতান্ত্রিক উপায়ে প্রশ্ন করার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়েছে তার ফলে এই অসুবিধাগুলো দূর হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই নূতন ধরণের প্রশ্নগুলো খুব ছোট হয় এবং এর উত্তরও খুবই সংক্ষিপ্ত। আর উত্তরগুলো এমন হবে যে হয় সেগুলো শুদ্ধ হবে নতুবা ভুল হবে। কাজেই নম্বর দেবার বেলায় পরীক্ষকের হাত-পা বাঁধা। প্রবন্ধের আকারে উত্তর লিখতে হয় এমন প্রশ্নের চেয়ে এই সব ছোট ছোট বস্তুতান্ত্রিক প্রশ্নের আর একটি সুবিধা হল এই যে এতে পাঠ্যবিষয়ের সমস্ত অংশ নেড়েচেড়ে প্রশ্ন করা চলে এবং প্রশ্নের সংখ্যাও হয় অনেক। এতে কপালঠোকা মুখস্থ বিদ্যার আশ্রয় নিলে

চলে না। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে এই নূতন ধরণের প্রশ্ন করে ভালভাবে পরীক্ষা নেওয়া যায়। ত্রিপুরায় আজ কয়েক বছর যাবৎ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বৃত্তি পরীক্ষায় এই ধরণেব প্রশ্ন করা হচ্ছে। কিন্তু সাহিত্য-সম্বন্ধীয় বিষয়ে যেখানে সুসম্বন্ধ চিন্তাধারা, বিশ্লেষণাত্মক ও সৃজনাত্মক রচনা, সাহিত্য রসবোধ ইত্যাদির প্রশ্ন আসে সেখানে এই বস্তুতান্ত্রিক প্রশ্নের কার্য্যকারিতা কম। সেখানে গতানুগতিক রচনামূলক প্রশ্নেরও প্রয়োজন আছে। আমরা নূতন ধরণের প্রশ্নের কয়েকটি নমুনা এখানে দিলাম।

ক বিভাগ—শুদ্ধ উত্তর নির্ব্বাচন

চতুর্থ শ্রেণী

ইতিহাস

নীচের প্রশ্নগুলো খুব ভাল করে পড়। প্রত্যেকটি প্রশ্নের জন্য ডান দিকে ৪টি করে উত্তর দেওয়া আছে। যে উত্তরটি তোমার ঠিক মনে হবে তার নীচে দাগ দাও। প্রথম প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া আছে।

প্রশ্ন	উত্তর
১। আমাদের দেশের দক্ষিণে যে মহাসাগর আছে তার নাম—	(ক) বঙ্গোপসাগর (খ) ভারত মহাসাগর (গ) দক্ষিণ মহাসাগর (ঘ) আরব সাগর
২। যে যুগের মানুষেরা প্রথম আগুনের ব্যবহার শিখেছিল সে যুগের নাম—	(ক) পুরাতন প্রস্তর যুগ

প্রশ্ন	উত্তর
	(খ) নূতন প্রস্তর যুগ
	(গ) তাম্র যুগ
	(ঘ) আধুনিক যুগ
৩। মহেঞ্জোদারো কোথায় অবস্থিত ?—	(ক) পাঞ্জাবে
	(খ) ইন্দ্রপ্রস্থে
	(গ) সিন্ধু প্রদেশে
	(ঘ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে
৪। বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মপ্রচার করেন—	(ক) গয়ায়
	(খ) সারনাথে
	(গ) মথুরায়
	(ঘ) লুম্বিনীতে

এই ধরণের প্রশ্নে কতগুলো সম্ভাব্য উত্তর থেকে সঠিক উত্তরটিকে বেছে দিতে হয়। ইংরেজীতে একে Multiple Choice Items বলে। এই রকম প্রশ্নের ব্যবহার আজকাল খুবই বেশী হচ্ছে। একাধিক নিয়মে এই প্রশ্ন করা চলে। সোজা প্রশ্ন করে উত্তরগুলো ডান দিকে লিখে দেওয়া যায় ; অথবা অসমাপ্ত কোন প্রশ্নের শেষাংশ ডান দিকে দিয়ে বাক্যটিকে শেষ করা যায়।

আর এক ধরণের প্রশ্ন আছে যার উত্তরগুলো হয় সত্য নয় মিথ্যা—হাঁ এবং না—এই তুটোর একটার মধ্যে পড়বে। এগুলোকে বলে True-false Items. এই ধরণের প্রশ্নের ব্যবহার খুব বেশী এবং অনেক সময় এর অপব্যবহারও হয়।

খ বিভাগ—সত্য-মিথ্যা নির্ণয়

তৃতীয় শ্রেণী

প্রকৃতি-বিজ্ঞান

নীচে কয়েকটি বাক্য দেওয়া আছে। বাক্যগুলো খুব ভাল করে পড়। যে বাক্যগুলো তোমার ঠিক মনে হবে তার বাম দিকে ✓ এই চিহ্ন দাও। আর যেগুলো ঠিক মনে হবে না তার বাম দিকে × কাটা চিহ্ন দাও। প্রথম দুটির উত্তর দেওয়া আছে।

১। ছোলা, মুগ ইত্যাদি একবীজপত্রী গাছ।

২। শেওলা একটি অপুষ্পক গাছ।

৩। মাছ জলের নীচে বাতাস ছাড়া বাঁচতে পারে।

৪। ব্যাঙাচি বড় হলে আর তার লেজ থাকে না।

৫। বিকালবেলা আমাদের ছায়া সবচেয়ে ছোট হয়।

টিকদাগ অথবা কাটাচিহ্ন না দিয়ে শিশুরা 'হাঁ' অথবা 'না' লিখে দিতে পারে।

আর এক রকমের প্রশ্ন আছে যেগুলোকে আমরা সম্বন্ধ-নিরূপক প্রশ্ন বলতে পারি—ইংরেজীতে এদের Matching Items বলা হয়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই রকম প্রশ্ন করা চলে। একটি নমুনা দেওয়া হল।

গ বিভাগ

পঞ্চম শ্রেণী

ভূগোল

নীচে দেখতে পাবে ৫টি বাক্য দেওয়া আছে। প্রত্যেকটি বাক্যের মধ্যে একটি খালি জায়গা আছে। এই খালি জায়গায় উপযুক্ত উত্তরটি বসিয়ে বাক্যটি পূর্ণ করতে হবে। বাক্যগুলোর শেষে একেবারে তলায় দেখতে পাবে ৫টি শব্দ দেওয়া আছে। এই শব্দগুলো থেকেই

তোমাকে ঠিক উত্তরটি বেছে প্রত্যেকটি বাক্য পূরণ করতে হবে। প্রথমটির উত্তর দেওয়া আছে।

উনকোটি

১। কৈলাশহরে গেলে অনেক লোক — পাহাড় দেখতে যায়।

২। — ডম্বুর জলপ্রপাত থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

৩। আগরতলা থেকে ধর্ম্মনগর যেতে হলে — পাহাড় পার হতে হয়।

৪। ত্রিপুরায় — মহকুমা আছে।

৫। কলিকাতা পশ্চিম বাংলার — ।

রাজধানী, আঠারমূড়া, উনকোটি, গোমতী, দশটি।

নূতন পরীক্ষাপদ্ধতির আর এক ধরণের প্রশ্নের নাম হচ্ছে—Recall Items. এতে পরীক্ষার্থিদের সাধারণতঃ একটি তথ্য অথবা একটি নাম অথবা একটি তারিখ উত্তরের স্থানে লিখে দিতে হয়। এই প্রশ্নও বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা চলে। কখনও শূন্যস্থান রেখে, কখনও সোজা প্রশ্ন করে, কখনও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নিরূপণ করতে বলে এই ধরণের প্রশ্ন করা যায়। যেখানে সোজা প্রশ্নের উত্তর লিখবার জন্য শিক্ষার্থিদের বলা হয়, সেখানেও এমন নির্দ্দেশ থাকে যাতে উত্তর খুব সংক্ষিপ্ত হয়। একরকম নমুনা এখানে দেওয়া হল।

ঘ বিভাগ

চতুর্থ শ্রেণী

সাধারণ জ্ঞান

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর এক কথায় লিখে দাও। প্রথমটির উত্তর দেওয়া আছে।

প্রশ্ন	উত্তর
১। আগরতলার রাজপ্রাসাদটির নাম কি ?	১। উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ
২। জ্বর হলে কোন্ যন্ত্র দিয়ে আমরা গায়ের তাপ দেখি ?	২।
৩। শীতকালে দিন ও রাত্রির মধ্যে কোন্‌টি বড় হয় ?	৩।
৪। তাজমহল কে নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন ?	৪।
৫। ২৩শে জানুয়ারী কার জন্মদিন ?	৫।

বলা বাহুল্য এই ধরণের প্রশ্ন করতে হলে শিক্ষকের পরিশ্রম অনেক বাড়বে এবং তাঁকে অনেকদিক থেকে যত্নশীল হতে হবে। এই প্রসঙ্গে যে কথা সবচেয়ে বেশী মনে রাখতে হবে তা হচ্ছে এই যে এই প্রশ্নগুলো অত্যন্ত সরল, স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হবে—এতে কোনরূপ অস্পষ্টতার স্থান নেই। আর শিক্ষক শিশুদের কাছ থেকে ঠিক কোন্ জিনিসটি চাইছেন সে সম্বন্ধেও তাঁকে আগে থেকে নিশ্চিত হতে হবে। তা না হলে প্রশ্নগুলো এলোমেলো হতে পারে। আর একটি হল শিশুদের প্রতি নির্দ্দেশ। এই ধরণের প্রশ্নে প্রশ্নকর্ত্তার নির্দ্দেশাবলীও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্দ্দেশও খুব সোজা ও দ্ব্যর্থহীন হবে। এই নির্দ্দেশাবলীকে সোজা ও সরল করার জন্য যদি বেশ অনেকটাও লিখতে হয়, তাহলে তাও করতে হবে। অভ্যাসের অভাবে প্রথম অবস্থায় এই ধরণের প্রশ্ন করতে কিছু অসুবিধা হলেও আস্তে আস্তে অনুশীলনের প্রভাবে তা দূর হয়ে যাবে।

সামগ্রিক বিবরণী পত্র
Cumulative Record Card

সামগ্রিক বিবরণী পত্র অথবা Cumulative Record অতি আধুনিক কালের জিনিস। কেবলমাত্র পরীক্ষার সাহায্যে একটি শিক্ষার্থীর সমগ্র ব্যক্তিত্ব, তার আগ্রহ, প্রবণতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, সামাজিকতা, সহযোগিতা, সাধারণ কর্ম্মকুশলতা—এক কথায় তার বিভিন্ন গুণাবলীর সামগ্রিক কোন পরিচয়ই যে পাওয়া যায় না একথা স্বতঃসিদ্ধ। বহুকালের পরীক্ষাপদ্ধতির মধ্যে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান যে অনেক গলদ বের করেছে একথা আমরা আগেই বলেছি। অথচ একথাও ঠিক যে শিক্ষার্থিদের মাননিরূপণ, যোগ্যতা বিচার যে কোন প্রকারেই হোক করতে হবে। তাই বিশেষজ্ঞগণ বলেন—Testing and recording in their most skilful form can be combined in the twentieth-century device commonly called a "cumulative record card." দিনের পর দিন একটি শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন কাজে, বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন সমস্যার সামনে যত্নসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করে—একাধিক পরীক্ষায় ফেলে তার সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায়, এই বিবরণী পত্রে সেটিই লিপিবদ্ধ থাকে। নেহাৎ মামুলী একটা পরীক্ষার চেয়ে এই ব্যাপক পর্য্যবেক্ষণপ্রসূত মতামতের মূল্য যে অনেক বেশী একথা সকলেই স্বীকার করেন এবং আশা করা যায় ভবিষ্যতে একদিন বর্ত্তমান পরীক্ষাপ্রহসনের পরিবর্ত্তে সুসংরক্ষিত সামগ্রিক বিবরণী পত্রের অভিমতই শিক্ষার্থীর যোগ্যতাবিচারে অধিকতর নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি হিসাবে পরিগণিত হবে। বিষয়টি নূতন বলে এতে গবেষণার সুযোগ রয়েছে। এর কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তার উল্লেখও আমরা এখানে করতে পারি—'Its special function is exercised at critical points in the life of a pupil when....selection requires to be

made and guidance educational or vocational needs to be given....It is planned to render more skilful the advice which teachers, by virtue of their office, find themselves invited to give to pupils or their parents at the dividing of the ways when crucial decisions require to be made.······*Special importance therefore attaches to the primary school records, which prepares the way for what can be called educational guidance, and to the secondary school record which is particularly relevant to vocational guidance.*' প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে এই বিবরণী পত্র যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এই অভিমত থেকে সেকথা বোঝা যায়।

এই বিবরণী পত্রের কোন বাঁধাধরা ছক্ নেই—বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এর বিভিন্ন ফর্ম দেখতে পাওয়া যায়। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে বছরের পর বছর একজন শিক্ষার্থীকে ভালভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে তার ক্রমপ্রকাশমান শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো সম্বন্ধে সুচিন্তিত মতামত একটা জায়গায় লিপিবদ্ধ করে রাখবার জন্য যিনি যেমন সুবিধাজনক ফর্ম তৈরী করে নিতে চান তেমনটিই তৈরী করে নিতে পারেন। "Condensed case study"র সামগ্রিক ইতিহাসটি লিপিবদ্ধ হলেই হল। তবে মোটামুটিভাবে কয়েকটি সাধারণ কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা যেতে পারে। বিবরণী পত্র অতিমাত্রায় দুর্ব্বোধ্য ও জটিল হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সমস্ত জিনিসটি যত সহজ সরল হয় ততই ভাল। এতে ঘরগুলো ভর্ত্তি করতে শিক্ষকদের কোন অনাবশ্যক মেহনতের প্রয়োজন হবে না। বছরের পর বছর একই কার্ডে সব মতামত লিখে রাখতে হয় বলে কার্ডটি শক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী কাগজের হওয়া দরকার।

আর একটি প্রধান কথা মনে রাখতে হবে যে এই বিবরণী

পত্র একটি বিশ্রব্ধ দলিল—এটি progress report অথবা mark sheet এর নামান্তর নয়। শিক্ষার্থিরা ভবিষ্যৎজীবনে যাতে নিজেদের যোগ্যতা, আগ্রহ ও প্রবণতার ভিত্তিতে আপনার কর্ম্মপথ বেছে নেবার সুযোগ পায়—জনশক্তির যাতে কোনরূপ অপচয় না ঘটে—সেই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ যুগসন্ধিক্ষণে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও উপদেশ দেবার জন্যই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ কার্ডের ব্যবহার করবেন। কাজেই কার্ডটিকে যে বিশেষ যত্নসহকারে রাখতে হবে একথা না বললেও চলে। আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষার কাজ আরম্ভ হয়েছে মাত্র। কাজেই এই সব নূতন জিনিসের ব্যাপক প্রবর্ত্তন এখনও সম্ভব হয় নি। আজও হয়তো অভিভাবক সম্প্রদায়ের একাংশ এই সব কার্ডের মতামতের চেয়ে গতানুগতিক পরীক্ষার নম্বরের উপরই বেশী শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য্য যে দেশে নূতন শিক্ষার দৃঢ় বুনিয়াদ যদি স্থাপন করতে হয় তাহলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলোকে এ সব সংস্কারমূলক ব্যবস্থা অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে এবং এমন একদিন আসবে যেদিন অভিভাবকরাও এই ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত মূল্য উপলব্ধি করে বিদ্যালয়ের মতামতের উপর আস্থাবান হবেন।

প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী—এই আটটি ক্লাশে শিক্ষার্থিদের অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করে গেলে বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ তাদের বিভিন্ন গুণাবলী সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক ধারণা অতি সহজেই পেতে পারেন। এই ধারণা পাওয়ার ফলে যোগ্যতা, আগ্রহ ও প্রবণতার ভিত্তিতে কোন্ শিক্ষার্থীর কোন্ বিভাগে যোগদান করা উচিত ও সাফল্যলাভ করবার সম্ভাবনা বেশী সেই মতামতটিও বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ অধিকতর যুক্তি ও নিশ্চয়তার সঙ্গে দিতে পারেন। বর্ত্তমানে হচ্ছে কি ? জীবিকা অর্জ্জনের কঠোর সংগ্রামে কে কোথায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে ঠিক নেই। এক সময় ছিল যখন বি. এ., এম. এ. পাশ করলে বিদেশী ভারত সরকারের রাজদরবারে, সওদাগরী অফিসে,

রেলে লোভনীয় পদ পাওয়া যেত। তখন ছুটত সবাই সেদিকে। কালক্রমে চাকা ঘুরে গেছে। এখন হয়েছে টেক্‌নিক্যাল লাইন। একজন অভিভাবকের কথা বলতে পারি। তিনি তাঁর এক পুত্রকে আই. এস.সি. ক্লাশে ভর্ত্তি করে দিয়েছেন ; উদ্দেশ্য—ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিভাগে উৎকর্ষ লাভ করবার যোগ্যতা ও প্রবণতা নিয়ে ছেলেটি পৃথিবীতে আসে নি। আজ যতই সে এই বিভাগ পরিত্যাগ করে কলাবিভাগে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছে, পিতা ততই তার উপর মারমুখো হয়ে উঠছেন। ফল হচ্ছে কি? পদার্থবিদ্যা, গণিত ও রসায়নের জটিল আবর্ত্তে ছেলেটি হাবুডুবু খাচ্ছে। দিন দিন তার আত্মবিশ্বাস কমে যাচ্ছে। প্রাণচঞ্চল কৈশোরের বন্ধনহীন প্রফুল্লতার পরিবর্ত্তে তার দেহ ও মনে প্রবেশ করছে জরা। আত্ম-অপসারণ (withdrawal) প্রায় সম্পূর্ণ। ওদিকে পিতা স্বপ্ন দেখছেন কবে তাঁর পুত্র নতুন ভিলাইএর নির্ম্মাতারূপে আত্মপ্রকাশ করবে ; এ স্বপ্ন তিনি ব্যর্থ হতে দেবেন না ; কারণ—'হবে না মানে ? আমার ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে না ? এ কখনো হতে পারে ? না হলে চাবুক মেরে কি করে ইঞ্জিনিয়ার করতে হয় সে মন্ত্র আমি জানি···দুনিয়াটা কবিতার ফুলেল হাওয়ায় ভেসে বেড়াবার 'শান্তিনিকেতন' নয়···' ইত্যাদি। এই চিন্তাধারার পরিণাম কতদূর ভয়াবহ হতে পারে তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিবিধার্থসাধক বহুমুখী শিক্ষাধারা প্রবর্ত্তিত হতে চলেছে। দেশের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে যাতে নিজের যোগ্যতা ও আগ্রহ অনুযায়ী বিকাশলাভের সুযোগ পায় তার জন্যই এই বহুমুখী শিক্ষা-পরিকল্পনা। কিন্তু এই পরিকল্পনা কখনো সার্থক হতে পারে না যদি মাধ্যমিক স্তরে প্রবেশ করবার আগের আট বছরে ছাত্রছাত্রীদের পর্য্যবেক্ষণের কাজটি যথাযথভাবে সম্পাদিত না হয়। কাজেই সুসংরক্ষিত বিবরণী-পত্রের মতামত নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মূল্যবান।

সামগ্রিক বিবরণী পত্র

(Cumulative Record Card)

——————————বিদ্যালয়

১। শিক্ষার্থীর নাম——————

২। জন্মতারিখ——————

৩। অভিভাবকের নাম——————

৪। ঠিকানা——————

——————

৫। পরিবারে শিক্ষার্থীর স্থান

৬। অভিভাবক কি করেন

৭। গৃহের পরিবেশ ও পারিবারিক শৃঙ্খলা

৮। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় জীবনের ইতিহাস——————

(ক) কোন্ কোন্ স্কুলে পড়েছে

——————

(খ) কোন্ বছরে——————

(গ) পরিবর্তনের কারণ——————

৯। শিক্ষার্থীর নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা——————

——————

১০। অভিভাবকের পরিকল্পনা——————

——————

ক—বিদ্যার্থবিষয়ক উৎকর্ষ

বিষয়	১৯৫৯ শ্রেণী—	১৯৬০ শ্রেণী—	১৯৬১ শ্রেণী—	১৯৬২ শ্রেণী—	১৯৬৩ শ্রেণী—	১৯৬৪ শ্রেণী—	১৯৬৫ শ্রেণী—	১৯৬৬ শ্রেণী—
মাতৃভাষা ও সাহিত্য								
ইংরেজী								
গণিত								
সমাজবিজ্ঞান								
বিজ্ঞান								

খ—ব্যবহারিক বিষয়সমূহ

১। হস্তশিল্প

(ক) শিল্পকুশলতা

(খ) অভিনিবেশ

(গ) সমাপনকুশলতা

সামগ্রিক মান

বিষয়	১৯৫৯ শ্রেণী—	১৯৬০ শ্রেণী—	১৯৬১ শ্রেণী—	১৯৬২ শ্রেণী—	১৯৬৩ শ্রেণী—	১৯৬৪ শ্রেণী—	১৯৬৫ শ্রেণী—	১৯৬৬ শ্রেণী—
২। সামাজিক ও নাগরিক শিক্ষা								
(ক) দলীয় মনোবৃত্তি								
(খ) সেবাপরায়ণতা								
(গ) সংগ্রহ প্রবৃত্তি								
(ঘ) স্বপ্রকাশ ক্ষমতা								
সামগ্রিক মান								
৩। শারীরিক শিক্ষা								
(ক) শারীরিক দক্ষতা								
(খ) খেলাধূলায় অংশগ্রহণ								
সামগ্রিক মান								

৪। অঙ্কন ও চারুশিল্প

(ক) আঙ্গিক শৈলী

(খ) প্রকাশ-পূর্ণতা

(গ) মৌলিকতা

সামগ্রিক মান

৫। সাঙ্গীতিক

যোগ্যতা

(ক) কণ্ঠসঙ্গীত

(খ) যন্ত্রসঙ্গীত

(গ) সুর

(ঘ) ছন্দ

(ঙ) নৃত্য

সামগ্রিক মান

গ—স্বাস্থ্য বিবরণী

উচ্চতা

ওজন

বক্ষ—স্বাভাবিক

বিষয়	১৯৫৯ শ্রেণী—	১৯৬০ শ্রেণী—	১৯৬১ শ্রেণী—	১৯৬২ শ্রেণী—	১৯৬৩ শ্রেণী—	১৯৬৪ শ্রেণী—	১৯৬৫ শ্রেণী—	১৯৬৬ শ্রেণী—
বক্ষ—প্রসারিত								
„ —সঙ্কুচিত								
বিদ্যালয় স্বাস্থ্য-পরিদর্শকের মতামত								

ঘ—ব্যক্তিগত গুণাবলী

আত্মবিশ্বাস								
সামাজিকতা								
সততা								
অগ্রগামিতা								
অধ্যবসায়								
নেতৃত্ব								
মানসিক স্থৈর্য্য								

(বিঃ দ্রঃ)—এই সব গুণাবলী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখা বাঞ্ছনীয়। যেমন—

অগ্রগামিতা—	খেলাধূলা	— ক	অধ্যবসায়—	শিল্পকাজ	— ক	নেতৃত্ব—	খেলাধূলা	— গ
	সমাজসেবা	— গ		গণিত	— গ		উৎসব অনুষ্ঠান	— খ
	উৎসব অনুষ্ঠান	— খ		খেলাধূলা	— খ		শ্রেণীর কাজ	— ক

ঙ—সাধারণ মন্তব্য

	১৯৫৯	১৯৬০	১৯৬১	১৯৬২	১৯৬৩	১৯৬৪	১৯৬৫	১৯৬৬
১। কোন দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করেছে কি না								
২। বিশেষ কোন মন্তব্য								

শ্রেণীশিক্ষকের স্বাক্ষর ———————— প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর ————————

তারিখ ———————— তারিখ ————————

এই সামগ্রিক বিবরণী-পত্র শ্রেণীশিক্ষক বছরের শেষে পূরণ করবেন। সারা বছর ধরে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পর্য্যবেক্ষণ করে তাঁর মতামত তিনি লিপিবদ্ধ করে রাখবেন এবং বছরের শেষে এই সব লিপিবদ্ধ মতামত থেকে চূড়ান্ত মতামত দিয়ে ঘরগুলো পূরণ করবেন। বলা বাহুল্য এই কাজে তাঁকে সহকর্মী শিক্ষকদের সঙ্গে অনেক বিষয়েই আলোচনা করে নিতে হবে। ক খ গ ঘ ঙ এই পাঁচটি প্রতীকের মান আগে থেকে নির্দ্ধারিত করে এই

প্রতীকের সাহায্যেই তিনি মতামত লিপিবদ্ধ করতে পারেন। বিভিন্ন প্রতীকের তারতম্য সম্বন্ধে একটি নির্দ্দেশিকা এখানে দেওয়া হল। ক হচ্ছে অতি উৎকৃষ্ট যোগ্যতার পরিচায়ক। বিশেষ কোন দলের ১০০ জনের মধ্যে যে ২ জন সবচেয়ে ভাল তারাই ক পাবার অধিকারী। আবার যে ২ জন সবচেয়ে অনগ্রসর তারা ঙ পাবে। শতকরা হিসাবে যোগ্যতার শ্রেণীবিভাগ বিশেষজ্ঞগণ এইভাবে করেছেন:—

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
২ জন	২৩ জন	৫০ জন	২৩ জন	২ জন
অতি উৎকৃষ্ট	উৎকৃষ্ট	মাঝারি	মাঝারির নীচে	অত্যন্ত অনগ্রসর

ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা পর্য্যাপ্ত নয়। কাজেই পাঁচটি প্রতীকের পরিবর্ত্তে ক, খ, গ এই তিনটি প্রতীকের ব্যবহার করেও মান নিরূপণের কাজ আপাততঃ চলতে পারে। পাঁচটি প্রতীকের সার্থক ব্যবহার ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পারদর্শিতার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

অন্যান্য গুণাবলী বিচারে এই প্রতীকসমূহের আপেক্ষিক ব্যবধান পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় নির্দ্দেশিত হল।

গুণাবলী	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
আত্মবিশ্বাস	খুবই আত্মবিশ্বাসী, উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন, যুক্তিসঙ্গত অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে প্রস্তুত	স্বীয় শক্তি সম্বন্ধে সচেতন, আত্মবিশ্বাস আছে, অপরের সঙ্গে ব্যবহারে সপ্রতিভ ভাব	বাঁধাধরা অবস্থায় স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাস আছে, বিশেষ কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই	অপরের উৎসাহ ও লক্ষ্য ছাড়া বেশীক্ষণ কাজ করে যেতে পারে না	নিজেকে জাহির করার চেষ্টা অত্যন্ত বেশী, সকলে অবহেলা করল এই ভয়, লোকের সামনে বেরুতে ভয়, ঘাবড়ে যাওয়া
অধ্যবসায়	অক্লান্ত অধ্যবসায়ী	খুব সহজেই থেমে যায় না	মোটামুটি স্থিরভাবে কাজ করে	চঞ্চল, মতের পরিবর্তন হয়, লেগে থাকার প্রবৃত্তি নেই	অতি সহজেই হাল ছেড়ে দেয়

গুণাবলী	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
নেতৃত্ব	বেগবান নেতৃত্ব, ধীর-স্থির, প্রভাববিস্তার-কারী, দলের কাছে জনপ্রিয়তা, দলের সমর্থন পায় এবং দলকে সঙ্গে নিয়ে চলে	নেতৃত্ব নেবার জন্য প্রস্তুত, নেতৃত্বের জন্য ধীরভাবে কাজ করে যায়, দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত	ছোটখাট ব্যাপারে কখনো নেতৃত্ব গ্রহণ করে	অন্যের পরিচালনাধীনে চলতে প্রস্তুত ও সন্তুষ্ট	পরিচালনার কোন শক্তি নেই
সামাজিকতা	সামাজিক মূল্যবোধে প্রখর অনুভূতি, তীক্ষ্ণ বাস্তবানুরাগ ও সামাজিক চেতনা, সাংস্কৃতিক বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন	অপরের দিকটি বিবেচনা করে. সাংস্কৃতিক চেতনা-বোধ আছে	বিশেষ কোন স্বকীয় মতামত নেই, নিরপেক্ষ নীতির পক্ষপাতী, নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন, অপরেরটা সম্পর্কে কখনো সচেতন কখনো উদাসীন	বিশেষভাবে আত্মকেন্দ্রিক	অসামাজিক, অপরের সঙ্গে কোন বনিবনা নেই

বিদ্যার্থী পরিষদ ও গণতান্ত্রিক জীবন

বিভিন্ন শ্রেণীতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করার পশ্চাতে সুদূরপ্রসারী শিক্ষাগত সম্ভাবনা রয়েছে বলেই বুনিয়াদী শিক্ষায় বিদ্যার্থী পরিষদ গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অনেকে একে অর্থহীন আড়ম্বর বলে মনে করেন। তাঁদের বক্তব্য হল যে ছোট ছোট শিশুরা এই সব দায়িত্বের কোন মানেই বোঝে না—কাজেই মন্ত্রী-উপমন্ত্রী ইত্যাদি নির্ব্বাচনের ব্যাপারটা অনেকটা প্রহসনে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত পর্য্যবসিত হয়। গালভরা মন্ত্রী কথাটাকে যাঁরা হাস্যকর মনে করেন, তাঁরা শব্দটিকে বদলে নায়ক শব্দটি ব্যবহার করতে পারেন। বিশেষ করে প্রথম শ্রেণীতে নায়ক কথাটিই বেশী উপযোগী। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুদের দায়িত্বপালনে অভ্যস্ত করে তোলা, নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশ লাভে সাহায্য করা, দশজনের সঙ্গে কাজ করে সমালোচনার সম্মুখীন হওয়া এবং প্রয়োজনবোধে তার জবাব দেওয়া এবং বিশেষ করে এই সমাজচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা যে জীবনের বৃহত্তর বিশাল ক্ষেত্রে ব্যক্তি একা নিজেকে নিয়ে থাকতে পারে না—অপরের কথাটাও তাকে ভাবতে হবে। আজ যে শিশু তাকে ভবিষ্যতে একদিন সমষ্টিগত জীবনের জটিল আবর্ত্তে পা দিতে হবে। কাজেই শৈশবের দিনগুলিতে—অনুকরণ-প্রবৃত্তি যখন প্রবল—মন যখন সতেজ ও উদার—তখন যদি তাকে গণতান্ত্রিক সমাজজীবন ও তার কতগুলো বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আংশিক কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করতে সাহায্য করা যায়—শিশুদের মত করেই সে অভিজ্ঞতা হোক না কেন—তাহলে তার অন্তর্নিহিত মূল্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করার কোন কারণ নেই। শিশুরা যখন বিদ্যার্থী পরিষদে বিতর্কে নামে, রিপোর্ট পেশ করে অথবা প্রশ্ন তোলে, তখন তাকে নিশ্চয়ই আমরা লোকসভার কোন অধিবেশন বলে ভুল করব না; কিন্তু একথাও ঠিক যে ব্যাপারটি

একেবারে হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়। অনেক সময় এদের কাছ থেকে ভাল ভাল রিপোর্ট আসে, অনেক সুন্দর নিয়মাবলীর প্রস্তাব এরা দেয় এবং শ্রেণীর বিভিন্ন কর্ম্মসম্পাদনায় যৌথ দায়িত্ব গ্রহণ করে।

বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ দুটো পরিষদ থাকে—বিভিন্ন শ্রেণীতে শ্রেণী পরিষদ এবং সমগ্র বিদ্যালয়ের জন্য বিদ্যার্থী পরিষদ। মাসের প্রথম দিকে—অবশ্যই প্রথম সপ্তাহের মধ্যে—এই পরিষদ গঠনের জন্য নির্ব্বাচনের কাজ শেষ করা বিধেয়। এই নির্ব্বাচনের বিবরণী—কার কার নাম প্রস্তাবিত হল, কে কত ভোট পেল, পরিষদ কাকে কাকে নিয়ে গঠিত হল—ইত্যাদি বিষয়সমূহ প্রত্যেক মাসেরটা আলাদাভাবে গুছিয়ে লিখে রাখা উচিত। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ক্লাশের জন্য এক একখানা ও বিদ্যার্থী পরিষদের জন্য আর একখানা—এই দুই প্রস্থ খাতা রাখতে হবে। প্রতি মাসে পরিষদের যে সম্পাদক হবে সে এই বিবরণী লিখে রাখবে। এছাড়া বিভিন্ন বিভাগের নায়কদের প্রত্যেকের জন্য (শ্রেণী পরিষদ ও বিদ্যার্থী পবিষদ) এক একখানা করে খাতা রাখতে হবে। এই সব খাতাগুলো বাঁধানো রুলটানা হলে ছাত্রছাত্রীদের লিখতে সুবিধা হয়। আর খাতাগুলোকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে বলে খুব যত্ন করে কোন কিছু লেখার অভ্যাসও এর ফলে শিশুদের গড়ে ওঠে। এক এক বিভাগের জন্য এক একখানা আলাদা খাতা রইল। এক একজন বিদায়ী নায়ক এই খাতায় তার নিজস্ব বিভাগের মাসিক কার্য্যবিবরণী লিখে পরিষদের সামনে পড়বেন এবং তার উপর সমালোচনা হবে। মজবুত বাঁধানো খাতায় এই রিপোর্টগুলো এবং সমালোচনার বিবরণী স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করতে পারলে বিদ্যালয়-কর্ত্তৃপক্ষ যে লাভবান হবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য লেখার কাজটা খুব সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করে রাখবার জন্য সংশ্লিষ্ট নায়কের শিক্ষকদের কাছ থেকে সাহায্যের প্রয়োজন হবে। এই লেখারও নিজস্ব একটা মূল্য আছে।

শিক্ষক ও অভিভাবকদের মিলনদিনে এই খাতাগুলো অভিভাবকদের কাছে একটা আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং শিশুশিক্ষার কতগুলো প্রধান বৈশিষ্ট্যের প্রতি অভিভাবকদের চেতনাসম্পন্ন করার যে কথা বলা হয়, এই খাতাগুলো সে উদ্দেশ্যও অনেক পরিমাণে সাধিত করতে পারে।

বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ যে সমস্ত বিভাগের জন্য নায়ক নির্ব্বাচিত হয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছে ঃ—

(ক) স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা
(খ) খেলাধূলা
(গ) শ্রেণীব কাজ
(ঘ) শিল্প
(ঙ) কৃষ্টি

এর উপব সম্পাদক, প্রধান নায়ক আছেন। সবার উপবে আছেন সভাপতি।

ছাত্রসমাজে শৃঙ্খলাব সমস্যা নিয়ে আজকাল বিশেষ কলরব শোনা যাচ্ছে। ছাত্রসমাজ উচ্ছৃঙ্খল, তারা নিয়মকানুন মানে না, সত্যমিথ্যার বিচাব করে না, গুরুজনে ভক্তি নেই, কেবল হৈ হৈ করতে ওস্তাদ ইত্যাদি অভিযোগের অন্ত নেই। পরিস্থিতি গুরুতর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং এর পেছনে অনেক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ যে রয়েছে একথাও অভিযোক্তাবা স্বীকাব কবেন। সে সব দিকে আপাততঃ না গিয়ে আমরা একথাটি বলতে পারি যে শিক্ষার শৃঙ্খলা ও সামরিক শাসনের শৃঙ্খলা একবস্তু নয়। প্রথমটি উৎসারিত হয় শ্রীমণ্ডিত মানসিক জীবনের প্রশান্ত অন্তর্লোক হতে; আর দ্বিতীয়টি আরোপিত হয় দানবীয় শক্তির ভীতিপ্রদ বহিঃপ্রকাশে। একটি ভিতরের, অপরটি বাইরের! সর্ব্বজনস্বীকৃত নীতিনিয়মকে

স্বেচ্ছায় গ্রহণ করার এই যে অন্তরলোকের শৃঙ্খলা বিদ্যার্থী পরিষদের এটি একটি বিশিষ্ট অবদান। এই প্রসঙ্গে আমরা শিশুদের স্বাধীনতা, শৃঙ্খলা, শাস্তি ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর আলোচনা করতে পারি।

স্বাধীনতা, শৃঙ্খলা ও শাস্তি

বিদ্যালয়ে স্বাধীনতার আবহাওয়া প্রতিষ্ঠা একদিনে সম্ভব হয়েছে একথা ভুলেও কেউ বলবেন না। শিশুদের প্রাধান্য দেওয়া, তাদের কল্পনাবিলাসী বিচিত্র খেয়ালী মনের পরিচয় জানার চেষ্টা করা, শাসনের কঠোরতায় জোরপূর্ব্বক বিদ্যালয়কে একটা ভীতিপ্রদ বন্দীশিবিরে পরিণত না করা ইত্যাদি আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত ভাবধারা আমাদের দেশে মাত্র অল্প কিছুদিন যাবৎ কার্য্যকরী হতে আরম্ভ হয়েছে। অবশ্য যুগ-বিশেষে অবস্থা প্রায় সব দেশেই এক রকমের ছিল। ডেভিড কপারফিল্ডের অভিজ্ঞতা আর প্রসন্ন পণ্ডিতের পাঠশালায় অপুর অভিজ্ঞতার মধ্যে তীব্রতার সামান্য হালফের হতে পারে—কিন্তু মূলতঃ সমস্যাটি একই রকমের। একথা আজ সবাই স্বীকার করেন যে শাসনদণ্ড ও রক্তচক্ষুর দ্বারা শিশুদের আপাত দৃষ্টিতে "শান্তশিষ্ট" করে রাখা যেতে পারে বটে, কিন্তু তাতে তাদের সত্যিকার মানসিক জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত শৃঙ্খলা আসবে না। মাষ্টারের চোখের আড়াল হলেই আবার তারা যেই সেই "লেজবিশিষ্ট" হয়ে যেতে পারে। কাজেই বর্ত্তমান শিক্ষানীতি একথা বিশ্বাস করে যে শৈশবের দুরন্ত দিনগুলিতে শিশুদের দায়িত্বপালনের অভিজ্ঞতা দেওয়া ভাল। এই দায়িত্ব তারা নিজেরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে—দায়িত্ব-পালনের নিয়মকানুন বিধিনিষেধ তারা নিজেরাই নির্ম্মাণ করে এবং শপথও গ্রহণ করতে হয় যে নিজেদের তৈরী নিয়মাবলী তারা কখনও লঙ্ঘন করবে না। লঙ্ঘনকারীর শাস্তিবিধানের দায়িত্ব শিক্ষকেরও

স্বাধীনতা

যেমন আছে, তাদেরও তেমনি আছে। শিশুদের স্বাধীনতা দেওয়ার কথায় অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেন—এই সব দুরন্ত "শিবের দূতদের" স্বাধীনতা দিলে লেখাপড়ার আর থাকবে কি—এরা তো সর্ব্বত্রই দক্ষযজ্ঞ বাধাবে? এমন দাপটে এদের রাখতে হবে যাতে টুঁ শব্দটি কেউ করতে না পারে—এই না হলে আবার শাসন-শৃঙ্খলা? বলা বাহুল্য এঁরা Spare the rod and spoil the child—এই যুগপবিত্র ভাবধারার পূজারী। কিন্তু আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে শিশুর স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচার নয়। স্বাধীনতা মানে স্কুলের সময়ে ঘুড়ি উড়াবার অথবা স্কুলে আগুন লাগাবার স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতার একটা সামাজিক দিকও আছে—দশজন লোক একই সময়ে বিভিন্ন ধারায় স্বাধীনভাবে যে যার কাজ করে যাচ্ছে—কিন্তু কোথাও কোন সঙ্ঘাত আসছে না—বিরোধের সূত্রপাত হচ্ছে না। এই অবস্থায়ই কেবল ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাধীনতার সমন্বয় সাধিত হতে পারে। এখন এই স্বাধীনতা সম্বন্ধে শিশুদের কেবলমাত্র কতগুলো নীতিবাক্য শুনিয়ে—কতগুলো ন্যায়সূত্র মুখস্থ করিয়ে কোন লাভ নেই। এই নীতিবাক্য আমরা যুগ যুগ ধরে শুনিয়ে আসছি। কি ফল হয়েছে সমাজের দিকে চাইলেই তা বোঝা যায়। কাজেই দৈনন্দিন জীবন ও এর বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যদি স্বাধীনতার মর্ম্ম ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত হয়ে শৈশব থেকেই তা একটা অভ্যস্ত আচরণে পরিণত হয়ে না যায়, তাহলে বাণী পাঠ করে আর লাভ কি? বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে দায়িত্বপালনের মধ্য দিয়েই শিশুদের এই স্বাধীনতার প্রথম আস্বাদ দেওয়া হয়। দায়িত্বপালন করতে গিয়ে স্কুলের মধ্যেই শিশুদের একটি ক্ষুদ্র সামাজিক জীবন গড়ে তুলতে হয়। সঙ্ঘবদ্ধভাবে অনেকগুলো নিয়মকানুন তাদের মেনে চলতে হয়। একে অপরের দিকটি দেখতে হয়। প্রত্যক্ষ অভ্যাসের দ্বারা শিশুদের বোঝবার সুযোগ আসে যে স্বাধীনতা মানে স্বৈরাচার নয়—

স্বাধীনতা সব সময়েই শৃঙ্খলার অনুশাসনে সীমায়িত হবে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে সমাজের সঙ্গে নির্ব্বিরোধে বাস করবার জন্য যে মানসিক শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজন—যে সমন্বয়মুখী সহিষ্ণুতার প্রয়োজন—শিশুদের স্বাধীনভাবে বাড়বার ও কাজ করবার সুযোগ দিয়ে বুনিয়াদী বিদ্যালয় সেই গুণাবলীকেই জাগ্রত করার চেষ্টা করে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা প্রসঙ্গে উপরে আমরা যে কথার উল্লেখ করলাম এর ভেতর থেকে শৃঙ্খলা ও সুশাসন সম্বন্ধেও ধারণা পাওয়া যাবে। শৃঙ্খলা বলতে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে যে বাইরে থেকে আরোপ করা বিধিনিষেধের কঠোরতা এবং শ্মশানের শান্তি বোঝায় না একথা আমরা উল্লেখ করেছি। নীতিনিয়মকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ ও সর্ব্বক্ষেত্রে যথাসম্ভব তাকে মেনে চলার স্বতঃপ্রণোদিত আচরণই শৃঙ্খলা ও সুশাসনের লক্ষ্য—লোকের সামনে শৃঙ্খলাবোধের কপটাচরণ নয়। শিশুদের মধ্যে এই মানসিক শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করতে হলে, তাদের মধ্যে এই সুঅভ্যাস গঠন করতে হলে কতগুলো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাদের নিয়ে যাওয়া দরকার। এই অভিজ্ঞতার সুযোগ দৈনন্দিন স্কুলজীবনে যত বেশী আসবে ততই শিশুদের বিশৃঙ্খল হবার সম্ভাবনা কমবে। অবশ্য একথা খুবই

শৃঙ্খলা

সত্যি যে রাতারাতি কোন স্কুলে সুশাসন অথবা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়—তার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘদিনের অনলস প্রচেষ্টা। শিশুর সামনে ধর্ম্মকথার কল্যাণবাণীর কোন মূল্য তেমন নেই। তার জন্য প্রয়োজন হবে একটা সুন্দর আবহাওয়া—দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য—যার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে অনায়াসলব্ধ অভিজ্ঞতার ফলেই তার জীবন শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠবে। এখন এই ঐতিহ্য গড়ে তোলাই হল স্কুলের প্রধান কর্ত্তব্য এবং তার জন্য সময়েরও প্রয়োজন। শিল্পকাজের সুবন্দোবস্ত, ভাণ্ডারকক্ষের সুশৃঙ্খল সংগঠন, বিদ্যার্থী পরিষদ ও শ্রেণী

পরিষদের কর্ম্মসম্পাদন, উৎসব অনুষ্ঠানের সুনিয়ন্ত্রিত পরিচালনা, খেলার মাঠের নিয়মাবলী, প্রণালীবদ্ধ সমবেত প্রার্থনা, বিশেষ কোন সময়ে নীরবতা অবলম্বন, লাইনে চলা, আস্তে কথা বলা এবং সর্ব্বোপরি শিক্ষকবৃন্দের সস্নেহ সুন্দর ব্যবহার—ইত্যাদির সমবেত প্রভাবের ফলেই বিদ্যালয়ে এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি হতে পারে যেখানে অবাঞ্ছিত ক্রিয়াকলাপের দিকে শিশু আপনা থেকেই আর পা বাড়াবে না। এই আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য শিক্ষকদের সব দিক থেকে সতর্ক হওয়া দরকার। কোন দিকে কোন শিথিলতা, অবহেলা অথবা অমনোযোগিতা এসে গেলে ঐতিহ্য আর গড়ে উঠবে না। কাজেই এই বিষয়টিতে বিশেষ করে অনেকদিন লেগে থাকার দরকার আছে। অবশ্য এখানে গৃহের পরিবেশ সম্বন্ধে প্রশ্ন আসতে পারে। বিদ্যালয়ে অনেক পরিশ্রম করে শিশুদের শৃঙ্খলাবোধের অভিজ্ঞতা দেওয়ার চেষ্টা হয়তো করা গেল। কিন্তু বাড়ীতে কি পরিবেশের মধ্যে তারা দিন কাটায়? সেখানকার অবস্থা কি? আর এই অবস্থার দরুণ স্কুলের সকল পরিশ্রম পণ্ডশ্রম হবে না তো? একথা অবশ্য খুবই সত্যি যে গৃহের পরিবেশ আশাপ্রদ হলে স্কুলের কাজ অনেক সহজ হত। কিন্তু যে বাস্তব অবস্থার মধ্যে একজন শিক্ষককে নূতন শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন করতে হচ্ছে তা আশানুরূপ না হলেও স্কুলের দিক থেকে যা করণীয় তা অবশ্যই করতে হবে। এতে কাজ হয়তো দ্রুতগতিতে এগুবে না—কিন্তু এরও যে প্রভাব নেই একথা বলা যায় না। তাছাড়া প্রয়োজনবোধে স্কুলের দিক থেকে অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা সব সময়ই করা যেতে পারে।

শিক্ষার্থিদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগিয়ে তুলতে হলে কতগুলো গঠনমূলক কাজেও তাদের আগ্রহান্বিত করার চেষ্টা করা উচিত। এবং এইজন্য প্রয়োজন অবসর সময়ে তারা কি করে সে সম্বন্ধে খোঁজ-খবর রাখা। অবসর সময়ে যদি শিক্ষার্থিরা সৃজনমূলক কাজে ব্যাপৃত না

থাকে তাহলে তাদের পক্ষে অবাঞ্ছিত ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। সিনেমাহল, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি স্থানে আড্ডা জমানর হিড়িক আজকাল খুবই বেশী এবং সেখানে যে সব জ্ঞানগর্ভ বিষয় নিয়ে গবেষণা জমে উঠে তাতে পিতামাতা, শিক্ষক থেকে আরম্ভ করে চিত্রতারকাদের জীবনী সবই এসে পড়ে। অবশ্য এই সংক্রমণ থেকে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা কেবলমাত্র উচ্চ বুনিয়াদী স্তরেই হতে পারে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থিরা যদি কৃষিকাজ অথবা বাগানের কাজ করে তাহলে এই কাজগুলো যাতে তারা অবসর সময়ে বাড়ীতে করবার জন্যও আগ্রহান্বিত হয় সেদিক থেকে বিদ্যালয় যত্নবান হতে পারে। এছাড়া হাউস সিষ্টেম, এ. সি. সি., বয় স্কাউটস্, মণিমেলা ইত্যাদি সংগঠনমূলক কাজগুলোও শিক্ষার্থিদের সুশৃঙ্খল এবং নিয়মানুগত করে তুলতে সাহায্য করে। আসল কথা হচ্ছে এই যে কর্ম্মহীন নিরবলম্ব অবস্থার মধ্যে শিক্ষার্থিদের "সুশীল সুবোধ" করে তোলা যেতে পারে না। শৃঙ্খলা তারা শিখবে না— আয়ত্ত করবে অভ্যাসের দ্বারা, কাজের মধ্য দিয়ে। এদিক থেকে প্রয়োজন কর্ম্মসংগঠন। এবং এই কর্ম্মসংগঠনের সুযোগ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এমন আছে যা থেকে শিশুদের সংযত ও শৃঙ্খলাপ্রয়াসী করে তোলা যায়। আর তাছাড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা শিক্ষার্থিদের প্রতি ব্যক্তিগত-ভাবে লক্ষ্য রাখেন বলে পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয় যার ফলে উচ্ছৃঙ্খলতা দূর হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে উচ্ছৃঙ্খলতার সমস্যাটি বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ের সীমানা অতিক্রম করে বৃহত্তর সামাজিক সমস্যাবলীর সঙ্গে মিশে গেছে। আমাদের শিক্ষার্থীসম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যক্তিগত উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে দলীয় উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকোপই বেশী। এবং এর বিষাক্ত মূল কোথায় সমাজের দিকে চাইলেই তা বোঝা যায়। আমাদের দেশের বিগত পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে অবশ্য এর

ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। আসল সমস্যা হচ্ছে এই যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্ঘাত, ভয়াবহ আদর্শভ্রষ্টতা, সামাজিক নিষ্ঠাহীনতা ইত্যাদির ফলে বাইরের আবহাওয়া এমন বিরোধক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে যে কেবলমাত্র স্কুল থেকে এই বহুদূর সংক্রামিত সমস্যার সমাধান বের করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন অভিভাবকদের, সমাজপতিদের—যাঁদের সহযোগিতায় ভিতর ও বাইরে থেকে সম্মিলিত অভিযান করে এই মারাত্মক সামাজিক ব্যাধিকে নির্ম্মূল করা যায়।

কোন কোন অতিউৎসাহী অভিভাবককে বলতে শুনেছি—"আপনারা তো, মশাই, স্কুল থেকে মারধর তুলে দিয়েছেন—এতে আর কি লেখাপড়া হবে? আপনাদের কথা শুনবে এই সব হতচ্ছাড়ার দল? দুদিন বাদে দেখবেন আপনাদেব পিঠে বসে তাল ঠুকবে—তখন কি করবেন? বেত রাখুন, মশাই, বেত। বেত না হলে আর এই সব ডানপিটেদের মানুষ করা চলে? এই তো আমাদের ছোটবেলায় অমুক মাষ্টারকে দেখতাম—সতেজ একখানা জিনিস—" ইত্যাদি। শিশুদের কতটুকু শাস্তি দেওয়া উচিত? কোন্ ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে হবে? কি হবে তার ধরণ? দৈহিক শাস্তি কি বাঞ্ছনীয়?

বর্ত্তমান শতাব্দীকে শিশু-শতাব্দী বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।
> ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি,
> নন্দনের এনেছে সংবাদ,
> ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।"

ইংরেজী সাহিত্যে গল্প আছে শিশুদের খেলা করতে দেয় নি বলে স্বার্থপর দানবের প্রাচীরবেষ্টিত পুষ্পকাননে নাকি ঋতুরাজের আবির্ভাব হয় নি। তারপর যখন দানবের চোখ ফুটল—দানবের ভূমিকা

পরিত্যাগ করে সে "দাতুর" ভূমিকায় অবতীর্ণ হল, তখন কেবলমাত্র পুষ্পসৌরভ ও বিহঙ্গকাকলীতেই তার কানন মুখরিত হয়ে উঠল না, পরম পরিত্রাতা নিজে এসে তাকে নিয়ে গেলেন তাঁর নিজের প্রেমের অমরাবতীতে—স্বর্গের নন্দনকাননে। যে মমতামেদুর অন্তর্দৃষ্টির ফলে কবি-সাহিত্যিকের পক্ষে শিশুদেবতার এরূপ বন্দনাগান সম্ভব হয়েছে, সেই একই দৃষ্টিভঙ্গী শাস্তির কণ্টকারণ্য থেকে উদ্ধার করে স্বস্তির আনন্দলোকে শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে যুগপ্রবর্ত্তক এক একজন শিক্ষাব্রতীকে অনুপ্রাণিত করেছে। মাদাম মন্তেসরী এই প্রসঙ্গে তাঁর গবেষণাপ্রসূত অভিজ্ঞতা থেকে যে কথা বলেছেন তা একদিকে যেমন মর্ম্মস্পর্শী অন্যদিকে তেমনি জ্ঞানগর্ভ—If we follow the course of history we shall find no salient fact revealing a recognition of the rights of the child, or an intuitive awareness of his importance.. Christ alone called them to Him pointing them out to adult man as his guides to the Kingdom of Heaven, and warning him of his blindness. But the adult continued to think only of converting the child, putting himself before him as example of perfection..... ......

শাস্তিদান

Investigations carried out on the punishments in use in families show that even in our own time there is no country great or small in the world where children are not punished in their families. They are violently scolded, abused, beaten, slapped, kicked, driven out of sight, shut up in dark frighten-

ing rooms, threatened with fantastic perils or deprived of the little reliefs which are their refuge in their perpetual slavery or the solace of torments unconsciously endured, such as playing with their friends or eating sweets or fruit.

এ আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় বিদ্যালয়ে বেতের স্থান নেই। তবে এ হল একেবারে গোড়ার কথা। অবস্থাভেদে এই আদর্শের সঙ্গে আপোষের সীমা কতটুকু হবে সেই হচ্ছে প্রশ্ন।

আগের দিনে বিদ্যালয়ে সুশাসন রক্ষার জন্য শাস্তিই প্রধান উপায় বলে বিবেচিত হত। বর্ত্তমানে নীতি হচ্ছে যতদূর সম্ভব কম শাস্তিবিধান করে শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে "শাস্তির দ্বারা কণ্টকিত করিয়া" স্কুল চালান ব্যর্থপ্রয়াসের পরিচায়ক মাত্র। সহজেই বোঝা যায় যে অতিমাত্রায় পদে পদে ব্যবহারের ফলে ক্ষমতার অপব্যবহারের সম্ভাবনাই অধিক এবং তার মধ্যে দুর্ব্বলশাসনের বিফলতাই প্রকাশ পায়। বিশেষজ্ঞদের মতে শাস্তি চার রকমের হতে পারে—

১। সংশোধক শাস্তি (Corrective or Reformative)
২। নিবারক শাস্তি (Deterrent or Exemplary)
৩। ক্ষতিপূরক শাস্তি (Retributive)
৪। আইন প্রতিষ্ঠাসূচক শাস্তি (Disciplinary)

আমাদের মনে রাখতে হবে স্কুলে শাস্তিদানের প্রধান উদ্দেশ্য হল সংশোধন করা—শিক্ষার্থীকে অপাংক্তেয় করে রাখা নয়। অপরাধ করে কোন শিশু যাতে নিজের অপরাধ বুঝতে পারে, অপরাধের ঘটনা যাতে পুনরায় না হয়—সেদিকে লক্ষ্য রেখেই শাস্তিবিধান করা বিধেয়। নিবারক শাস্তি একটু গুরুতর রকমের। সেটা এমন হবে যে

তার নমুনা দেখে অন্য সকলে অনুরূপ অপরাধ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়। কঠোর দৈহিক শাস্তি, গুরুতর জরিমানা, বহিষ্কার ইত্যাদি হচ্ছে নিবারক শাস্তির দৃষ্টান্ত। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে—যেখানে আটটি মাত্র ক্লাশ এবং শিক্ষার্থিগণ অধিকাংশই অপ্রাপ্তবয়স্ক—সেখানে এই ধরণের শাস্তিবিধানের প্রয়োজনীয়তা কদাচিৎ হতে পারে। কোন শিক্ষার্থীর অপরাধের ফলে স্কুল অথবা অন্য কোন শিক্ষার্থীর যদি কিছু ক্ষতি হয় তাহলে সেই ক্ষতিপূরণের জন্য অপরাধীকে যে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে তাই হচ্ছে ক্ষতিপূরক শাস্তি। এই শাস্তির ফলে অপরাধীকে স্বীয় অপরাধের তাল সামলাতে হয়। এই শাস্তির প্রতিক্রিয়া প্রধানতঃ আর্থিক এবং শাস্তির বোঝা ফলতঃ শিক্ষার্থীর উপর না পড়ে তার অভিভাবকের উপরেই পড়ে। দৈন্যলাঞ্ছিত আমাদের দেশে এই ধরণের শাস্তির ফলদায়কতা কতটুকু তা ভেবে দেখলেই বোঝা যায়। আবার স্কুলের কোন আইন অথবা প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ভঙ্গ করার জন্যও শাস্তিবিধান করা যেতে পারে। এই নিয়মভঙ্গজনিত অপরাধের ফলে কারো কোন ক্ষতি হয় না—ক্ষতি হয় একমাত্র শিক্ষার্থীর। আর নিয়মভঙ্গের কোন প্রতিকার না হলে অন্য শিক্ষার্থিদের সামনে অসৎ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতে পারে। তবে এই শাস্তি সর্ব্বদাই সংশোধক শাস্তি হওয়া উচিত। আসল কথা হচ্ছে বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, তাঁর প্রভাব বিস্তার করবার ক্ষমতা, শিক্ষার্থিদের কর্ম্মে নিযুক্তি, খেলাধূলার সুবন্দোবস্ত ইত্যাদি। এগুলো থাকলে স্কুলে অপরাধের প্রাদুর্ভাব এমনিতেই কমে যায়। রুশো তাঁর Theory of Natural Consequencesএ শাস্তিবিধান সম্পর্কে যে মতবাদ প্রচার করেছেন তাতেও লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে সংশোধক শাস্তির উপরই জোর বেশী। বেন্থাম অবশ্য তাঁর Canons of Punishmentএ শাস্তিবিধানের অনেক বিস্তৃততর নীতি নির্দ্ধারিত করেছেন। তার মধ্যে স্কুলের দিক থেকে

যেগুলো বিশেষ প্রয়োজনীয় সেগুলো আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শাস্তিবিধান যখন একান্তই প্রয়োজন হবে তখন এ ধরণের শাস্তি দেওয়া যেতে পারে—স্কুলের পর আটক রাখা, কাজ অবহেলার জন্য শাস্তিমূলক বেশী কাজ দেওয়া, অন্যের ক্ষতি করলে নিজের ত্যাগস্বীকার করা, একাকী ডেকে ভর্ৎসনা করা, খেলায় যোগদান করতে না দেওয়া ইত্যাদি। যে সব ক্ষেত্রে ব্যাধি কতকটা দুরারোগ্য বলে মনে হয় সেখানে অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা একান্ত প্রয়োজন এবং অভিভাবক কি ধরণের শাস্তি দেবেন সে সম্বন্ধেও তাঁকে কিছু বলা প্রয়োজন—তা না হলে হিতে বিপরীত হতে পারে, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গন্ধমাদন নেমে আসে। অনেক সময় চিঠি পাঠাবার দেরীর ফলে সক্রিয় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য বিদ্যালয়ে একেবারে ছাপান একরকম চিঠিই রেখে দেওয়া যেতে পারে। এই ছাপান পত্রগুলোতে অনেকগুলো সম্ভাব্য ত্রুটি, শৈথিল্য, কদাচার এবং অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ থাকতে পারে। যার ক্ষেত্রে যখন যেটা প্রযোজ্য হবে সেটায় দাগ দিয়ে অভিভাবকদের কাছে পত্রটি পাঠান যেতে পারে। এতে দ্রুত কাজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

চিঠির সম্ভাব্য নমুনা এরূপ হতে পারে—

বিদ্যালয়ের নাম —

স্থানের নাম

তারিখ সাল

(অভিভাবকের নাম) শ্রী/শ্রীমতী

ঠিকানা —

মহাশয়/মহাশয়া,

আপনার পুত্র/কন্যা/পোষ্য শ্রী/শ্রীমতী..................বর্ত্তমানে আমাদের বিদ্যালয়ে..................শ্রেণীতে পড়ছে। তার সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আপনার সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন হয়েছে। বিশেষভাবে যে বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন তাহা নীচে চিহ্নিত হল। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্য্যালয়ে............টা থেকে............টার মধ্যে শনিবার ব্যতীত যে কোন দিন এলে বিশেষ বাধিত হব।

ভবদীয়

প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা

বিদ্যালয়ের নাম ....

আলোচনার বিষয়বস্তু

আপনার পুত্র/কন্যা/পোষ্য শ্রী/শ্রীমতী ....

১। নিয়মিত স্কুলে আসে না।

২। সে স্কুলে দেরী করে আসে এবং বাড়ীর প্রয়োজনে এরূপ করতে হয় বলে অনেক সময় কৈফিয়ৎ দেয়।

৩। অনেক সময়ই বাড়ীর কথা বলে সে স্কুল থেকে ছুটি নিতে চায়।

৪। প্রায়ই না খেয়ে আসে বলে সে ঠিকমত লেখাপড়ার কাজে মন দিতে পারে না এবং বিরতির সময় তাকে বাড়ী যেতে হয়।

৫। অনেক সময় কাউকে কিছু না বলে সে স্কুল থেকে চলে যায়। সেই সময়টা কোথায় কাটায় তার অনুসন্ধান করা দরকার।

৬। কোনরূপ সংবাদ না দিয়ে বর্ত্তমানে সে দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত আছে।

৭। সে বাড়ীতে ঠিকমত লেখাপড়া করে বলে মনে হয় না।

৮। সে ঠিকমত বাড়ীর কাজ (home task) করে নিয়ে স্কুলে আসে না।

৯। প্রয়োজনমত বই খাতাপত্রের অভাবে সে লেখাপড়ার কাজে পিছিয়ে পড়ছে।

১০। বাড়ীর কাজে তাকে অনেক সময় দিতে হয় বলে সে নাকি ঠিকমত লেখাপড়া করতে পারে না।

১১। খেলার মাঠে সে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে এবং এই সময় তাকে বাড়ীর কাজ করতে হয় বলে জবাব দেয়।

১২। তার ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা আশানুরূপ নয়।

১৩। তার চোখ/কান/দাঁতের দোষ আছে যার চিকিৎসা দরকার।

১৪। সে বেশ কিছুদিন থেকে সর্দ্দিকাশিতে ভুগছে যার জন্য নিয়মিত চিকিৎসার প্রয়োজন।

১৫। বই খাতাপত্র ইত্যাদিও সে পরিচ্ছন্নভাবে রাখে না। বাড়ী থেকেও এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার।

১৬। তার কোন দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্য আছে যার ফলে সে নিরুৎসাহ ও আগ্রহহীন।

১৭। তার মধ্যে মানসিক প্রফুল্লতার অভাব আছে। পারিবারিক অবস্থার মধ্যে এর সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে।

১৮। বাড়ীর নিষেধের জন্য সে টিকা নিতে চায় না।

১৯। অন্য ছেলেমেয়েদের জিনিসপত্র না বলে তুলে নেওয়ার অভ্যাস তার আছে যে সম্বন্ধে প্রতিকারের জন্য বাড়ীতেও সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

২০। তার সিনেমা সম্বন্ধে অত্যধিক গল্প করা দেখে মনে হয় সে খুব বেশী সিনেমা দেখে।

২১। অবসর সময়ে সে অবাঞ্ছিত ক্রিয়াকর্ম্মে ও আড্ডায় সময় কাটায় বলে রিপোর্ট আসছে যার প্রতিকার দরকার।

২২। বিশেষ কোন কারণে তাকে একটু নিবারক রকমের শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে যার জন্য আলোচনা করে নিলে ভাল হয়।

২৩। সাধারণ ছেলেমেয়েদের তুলনায় সে অল্পবুদ্ধি ও অনগ্রসর যার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

২৪। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতগুলো বিশেষ গুণাবলী ও সামর্থ্য আছে গৃহের পরিবেশ থেকেও যেগুলোকে উৎসাহিত করা দরকার।

২৫। বিদ্যালয়ে দেয় প্রাসঙ্গিক ফী ইত্যাদি সে নিয়মিত দেয় না।

এই ধরণের একটি ছাপান চিঠিতে বিশেষ বিশেষ আলোচনার বিষয়বস্তুগুলোকে চিহ্নিত করে অভিভাবকদের সংবাদ দেওয়া চলে। এই ধরণের চিঠি পেলে অভিভাবকরা যে কেবল আগ্রহান্বিতই হবেন তা নয়—আধুনিক শিক্ষার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধেও তাঁরা কিঞ্চিৎ অবহিত হবেন এবং আশা করা যায় শিশুর মঙ্গলের জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে যত্নশীল হবেন। এখানে সম্ভাব্য ২৫টি কারণ দেওয়া হল যার জন্য অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগের দরকার হতে পারে। এর বাইবে কিছু এলে সেগুলো হাতে লিখে দেওয়া যায়। বুনিয়াদী শিক্ষার সফল পরিণতির জন্য অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যে কতটা দরকারী বুনিয়াদী শিক্ষাকর্ম্মিদের আর তা নূতন করে বলার প্রয়োজন নেই এবং এই সুযোগ বিদ্যালয়েব দিক থেকে যত বেশী সৃষ্টি করা যায় ততই ভাল।

শাস্তিবিধানের মত পুরস্কার প্রদানের প্রসঙ্গও আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি। আগের দিনে পরীক্ষায় যারা উচ্চস্থান অধিকার করত কেবলমাত্র তাদেরই পুরস্কৃত করার রেওয়াজ ছিল। অনেক সময় যাদের বাৎসরিক উপস্থিতির সংখ্যা বেশী অথবা নৈতিক

চরিত্র ভাল তাদেরও পুরস্কার দেওয়া হত। ব্যাপারটি যে হাস্যকর একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়। শাস্তির 'ভয়' দেখিয়ে ছেলে-মেয়েদের সৎপথে রাখবার চেষ্টার মধ্যে যেমন একটি নেতিবাচক দিক আছে, ঠিক তেমনি পুরস্কারের 'ঘুষ' দেখিয়ে তাদের প্রেরণা দেবার মধ্যেও অনুরূপ নেতিবাচক ইঙ্গিত আছে। যে-কোন কাজের সফল সমাপ্তির জন্য আন্তরিক একাগ্র প্রচেষ্টাই হল একটি লোকের মূল্য যাচাইয়ের প্রকৃত মানদণ্ড—কাজের ফলটা নয়। কাজেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে পুরস্কার দিয়ে ছাত্রসমাজের বিরাট অংশকে অবহেলা করার মধ্যে কোন যুক্তি নেই। অনেক সময় উল্টো ফল হয় এই যে যাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ থাকে তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ, হিংসা, ক্ষতি করার চেষ্টা ইত্যাদি অশুভ প্রবৃত্তিগুলো জাগ্রত হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে মাদাম মন্তেসরী যে অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন এখানে তার উল্লেখ করা যেতে পারে—"One day on coming into the school I saw a child sitting in a little armchair in the middle of the room, all by himself, doing nothing; on his chest he wore the pompous decoration that the teacher had prepared as a reward of good behaviour. The teacher told me that this child was being punished. But a moment earlier she had rewarded another child, pinning the decoration on him. And this child passing beside the culprit, had passed the decoration on to him, as though it were something useless and in the way of anyone who wanted to work. The culprit looked

পুরস্কার

at the decoration with indifference and then looked tranquilly about him, evidently without feeling his punishment. This was enough to show the vanity of rewards and punishments, but *we wished to observe the children for a longer period, and after a vast number of experiments we found the fact so constantly repeated that the teacher ended by feeling almost ashamed both of rewarding and of punishing those children who set no store by either reward or punishment. After that we abolished rewards and punishments........*"

১৯৫১ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শিল্পকাজ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে UNESCO থেকে যে বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে তাতেও এই মতামত ব্যক্ত হয়েছে যে স্কুলে কোন কাজের জন্য বিশেষভাবে পুরস্কার দেবার রীতিটি বাঞ্ছনীয় নয়—শিক্ষার্থিদের কাজে অংশগ্রহণ করাটাই সব চেয়ে বড় কথা। পুরস্কার যদি দিতে হয় তাহলে বস্তু পুরস্কারের পরিবর্তে বিশেষ কোন অনুমোদন, প্রশংসা, সম্মানের স্থান অথবা সম্মানের তালিকার মাধ্যমে শিক্ষার্থিদের পুরস্কার দেওয়া যেতে পারে। আর পুরস্কার দেবার আগে বিশেষ কোন যোগ্যতার পরিবর্তে শিক্ষার্থিদের সামগ্রিক গুণাবলী বিবেচনা করে দেখা দরকার।

সমাজজীবনের সঙ্গে সংযোগ সাধন

আধুনিক শিক্ষানীতি বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজজীবনের সংযোগ-সাধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। একটি বিদ্যালয়ের আশা-আদর্শ, ধ্যান-ধারণা কেবলমাত্র তার সীমাবদ্ধ দেয়ালের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না; কারণ বৃহত্তর সমাজের আশা-আদর্শই একটি বিদ্যালয়ে আগামী দিনের বংশধরদের কেন্দ্র করে

প্রতিফলিত হয়। একটি পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে সঙ্ঘাতের কোন সম্ভাবনা থাকে না—বরঞ্চ একটি আর একটির পরিপূরক হয়ে জীবনকে সামগ্রিকভাবে উন্নত করার চেষ্টা করে। বিশেষ করে বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রসঙ্গে এই সংযোগ-সাধনের গুরুত্ব আরও বেশী। দেশে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রসারের কাজ সর্ব্বোচ্চ স্তরে গৃহীত হলেও নূতন জিনিস বলে সাধারণ লোকের মন থেকে এই শিক্ষা সম্বন্ধে সংশয় ও আশঙ্কা এখনও সম্পূর্ণভাবে দূর হয় নি। প্রত্যেক বুনিয়াদী শিক্ষাকর্ম্মীই জানেন বিশেষভাবে শিল্প-কাজ সম্বন্ধে সাধারণ অভিভাবকের প্রতিক্রিয়া কি রকমের হয়। কাজেই বুনিয়াদী শিক্ষার এই প্রস্তুতিমূলক পর্ব্বে—যখন সন্দেহ খুব প্রখর ও সমালোচনা মুখর—বিশেষ করে এই সময়ে প্রত্যেক বুনিয়াদী শিক্ষাকর্ম্মীর বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলা উচিত। এতে কাজ এবং দায়িত্ব দুটোই বাড়বে সন্দেহ নেই কিন্তু এই কাজকে রুটিনবাঁধা কাজের অন্তর্গত বলে মনে করতে হবে।

আর কেবলমাত্র বুনিয়াদী শিক্ষা নয়—সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযোজ্য। জন ডিউই বিদ্যালয়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—"The school is—or rather should be—an 'idealised epitome' of social life, reflecting within it the elements of all the worthful major activities that make up the work of society." কি করে তা করা যেতে পারে সেটি ব্যাখ্যা করে তিনি আবার বলেছেন—"To do this means to make each one of our schools an embryonic community, active and with types of education that reflect the longer type of society, and permeated throughout with the spirit of art, history and science. When the school introduces and

trains each child of society into membership within such a little community, saturating him with the spirit of service and providing him with the instruments of effective self-direction, we shall have the deepest and best guarantee of a longer society which is worthy, lovely and harmonious." বিদ্যালয়ে এই আদর্শকে মূর্ত্ত করার একমাত্র পূর্ব্বসর্ত্ত হল, সমাজকে জানা, তার. গভীরে প্রবেশ করা; সমাজ ও বিদ্যালযের নিবিড় সম্পর্ক থেকেই কেবল ইহা সম্ভব হতে পারে।

সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে আদর্শ সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে তিনটি মতবাদের উদ্ভব হতে পারে—

১। বিদ্যালয়—সমাজ মিলনের প্রাণকেন্দ্র,
২। বিদ্যালয়—সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি আত্মকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান,
৩। বিদ্যালয়—সামাজিক নেতৃত্বগ্রহণের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য একটি শিক্ষণালয়।

বিদ্যালয়কে সমাজমিলনের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে হলে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব অনেকদিক থেকে ব্যাপকতর হবে। সাধারণ লেখাপড়ার কাজ ছাড়া অন্যান্য সমাজকল্যাণমূলক কাজও এখানে প্রবেশ করবে—যেমন নৈশ বিদ্যালয়, ডাক্তারখানা, পাঠাগার, প্রাপ্তবয়স্কদের মিলনকেন্দ্র—ইত্যাদি কর্ম্মানুসরণের বন্দোবস্ত ও বিদ্যালয়ে রাখতে হবে। এক কথায় বিদ্যালয় হবে একটি "community club house". সীমাবদ্ধ সময়, শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে শিক্ষকদের পক্ষে এহেন গুরুদায়িত্ব পালন করা দিনের পর দিন সম্ভবপর কি না তা ভেবে দেখা দরকার। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ছাড়া অন্যান্য বহুমুখী সমাজকল্যাণমূলক কাজগুলোও যদি খাঁটিভাবে শিক্ষকদের করতে হয়,

তাহলে বলা বাহুল্য ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবনের অনেক কিছুই বিস্মৃত হয়ে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ তপস্বীর সেবাব্রত তাঁদের গ্রহণ করতে হবে। কাজেই এহেন নীতি বাস্তবক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হবে কি না—সে সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা চলে। অবশ্য শিক্ষকতার মধ্যে সমাজসেবার মর্ম্মবাণী অন্তর্নিহিত রয়েছে সন্দেহ নেই—কিন্তু তার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। আবার সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে একটি আত্মকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্কুলকে গড়ে তোলাব নীতিও বাস্তব ক্ষেত্রে গ্রহণ করা চলে না। স্কুলেব ভিতরে লেখাপড়া খেলাধূলো করিয়ে বছরের পব বছর প্রমোশান দিয়ে তারপর একদিন শিক্ষার্থিদেব স্কুল থেকে বিদায় করে দিলেই স্কুলের আসল কাজ সমাধা হল—এর বাইরে শিক্ষকদের কিছু করবার নেই—আধুনিক শিক্ষানীতিব আলোকে এ মতবাদও গ্রহণযোগ্য নয়। এই নীতি অনুসরণ কবে চললে কোন বিদ্যালয় পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কাজেই এই দুই বিপরীতমুখী মতবাদ পরিত্যাগ করে আমরা মধ্যপন্থা হিসাবে তৃতীয় মতটিকে গ্রহণ কবতে পারি। তার মানে হচ্ছে এই যে বিদ্যালয় পুরোপুরি একটি 'community club house'ও হবে না অথবা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মকেন্দ্রিক কোন প্রতিষ্ঠানও হবে না। সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য ভাবী নাগরিকদের সর্ব্বতোমুখী প্রস্তুতি সাধন করাই হবে বিদ্যালয়েব প্রধান কর্ত্তব্য। এই প্রস্তুতির জন্য বিদ্যালয়কে যেমন একদিকে জ্ঞানসাধনার অনুশীলনকেন্দ্র হতে হবে অন্যদিকে তেমনি সামাজিক চেতনার বিকাশক্ষেত্রও হতে হবে। এই শেষোক্ত চেতনার সফল উন্মেষক্ষেত্র হিসাবে বিদ্যালয়ের পক্ষে সমাজেব সঙ্গে যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কেবলমাত্র সেই অর্থেই বিদ্যালয়কে সমাজমিলনকেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত করা বিধেয়। তা না হলে বহুমুখী কর্ম্মসংগঠনের চাপে বিদ্যালয়ের পক্ষে আপনার মূল কর্ম্মধারা থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সমাজজীবনের সঙ্গে সংযোগ সাধনের সুযোগ একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রধানতঃ তিনভাবে পেতে পারে—

১। গ্রাম পরিক্রমা ও সমাজসেবামূলক কার্য্যাবলী
২। অভিভাবক-শিক্ষক সম্মেলন
৩। শিল্পকাজ

গ্রাম পরিক্রমা—বুনিয়াদী শিক্ষানীতি আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে বুনিয়াদী শিক্ষাব প্রধান তিনটি ভিত্তিভূমি হচ্ছে—(১) শিল্প, (২) প্রাকৃতিক পরিবেশ ও (৩) সামাজিক পরিবেশ। প্রথম অবস্থায় কেবলমাত্র শিল্পকেই শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করার নীতি স্থির হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষ কাজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছিল যে একমাত্র শিল্পের দ্বারা শিক্ষার মূল বিষয়বস্তুকে যথাযথভাবে পরিবৃত করা চলে না। তাই ১৯৩৯ সালে পুনায় অনুষ্ঠিত প্রথম বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে শিল্পের সঙ্গে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকেও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। কাজেই গ্রাম অথবা পরিবেশ পরিক্রমার কথা বুনিয়াদী শিক্ষাকর্ম্মীর কাছে নূতন কিছু নয়। যদিও এখানে সমাজজীবনের সঙ্গে সংযোগসাধন প্রসঙ্গেই আমরা গ্রাম পরিক্রমার কথা উল্লেখ করেছি, তবু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে শিক্ষার প্রতিষ্ঠাভূমি হিসাবে এই পরিক্রমা বা পরিচিতির উপর নূতন শিক্ষানীতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। শিক্ষার্থিদের মধ্যে সামাজিক চেতনা বিকাশের জন্য—তাদেব ভাবীকালের আদর্শ নাগরিক করে গড়ে তোলার জন্য এই গ্রাম পরিক্রমা অথবা পরিবেশ পরিচিতির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

এই পরিবেশ পরিচিতির কাজ পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় বর্ণিত বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে সম্পাদিত হতে পারে।

১। পরিবেশের প্রাকৃতিক বিবরণী
২। পরিবেশের ঐতিহাসিক বিবরণী
৩। জনসংখ্যা ও সম্প্রদায়
৪। সমাজের অর্থনৈতিক বিবরণী
৫। প্রধান পেশা ও রোজগারের উপায়
৬। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যাদি ও বৈষয়িক আদানপ্রদান
৭। রাস্তাঘাট ও যানবাহন
৮। জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসালয়
৯। শিক্ষা ও সংস্কৃতি
১০। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি ও আনন্দ বিনোদন

জীবনকেন্দ্রিক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উপরিলিখিত বিষয়সম্বলিত পরিবেশ পরিক্রমা যে শিক্ষার একটি প্রধান বাহন হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই পরিক্রমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে স্ফুটনোন্মুখ শৈশবের প্রথম দিনগুলি থেকেই শিশুরা বুঝতে শেখে বৈষয়িক জীবনে সমাজ আমাদের কতদিক দিয়ে পিছিয়ে আছে, আর উন্নতির জন্য কোন্ কোন্ দিকে নজর দেওয়া দরকার। শিক্ষকদের সক্রিয় পরিচালনায় এই পরিক্রমার কাজ চলতে পারে। তবে পর্য্যবেক্ষণের কাজ বিভিন্ন শ্রেণীভেদে প্রয়োজনমত হবে একথা বলাই বাহুল্য। এই পরিক্রমার কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে সমাজজীবনের সঙ্গে যোগসাধনের যে সুযোগ পাওয়া যায় বিদ্যালয়ের দিক থেকে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অভিভাবক-শিক্ষক সম্মেলন—বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক নিকটতর করবার আর একটি প্রধান উপায় হল—অভিভাবক-শিক্ষক সম্মেলন। স্কুল চালাতে হলে অনেক ব্যাপারেই যে অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় সেকথা আমরা আগেই বলেছি। আমাদের দেশে একটা বিশেষ অপ্রিয় সত্য হচ্ছে

এই যে অধিকাংশ অভিভাবকই ছেলেপুলেদের স্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে একেবাবে মুক্ত হয়ে যান বলে মনে কবেন। স্কুলেব সঙ্গে যোগাযোগ বক্ষার প্রয়োজনীয়তা আর তাঁবা বিশেষ বোধ করেন না। বছবে একবাব হয়তো এঁদেব স্কুলে দেখা যায়—যেদিন পবীক্ষাব ফল বেবোয়। এই যাওযাও অনেকক্ষেত্রে পুত্রকন্যাব পবীক্ষায় অকৃতকার্য্যতাব ফলে হয়। কিন্তু দেশেব বাস্তব অবস্থাব দিকে তাকালেই বোঝা যায় আমাদেব এই অভিযোগ অর্থহীন ও নিষ্ফল—অভিযোগ প্রত্যাহত হয়ে নিজেদেব গাযে এসেই লাগবে। কাদেব বিরুদ্ধে অভিযোগ? কাজেই এগিয়ে যেতে হবে স্কুলকে—শিক্ষকদেব। কারণ তা না হলে—ববীন্দ্রনাথেব ভাষায় বলতে গেলে—'এ নিশীথ মাঝে তুমি ঘুমাইলে ফিবিয়া যাইবে তাবা'।

এই অভিভাবক-শিক্ষক সম্মেলনেব সাংগঠনিক দিক থেকে আমবা পাঁচটি পর্য্যায়েব উল্লেখ কবতে পাবি।

১। পবিবেশেব প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকে এই সম্মেলনেব জন্য আগ্রহান্বিত কবে তোলা। পাবিপার্শ্বিক কোন বিরুদ্ধ শক্তিব সঙ্গে লড়াই কবে এই সমিতি গঠন করা চলে না। কাজেই অভিভাবকদেব আগ্রহান্বিত কবাব প্রস্তুতিমূলক পর্য্যাযে খুব নিরপেক্ষভাবে অগ্রসব হওয়া ভাল।

২। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ অথবা স্বায়ত্তশাসনমূলক কোন আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পবিবেশ সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করা। এই তথ্যসংগ্রহেব ফলে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ পবিবেশের সমস্যাবলী সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হতে পাববেন যাতে পবে কাজের সুবিধা হবে।

৩। প্রথম অধিবেশনেব জন্য সযত্ন পরিকল্পনা। প্রথম সম্মেলনেব উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া দবকার।

৪। শিক্ষার্থিগণকে এই কাজকর্ম্মে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দান। বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থিরা এই অনুষ্ঠানের জন্য আগ্রহান্বিত হয়, তারা এই পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করে এবং অভিভাবকদের নিজেদের স্কুল ও কাজকর্ম্ম দেখাতে উৎসাহ বোধ করে।

৫। অভিভাবক-শিক্ষক দিবসে শিক্ষার্থিদেব নেতৃত্ব গ্রহণের সুযোগদান। সাংস্কৃতিক উৎসব-অনুষ্ঠানাদি, প্রদর্শনী, খেলাধূলা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থিগণ যাতে নেতৃত্ব গ্রহণ করে ও পরিচালনার সুযোগ পায় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। নইলে শিবহীন যজ্ঞের মত বিষয়টি প্রাণহীন হবে।

বলা বাহুল্য শিক্ষক-অভিভাবক মিলনদিনে বিদ্যালয়ের তরফ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির বন্দোবস্ত কবতে হয়। এই সব অনুষ্ঠান অথবা প্রদর্শনী কিংবা অন্য কোন সমাবেশমূলক ক্রিয়াকর্ম্মে শিক্ষার্থিদের নেতৃত্ব গ্রহণেব যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া দরকার। পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন ও বহিরাগত অতিথিদের সমস্ত বিদ্যালয়টি দেখান—কোথায় কি হয় তার সঙ্গে পরিচিত করা, নিজেদের কাজের ধারণা দেওয়া—এই সমস্ত কাজগুলো শিক্ষার্থিদের উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। বছরে অন্ততঃ একবার এই 'অভিভাবক-শিক্ষক দিবস' প্রতিপালিত হওয়া দরকার।

শিল্পকাজ—সমাজজীবনের সঙ্গে যোগাযোগের আর একটি প্রধান উপায় হচ্ছে শিল্পকাজ। বুনিয়াদী শিক্ষানীতিতে স্পষ্টই এই কথা বলে দেওয়া হয়েছে যে শিল্প নির্ব্বাচনের আগে পরিবেশের ঐতিহ্য ও প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। দ্বিতীয়তঃ বিদ্যালয়ে যে শিল্প গৃহীত হল সেই শিল্পকাজ বাইরের সমাজে যাদের জীবিকার সংস্থান করছে শিশুদের পক্ষে তাদের জীবনকাহিনী—তাদের আশা-আনন্দ, অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-দারিদ্র্য—ইত্যাদিও জানা বিশেষ

প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ প্রত্যক্ষভাবে শিল্পকাজ করতে গিয়ে আপন অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষার্থিদের বোঝবার সম্ভাবনা থাকে উৎপাদনমূলক শিল্পকর্ম্ম ও নিরঙ্কুশ সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে যোগসূত্রটি কোথায়। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি যে সমাজজীবনকে ধারণ করে আছে কতগুলো বিভিন্ন উৎপাদনাত্মক কর্ম্ম যেগুলো না থাকলে সমাজজীবনেব গতিবেগ স্তব্ধ হয়ে যেত। দুর্ভাগ্যের কথা হচ্ছে এই যে আমাদের দেশে এমন অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি আছেন যাঁরা জানেন না আমাদের কৃষকরা বছরের কোন্ সময় কি কাজ করে—বারটি মাসের কোন্ মাসে তাদের কাজ থাকে—কোন্ মাসে থাকে না। অথচ যে হাঁত ও হাতিয়ার জমি ফাটিয়ে ফসল ফলায়, সেই হাত যদি কিছুদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যেত, তাহলে সমাজের অবস্থা কি হত তা সহজেই অনুমান করা যায়। এখানে শুধু কৃষকদের কথারই উল্লেখ করা হল। এইরকম আরও জনসম্প্রদায় আছে যারা দৃষ্টির অন্তরালে থেকে দিনের পর দিন সমাজের বিভিন্ন চাহিদার যোগান দিচ্ছে। এদের জীবন-কাহিনী না জানলে শিক্ষার্থীর সমাজচেতনা পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এই কাহিনী জানতে হলে—এর মর্ম্মগভীরে প্রবেশ করে অতিদুর্গত, ভগ্নজানু জনজীবনের অন্তরবেদনার সঙ্গে স্বীয় অভিজ্ঞতাকে সম্পৃক্ত করতে হলে—কেবলমাত্র সাহিত্যপাঠ ও পর্য্যবেক্ষণে চলে না। রবীন্দ্রনাথের 'ওরা কাজ করে', শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' অথবা ডিকেন্সের 'অলিভার টুইষ্ট'ই শিক্ষার্থীর মধ্যে সামাজিক চেতনা বিকাশের শেষ কথা নয়। এর চেয়ে বড় কথা হচ্ছে উৎপাদনমূলক শিল্পকাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। উৎপাদন, উৎপাদনপদ্ধতি এবং যারা উৎপাদন করে তাদের সঙ্গে পরিচয়—ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতার ফলে শৈশব থেকেই শিক্ষার্থিদের এমন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বেড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে যা পরবর্ত্তীকালে সামাজিক সংস্কার ও উন্নতিবিধানের প্রধান উপাদান হতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক শিক্ষাকর্ম্মীর এদিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের শিক্ষাসমস্যা

ত্রিপুরার অভ্যন্তরে অনেক এক-শিক্ষক বিদ্যালয় রয়েছে। দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলে জনবসতি এমন নয় যে সেখানে বহু-শিক্ষকের স্কুল খোলা চলে। আমরা দেখেছি যে প্রতি শ্রেণীতে ৩০ জন হিসাবে একটি নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ১৫০ জন শিক্ষার্থী থাকা দরকার। কিন্তু ত্রিপুরার অভ্যন্তরভাগে পার্ব্বত্য অঞ্চলে এমন অনেক জনবসতি রয়েছে যেখানে বহু-শিক্ষকের স্কুলে পড়বার মত উপযুক্ত ছাত্রসংখ্যা নেই। অথচ এই সব এলাকায় কোন স্কুল একেবারে না থাকলে যে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী রয়েছে তারাও চিরদিনের মত লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে নিরক্ষর থেকে যাবে। বিশেষভাবে এই সব এলাকার জন্য এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও পরিবহণ সমস্যার জন্য ত্রিপুরায় এই ধরণের বিদ্যালয়ের সংখ্যা এত বেশী যে এদের বাদ দিয়ে ত্রিপুরার শিক্ষাব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করাই সম্ভব নয়। সমস্যা হল এই সব বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার প্রশ্ন নিয়ে। একজন লোকের পক্ষে কি একই সময়ে একাধিক ক্লাশে লেখাপড়া করান সম্ভব হতে পারে? কি ধরণের লেখাপড়া এই সব স্কুলে হতে পারে? মাষ্টারমশায় ছুটি নিলে কে স্কুল চালাবে? এসব স্কুল রাখার কোন সার্থকতা কি যথার্থই আছে? শিক্ষকমহলে আলোচনার সময় এই ধরণের প্রশ্ন অনেক সময়ই শোনা যায় এবং আলোচনাকালে যে ধরণের মতামত সাধারণতঃ ব্যক্ত হয়ে থাকে তাতে এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উজ্জ্বল কোন সম্ভাবনা অধিকাংশ সময়ই পরিস্ফুট হয় না। অথচ ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এই সমস্যার ব্যাপকতা অস্বীকারও করা যায় না। কাজেই সমস্যাটির একটু বিশদ আলোচনা এখানে করা হচ্ছে।

ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের স্থান

ভাবতেব শিক্ষাব্যবস্থায এক শিক্ষক স্কুলের কথা কোন নূতন আবিষ্কাব নয। স্মরণাতীত কাল থেকে আমাদেব দেশে এক শিক্ষক স্কুল চলে আসছে। কালবন্দিত প্রাচীন মহর্ষিগণ আশ্রমেব পবিত্র পরিবেশে যে "জ্ঞান ধর্ম্ম কত কাব্যকাহিনী" প্রচাব কবতেন, তাব মধ্যে আধুনিক শিক্ষা সংগঠনেব দশটা-চাবটা ব্যবস্থা অথবা কোন ঘণ্টাপ্রণালী ছিল না। শিক্ষা সেখানে সমগ্র জীবনে পবিব্যাপ্ত হযে ছিল এবং আশ্রমগুরু একাই ছিলেন জ্ঞানানুশীলনেব উৎস। বাড়ীতে পিতা অথবা অভিভাবকস্থানীয় কারো কাছে শিক্ষালাভ কবাব রীতিও আমাদেব দেশে অনেকদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। এই পারিবাবিক শিক্ষাব্যবস্থাব (domestic instruction) ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বংশগত ঐতিহ্যও গড়ে উঠেছিল এবং দেখতে পাওয়া যায় যে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা জীবিত ছিল। উইলিয়ম এ্যাডামের (যিনি ১৮১৮ থেকে ১৮৩৮ সাল পর্য্যন্ত আমাদেব দেশে ছিলেন) বিববণীতে পাওযা যায যে তাব সমযে বাংলা ও বিহারে আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী সংগঠিত 'স্কুলেব' সংখ্যা যেখানে ছিল মাত্র ৩৭৩টি, সেখানেই পাবিবারিক শিক্ষাকেন্দ্র ছিল ১৭৪৭টি। উনবিংশ শতকে বাংলা ও বিহার প্রদেশে প্রচলিত আমাদের দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে যাঁরা আলোচনা কবেছেন, তাঁরা সকলেই এ্যাডামেব অনুসন্ধান-কার্য্যের ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করে থাকেন। দক্ষিণ ভাবতে স্যার টমাস মানবোর (১৭৬১-১৮২৭) শিক্ষাবিষয়ক অনুসন্ধান-কার্য্যেব মূল্যও অনস্বীকার্য্য এবং তাঁব বিবরণীতেও দেখতে পাওযা যায় যে মাদ্রাজে এই এক-শিক্ষক শিক্ষাব্যবস্থা বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। বারাণসী সংস্কৃত-সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্র অনুশীলনের একটি সুবিখ্যাত কেন্দ্র। সপ্তদশ শতাব্দীতে বার্ণিয়ার বাবাণসী সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে

সমগ্র বারাণসীকে একটি বিশ্ববিদ্যালয় বলা চলে—কিন্তু সেখানে কোন তথাকথিত স্কুল অথবা কলেজ নেই। সুপ্রাচীন শিক্ষাধারা অনুযায়ী জ্ঞানবৃদ্ধ মহাপণ্ডিতগণ সহরের সর্ব্বত্রই ছোট ছোট কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়েছিলেন—কারও কাছে পাঁচ-ছয়জন শিক্ষার্থী—কারও কাছে খুব বেশী হলে বার থেকে পনের জন। বললে বোধ হয় ভুল হবে না যে সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত সুপ্রাচীন শিক্ষাধারা আজও বারাণসীতে বর্ত্তমান রয়েছে। অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে যে বোম্বেতেও এক শিক্ষক বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। কোন স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৫, কোন স্কুলে বা ২০, আবার খুব বেশী হলে স্থানবিশেষে হয়তো ৩০ জন ছাত্রও থাকত। উপরের এসব তথ্য থেকে আমরা স্বভাবতঃই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহুকাল ধরে এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ই ছিল দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান ধারক ও বাহক।

এক শিক্ষক বিদ্যালয়গুলোর এরূপ প্রাধান্যলাভ করবার কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ, শিক্ষার্থী-সংখ্যা। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থিদের সঙ্গে কুলশিক্ষকের পরিবারের পুরুষানুক্রমিক সম্বন্ধ। আর একটি মূল্যবান কারণও ছিল। আমাদের দেশের প্রাচীনগণ শিক্ষাকে কখনও একটি যান্ত্রিক অথবা অফিসিয়াল ব্যাপার বলে মনে করতেন না। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যাতে গভীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে সে বিষয়ে তাঁরা বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। ব্যাপকভাবে শিক্ষার্থীর জীবনকে স্পর্শ করে তার সুপ্ত প্রতিভা ও মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করার এই যে মহান ঐতিহ্য—এ থেকে আমরা যে পরিমাণে দূরে সরে যাচ্ছি সেই পরিমাণে শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। আধুনিক কালে খুব অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে লেখাপড়ার বন্দোবস্ত ক্রমশঃই অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল এবং তার স্থলে বৃহত্তর সংখ্যা নিয়ে শ্রেণীসংগঠনের সূত্রপাত হয়েছিল। সর্ব্বাধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান আবার এই ব্যবস্থার কুফল সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নূতন

করে পুনরায় শ্রেণীপাঠনার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও শিক্ষাদান-পদ্ধতির (personal contact and individual attention) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা বিজ্ঞানসম্মত ছিল না বলে অনেক সময়ই আমরা একে হেয় করে থাকি—কিন্তু কেবলমাত্র শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের দিক থেকে বিচার করলে এই শিক্ষাব্যবস্থার সারবত্তা অস্বীকার করা চলে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে একজন শিক্ষক একই সময়ে বিভিন্ন স্তরের একাধিক শিক্ষার্থীকে লেখাপড়া শেখাতেন কি করে? অসুবিধা যে নিশ্চয়ই ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই অসুবিধা দূর করার জন্য প্রাচীন শিক্ষকবৃন্দ এক বিশেষ উপায়ের উদ্ভাবন করেছিলেন। এই পদ্ধতি হচ্ছে মনিটর-পদ্ধতি। যাদের বয়স একটু বেশী, স্কুলে বেশীদিন ধরে আছে এবং লেখাপড়ার বিষয়ে অগ্রসর-তাদের ভেতর থেকেই মনিটর বাছাই করা হত। আর এই সব মনিটরদের সঙ্গেই অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক নবাগত শিক্ষার্থিদের লেখা-পড়ার প্রসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হত। মনিটররা স্বয়ং শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করত। শিক্ষক মহাশয় যখন একদল মনিটরের ক্লাশ নিচ্ছেন, তখন হয়তো একাধিক নিম্নশ্রেণীর ক্লাশের ভার অন্যান্য মনিটরদের উপর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। বোম্বে এডুকেশন সোসাইটি ১৮১৭ সালে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল তাতে উল্লেখ করা হচ্ছে যে এই ব্যবস্থায় 'ক্লাশের' বন্দোবস্ত তেমন ছিল না। একজন মনিটরের সঙ্গে একজন নবাগত শিক্ষার্থীকে বসতে হত এবং মনিটরের কাছ থেকেই তাকে শিক্ষালাভ করতে হত। এতে একই সময়ে শিক্ষক মহাশয়ের উপর প্রত্যক্ষভাবে কোন চাপ আসত না এবং তিনি অবসর সময়ে মনিটরদের কাজের তত্ত্বাবধান করার সুযোগ পেতেন।

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে রেভারেণ্ড এণ্ড্রু বেল

বলে মাদ্রাজের একজন পাদরী সাহেব প্রথম এই মনিটর-পদ্ধতির সন্ধান পান। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে শিক্ষকসংখ্যার স্বল্পতা এবং অর্থনৈতিক সমস্যা যেখানে ব্যাপক শিক্ষাপ্রসারের প্রতিবন্ধকতা করে, সেখানে এই পদ্ধতিটি বিশেষ কার্য্যকরী হবে এবং বিলেতে ফিরে গিয়ে সে দেশেও তিনি আমাদের দেশের এই পদ্ধতিটি প্রচলিত করেন। তখন এই পদ্ধতিটিকে মনিটর-পদ্ধতি অথবা কখনো কখনো মাদ্রাজ পদ্ধতি বলেও অভিহিত করা হত। এই শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে বিশেষ আলোচনার অবকাশ আমাদের এখানে নেই ; এই পদ্ধতির কেবলমাত্র শিক্ষাগত উৎকর্ষ নিয়ে আলোচনা করতে হলে আমাদের প্রসঙ্গান্তরে যেতে হবে। আমরা শুধু এটুকুই এখানে বলতে চাই যে বিশেষ এক ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে এই পদ্ধতির সাহায্যেই আমাদের শিক্ষকবৃন্দ লেখাপড়ার কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতেন এবং এই পদ্ধতির অন্তর্নিহিত সারবত্তার জন্য বিশেষ এক সময়ে আমাদের দেশ থেকে বিলেতেও এই পদ্ধতির প্রবর্ত্তন হয়েছিল। পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান দেশে আজও এক-শিক্ষক বিত্যালয়ের সংখ্যা প্রচুর এবং সে সব দেশে প্রকারভেদে এই পদ্ধতির প্রচলনও বহুল পরিমাণে রয়েছে। কাজেই জাতীয় জীবনের বিশেষ এক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায় এই ব্যবস্থাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করতে পারি না।

এই শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে মতবিরোধ

এক-শিক্ষক বিত্যালয় সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ হয় ১৯২২ সালের পর। ১৯১৭-২২ সাল—এই সময়ের মধ্যে দেশে শিক্ষার উন্নতি কেমন হয়েছে সে প্রসঙ্গে সরকারী পঞ্চবার্ষিকী বিবরণী দেওয়ার সময় সরকারের তরফ থেকে এক-শিক্ষক বিত্যালয় সম্বন্ধে এমন কতগুলো মতামত ব্যক্ত করা হয় যা এক-শিক্ষক বিত্যালয়ের পক্ষে মোটেই অনুকূল ছিল না। এই বিবরণীতে বলা হয়েছিল যে—

১। গ্রামের স্কুলগুলোতে লেখাপড়া ভাল না হওয়ার প্রধান কারণ হল এই যে সেখানে একজন শিক্ষককে একই সময়ে একাধিক ক্লাশ সামলাতে হয়।

২। গ্রামের শিক্ষকবৃন্দ অত্যন্ত দরিদ্র এবং তাদের মধ্যে জীবনী শক্তির অভাব রয়েছে। এদের পক্ষে একা একটি স্কুল চালান খুবই কষ্টকর।

৩। স্কুলে ভর্তি হওয়ার কোন বাঁধাধরা নিয়ম ও সময় নেই। যার যে মাসে ইচ্ছা স্কুলে ভর্তি হতে আসে এবং অনেক সময় এই আসাটা ঠিকুজী বিচারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

তিনটি রিপোর্ট

৪। এই রকম অবস্থায় যথেষ্ট দক্ষ ও কৌশলী শিক্ষককেও যদি এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ে কাজ করতে হয়, তাহলে তিনিও আশাহত না হয়ে পারেন না।

এই বিবরণীর পর দ্বিতীয় আক্রমণ আসে ১৯২৮ সালে। Royal Commission on Agriculture এই আক্রমণ করেছিল এবং এর তীব্রতা নেহাৎ অল্প ছিল না। কমিশন বলেছিল যে—

১। কমপক্ষে দুজন শিক্ষক না থাকলে কোন স্কুলে ভাল লেখাপড়ার কাজ হতে পারে না।

২। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ১০০ জন শিক্ষার্থী থাকা দরকার। কিন্তু একটি এক শিক্ষক বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ ৪০।৪৫ জনের বেশী শিক্ষার্থী থাকে না।

৩। যেসব স্কুলে মাত্র একজন শিক্ষক আছে, সেখানে আরও একজন করে শিক্ষক দেওয়া দরকার। অথবা এক-শিক্ষক বিদ্যালয়গুলোকে শাখা বিদ্যালয়ে (branch school) পরিণত করা দরকার যাতে করে এই সব শাখা-বিদ্যালয় থেকে

একটু বড় হয়ে ছেলেরা কোন বৃহত্তর কেন্দ্রীয় স্কুলে গিয়ে পড়তে পারে।

৪। যতদিন পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী না হচ্ছে, ততদিনও এক-শিক্ষক বিদ্যালয়গুলোকে রাখবার কোন সার্থকতা নেই। অর্থনৈতিক প্রশ্ন ও লেখাপড়ার উৎকর্ষ—যে-কোন দিক থেকেই বিচার করা যাক না কেন—এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের কোন মূল্য নেই এবং অপচয় নিবারণের উদ্দেশ্যে এসব স্কুল একেবারে তুলে দেওয়াই সমীচীন।

এই রিপোর্টের মত মৃত্যুবাণ এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের উপর এর আগে আর কখনও নিক্ষিপ্ত হয় নি। অথচ যারা এই আঘাত হানল তারা একবার বিচার করেও দেখল না যে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুইডেনের মত ভারতবর্ষ থেকে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর দেশেও এক-শিক্ষক বিদ্যালয়গুলোকে জীবিত রাখা হয়েছে এবং এই শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষাগত সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করার মত অবস্থা বিশেষ করে আমাদের দেশে এখনও হয় নি।

এর পর তৃতীয় আঘাত এল ১৯২৯ সালে—এক বছর পরে—হার্টগ কমিটির মারফৎ। হার্টগ কমিটি অবশ্য রয়েল কমিশনের মত আদাজল খেয়ে নামে নি। কিন্তু এদের মতামতও এক-শিক্ষক স্কুলগুলোর বিশেষ অনুকূলে এল না। হার্টগ কমিটি বলেছিল—

১। বিশেষভাবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক পেলে কোন কোন ক্ষেত্রে এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার কাজ চলতে পারে; আর, ভারতবর্ষে এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এত বেশী যে এদের সবগুলোকে বহু-শিক্ষক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়।

২। তবে বিশেষভাবে এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের উপর নির্ভরশীল কোন শিক্ষাব্যবস্থা যে দেশের পক্ষে সামগ্রিকভাবে কল্যাণপ্রসূ

হতে পারে না—রয়েল কমিশনের এই মতের সঙ্গে হার্টগ কমিটিও একমত।

৩। কাজেই বাংলাদেশে, বিহারে ও মাদ্রাজে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার-কল্পে ব্যাপকভাবে এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াবার যে পরিকল্পনা চলছে—কমিটি এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে না।

তিনটি রিপোর্টের অকল্যাণকর পরিণাম

এই তিনটি রিপোর্টের মধ্যে এক-শিক্ষক বিদ্যালয় সম্বন্ধে যে সমাধি-সঙ্গীত রচিত হয়েছিল তার ফল ফলতে বেশী সময় লাগল না। এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের শ্মশানযাত্রার প্রথম ব্যবস্থা হল মাদ্রাজে। এই মাদ্রাজের শিক্ষাবিভাগই ১৯২৩ সালে ঠিক করেছিল যে প্রাথমিক শিক্ষা-সম্প্রসারণের জন্য ব্যাপকভাবে এক-শিক্ষক স্কুল খোলা দরকার এবং কয়েক বছরের মধ্যে এই সংখ্যা বেশ বেড়েও গিয়েছিল। নীচের সংখ্যা থেকে তা বোঝা যাবে—

সাল	স্কুলসংখ্যা
১৯২৪	৮২৫
১৯২৫	২,০৩৮
১৯২৬	১,৫০৮

এই সম্প্রসারণের নীতি ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত পুরোদমে কাজ করে যায়; কিন্তু তার পরে প্রধানতঃ এই সব বিরুদ্ধ রিপোর্টের ফলে অবস্থার পবিবর্ত্তন ঘটে। নীচের সংখ্যা থেকে তা বোঝা যাবে—

সাল	স্কুলসংখ্যা
১৯২৬-২৭	৪৬,৩৮৯
১৯৩৬-৩৭	৪১,১৪১

তার মানে এক-এক বছরে গড়ে প্রায় ৫২৫টি করে স্কুল উঠে গেল।

এখানে কেবলমাত্র মাদ্রাজের কথাই উল্লেখ করা হল। পরিসংখ্যান আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে অন্যান্য প্রদেশেও সমানভাবে এক-শিক্ষক বিদ্যালয়সমূহের নাভিশ্বাস আরম্ভ হয়ে গেছে। এর ফল হল মারাত্মক। প্রসারের পরিবর্ত্তে শিক্ষা সঙ্কুচিত হল। উত্তরপ্রদেশের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। সেখানে ঠিক হয়েছিল যে ৭৫ জন ছেলেমেয়ে না থাকলে কোন স্কুল চলতে পারবে না। ফলে অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমে গেল। দেশের অনেক ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল। এই শিক্ষা-সঙ্কোচের ফলে এমন অবস্থা হয়েছিল্ল যে ১৯৩৬-৩৭ সালে উত্তর-প্রদেশে জনসংখ্যার শতকরা ২১% ভাগের সামনে শিক্ষার কোন সুযোগই ছিল না। আর এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল তারাই—যাদের মধ্যে শিক্ষার প্রয়োজন সব থেকে বেশী—যারা অনগ্রসর, শহর থেকে অনেক দূরে গ্রামে গ্রামান্তরে শতাব্দীসঞ্চিত অন্ধ তিমিরে দিনাতিপাত করছে। সেখানে অনায়াসলভ্য যানবাহন নেই—আধুনিক সভ্যতার আরাম-বিলাসের কোন বন্দোবস্ত নেই—ভারত সেখানে নিদ্রিত। ত্রিপুরার সমস্ত এক-শিক্ষক বিদ্যালয়গুলোকে যদি আজ তুলে দেওয়া হয়, তা হলে আগরতলা উদয়পুর কৈলাসহরের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু ভেবে দেখুন অরণ্যদুহিতার গভীর অভ্যন্তরভাগের কথা। তবু ক্ষীণ আলোকশিখা আজ সেখানে জ্বলছে ; কিন্তু qualityর ধুয়া তুলে এক-শিক্ষক অথবা দুই-শিক্ষক বিদ্যালয়গুলোকে নির্ম্মূল করলে সে শিখাও নির্ব্বাপিত হবে।

এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের উপযোগিতা উপলব্ধি করে একে রক্ষা করবার প্রয়াসী কয়েকজন বিশেষজ্ঞের উল্লেখ আমরা এখানে করতে পারি। যাঁর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় তিনি হচ্ছেন J. A. Richey. ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে তিনি এক সম্মানজনক আসন অধিকার করে আছেন। ১৯২৮ সালে তিনি লিখেছিলেন—আমি

দক্ষিণ আফ্রিকায় অনেক ভাল ভাল এক-শিক্ষক স্কুল দেখেছি। অনেক ভাল স্কুল ভারতেও দেখেছি। আমাদেব সামনে উদাহবণ বয়েছে আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার— যেখানে হাজার হাজার এক-শিক্ষক স্কুল রয়েছে। যাঁরা এই শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলেন তাঁরা অতিরঞ্জিত কবে মতামত প্রকাশ করেন। এঁদের এই মতামতই যদি সত্যি হয়, তাহলে গ্রাম্য ভাবতের শিক্ষার কোন ভবিষ্যৎ নেই। কারণ গভীব অভ্যন্তরে অনগ্রসব ও বসতিবিবল অঞ্চলে এক-শিক্ষক বিদ্যালয় ছাড়া শিক্ষাপ্রচারের আব কোন উপায় নেই।

N. S. Subba Rao ত্রিশ দশকে মহীশূরের শিক্ষা-অধিকর্ত্তা ছিলেন। ইনিও এক-শিক্ষক স্কুলেব সমর্থক ছিলেন। ১৯৩৩-৩৪ সালে এক বিপোর্টে তিনি লিখেছিলেন যে আমেরিকায়ও প্রচুর এক-শিক্ষক স্কুল রয়েছে। জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত ও সম্পদশালী আমেবিকাব মত দেশেও যদি এক-শিক্ষক স্কুল থাকতে পাবে, তাহলে আমাদেব দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এই ধবণেব স্কুল যে আরও অনেকদিন থাকবে একথা বলাই বাহুল্য; আর, এই স্কুলগুলোকে বেখেও সামগ্রিকভাবে আমবা শিক্ষার মানকে কি করে উন্নততর করতে পাবি সেই চিন্তা আমাদের করতে হবে।

বরোদারাজ্যে শিক্ষাসংস্কাবের উদ্দেশ্যে R. Littlehailes যে রিপোর্ট পেশ কবেছিলেন তাতেও এক-শিক্ষক স্কুলের সপক্ষে মতামত প্রকাশ করা হয়েছিল। একটু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল—

......There will always be small villages where the employment of only a single teacher is all that can be economically justified, and wastage in school effort will always be with us, specially when illiteracy is large, so that single teacher schools

will have to remain in parts of Baroda just as they remain in small and out-of-the-way villages in other parts of the world *What is desirable is that where a single-teacher school exists, the teacher should be conscientious in character and trained*

এই প্রসঙ্গে R. V. Parulekarএর মতামতও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিষয়টি নিয়ে গভীর গবেষণা করেছিলেন এবং তাঁর সুচিন্তিত মতামত হচ্ছে এই যে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের স্থান অপরিহার্য। আমাদের সামনে কর্ত্তব্য হচ্ছে এই সব স্কুলগুলোকে—সংহার করা নয—সংগঠন করা।

বর্ত্তমানে অবশ্য এক-শিক্ষক স্কুল থাকবে কি থাকবে না—এমন প্রশ্ন আর কেউ তোলেন না, কারণ ভারতের মত বিশাল দেশে এক-শিক্ষক স্কুলের গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। এই ধরণের স্কুল থাকবেই—সমস্যা হল কি করে এই সব স্কুলের লেখাপড়ার দিকটা ভাল করা যায়। স্কুলগুলোর অস্তিত্বই অনেকদিন পর্য্যন্ত বিপন্ন ছিল। এখন সমস্যাটা এসে গেছে শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির স্তরে; আর এই পদোন্নতি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রগতির পরিচায়ক সন্দেহ নেই।

বিদেশের এক-শিক্ষক স্কুল

এক-শিক্ষক স্কুলের শিক্ষা-সমস্যা কেবলমাত্র আমাদের দেশের নিজস্ব ব্যাপার নয। পৃথিবীর অনেক দেশেই এক শিক্ষকের স্কুল রয়েছে এবং তাদের মধ্যে এমন সব দেশও আছে যারা বৈষয়িক দিক থেকে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক বেশী উন্নত। এই সব দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে আমাদের মূল্যবান প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করতে পারে এবং তাতে নিঃসন্দেহে আমাদের কাজের সুবিধা হবে।

এসব দেশেব মধ্যে আমেরিকাব নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। আমেরিকার মত অগ্রসর দেশেও এক-শিক্ষকের অনেক স্কুল রয়েছে। ব্যাপারটা চমকপ্রদ মনে হলেও আসল কথাটা হচ্ছে এই যে আমেবিকার অভ্যন্তরপ্রদেশে খাস পল্লীঅঞ্চলে অধিকাংশ স্কুলই এক শিক্ষকদ্বারা পরিচালিত। এই সব স্কুলের শিক্ষা নিয়ে সেখানকাব শিক্ষাবিদগণকেও সমস্যায় পড়তে হয়েছে এবং সমস্যার সমাধানেব জন্য সেখানে চূড়ান্ত চেষ্টাও হয়েছে এবং হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, শিক্ষক-শিক্ষণ নূতন করে সংগঠিত হয়েছে এবং এসবের উপব বইও লেখা হয়েছে প্রচুব। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে আমেরিকায়ও একটা সময় ছিল যখন এক-শিক্ষক স্কুলগুলোকে তুলে দিয়ে বড় বড় 'consolidated school' গড়ে তুলবাব পক্ষে মতামত প্রবল হয়েছিল। এই কেন্দ্রীভূত শিক্ষা সংগঠনেব মতবাদ যে এখনও নেই এমন কথা বলা চলে না; কিন্তু এই সত্যটা সেখানেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে হাজাব হাজার এক-শিক্ষক স্কুলকে 'কেন্দ্রীয় স্কুলে' রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়। কাজেই একদিকে যেমন 'consolidated school' গড়ে উঠছে, তেমনি তার সাথে এক-শিক্ষকের স্কুলও রয়েছে। 'কেন্দ্রীয় স্কুল' প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে—আমেরিকার পক্ষে যে ব্যবস্থা সম্ভব তা আমাদের দেশে সম্ভব হতে এখনও অনেক দেরী। কাজেই ভারতের সুবিস্তীর্ণ পল্লীঅঞ্চলে শিক্ষাপ্রসাব করতে হলে এক-শিক্ষক স্কুলের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

আমেরিকা

এক-শিক্ষক স্কুলের সমস্যা দূর করার জন্য আমেরিকার কোন কোন জায়গায় এই মর্ম্মে আইন পাশ করা হয়েছিল যে অষ্টম-শ্রেণীযুক্ত কোন এক-শিক্ষক স্কুল থাকতে পারবে না এবং আট ক্লাশের পরিবর্ত্তে স্কুল কেবলমাত্র চতুর্থ অথবা পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত রাখা চলবে।

ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আট ক্লাশের এক-শিক্ষক স্কুলের প্রশ্ন আসে না, কারণ তেমন স্কুল ত্রিপুরায় নেই। এখানকার অধিকাংশ এক-শিক্ষক স্কুলই চতুর্থ অথবা পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ। অনেকগুলো ক্লাশ থাকলে একজন শিক্ষকের পক্ষে কার্য্য নির্ব্বাহ করা সত্যিই যে খুব কষ্টকর একথা না বললেও চলে। কাজেই আমেরিকায় একদিকে ক্লাশেব সংখ্যা কমাবাব চেষ্টা হয়েছে; আবাব অন্যদিকে আট ক্লাশের বড় বড় কেন্দ্রীয় স্কুল খোলার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টাও কয়েকটি সীমাবদ্ধ সমৃদ্ধ অঞ্চল ছাড়া সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে সাফল্যলাভ করতে পারে নি। সর্ব্বত্র আট ক্লাশের কেন্দ্রীয় স্কুল খুলে এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের লুপ্তিসাধনের পরিকল্পনা শূন্যে সৌধ-নির্ম্মাণের মত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে।

ফলে অন্য উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। এই উপায়েব দ্বারা শ্রেণীসংখ্যা কমিয়ে অর্দ্ধেক করা হয়েছে এবং পাঠক্রমকেও এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজনে নতুন করে সংগঠিত কবা হয়েছে। এই পদ্ধতির নাম 'Combination and Alternation of Grades.' এর ফলে ক্লাশের পরিবর্ত্তে এক-একটি grade অথবা স্তর নিদ্ধারিত হয়েছে। এক-এক স্তরে দুটি করে ক্লাশ রয়েছে। যেমন, ৮ম ও ৭ম শ্রেণী মিলিয়ে ক স্তর, ৬ষ্ঠ ও ৫ম শ্রেণী মিলিয়ে খ স্তর এবং ৪র্থ ও ৩য় শ্রেণী মিলিয়ে গ স্তর। কোন কোন স্থানে ২য় ও ১ম শ্রেণীকে সংযুক্ত করা হয় না; যেখানে করা হয় সেখানে আর একটি স্তর হবে ঘ স্তর। এই ব্যবস্থার ফলে আটটি ক্লাশেব পরিবর্ত্তে আমরা চারটি স্তর পাচ্ছি—ক, খ, গ, ঘ—তার মানে আসলে চারটি ক্লাশ। আব যেহেতু কোন এক-শিক্ষক বিদ্যালয়েই ছাত্রসংখ্যা বেশী থাকে না, তাই যদিও এক-একটি স্তরে দুটি করে 'ক্লাশ' আছে, কিন্তু আসলে মোটের উপর কোন স্তরেই ছাত্রসংখ্যা বেশী থাকার কথা নয়।

এখন, প্রত্যেকটি স্তরে একজন শিক্ষার্থীকে দুই বছর করে পড়তে হবে। আবার পাঠ্যতালিকাও (courses of studies) তৈরী হয় দুই বছরের মত করে। এই পাঠ্যতালিকার মধ্যে আবার পরস্পর-সংযুক্ত আলাদা দুটি ধারা (outline) আছে। এক-একটি ধারা এক-এক বছরে শেষ করা হয়। শিক্ষাগত মানের দিক থেকে এই দুটি ধারার মধ্যে যাতে বিরাট কোন ব্যবধান না থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়।

এর পরে শ্রেণীসংগঠনের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। আবার কয়েকটি বিষয়কে এক করে একটি বিষয়ে পরিণত করার চেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। এই শ্রেণীসংগঠন এবং বিষয়-সংযুক্তি ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং অঞ্চলবিশেষে এই ব্যবস্থার বৈচিত্র্যও এত বেশী যে এই প্রসঙ্গে বিশেষ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। এইটুকু শুধু বলা যায় যে শিক্ষক-শিক্ষণ, পাঠ্য-তালিকা প্রণয়ন, শ্রেণীব্যবস্থা ইত্যাদি দিক থেকে এক-শিক্ষক বিদ্যালয় সম্বন্ধে আমেরিকায় যে প্রচুর শিক্ষণ-সাহিত্য রচিত হয়েছে তা আমাদের অনুধাবন করে দেখা প্রয়োজন। তাহলে আমাদের পথও অনেক খুলে যাবে বলে আশা করা যায়। অবশ্য ভারতের বিশেষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকার কথা সব সময়ই মনে রাখতে হবে।

এক-শিক্ষক বিদ্যালয় প্রসঙ্গে আর একটি দেশের উল্লেখ করাও প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া। অষ্ট্রেলিয়ায়ও আমেরিকার মত সুবিস্তীর্ণ পল্লীঅঞ্চল রয়েছে এবং এসব এলাকার স্কুলগুলো প্রধানতঃ একজন শিক্ষকদ্বারাই পরিচালিত। আমেরিকার মত আবার এখানেও বড় বড় কেন্দ্রীয় স্কুল খোলার সপক্ষে মতামত রয়েছে; কিন্তু এই মতামত মোটেই শক্তিশালী নয়, কারণ অষ্ট্রেলিয়ার অভিভাবকগণ এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় যথেষ্ট আস্থাবান। অষ্ট্রেলিয়ার

বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষা-পরিচালকবর্গের ধারণা এই যে যদি শিক্ষকদের জন্য বিশেষভাবে এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী অনুযায়ী কোন ট্রেনিংএর বন্দোবস্ত করা যায়, তাহলে এসব স্কুলের লেখাপড়া খারাপ মোটেই হতে পারে না—অধিকন্তু বড় বড় ক্লাশের শিক্ষার্থিদের চেয়ে এইসব স্কুলের শিক্ষার্থিদের আত্মনির্ভরশীল ও আত্মবিশ্বাসী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকবে; কারণ শৈশব থেকে এদের অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতার উপর নির্ভর করতে হয়; আর শিক্ষকের পরিচালনাধীনে এরা যেমন এক-দিকে নিজেরা পড়ে তেমনি অন্যদিকে অন্যকে পড়ায়। তাঁরা মনে করেন যে এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের লেখাপড়া খারাপ হওয়ার সর্ব্ব-প্রধান কারণ হল শিক্ষিতসমাজের উপেক্ষা। এই স্কুলগুলোর দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় না—এদের বিশেষ সমস্যাবলীর সমাধানের চেষ্টা করা হয় না—বিশ্ববিদ্যালয়ে, ট্রেনিং কলেজে শিক্ষকদের জন্য বিশেষ কোন ট্রেনিংএর বন্দোবস্ত করা হয় না—বরঞ্চ সর্ব্বোপরি এদের অস্তিত্বকেই লুপ্ত করার চেষ্টা করা হয়। এদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এদের উন্নতিবিধানের জন্য গবেষণামূলক কোন কর্ম্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করলে এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের অবদান-সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠত।

অষ্ট্রেলিয়া

শ্রেণীপাঠনার ক্ষেত্রে অষ্ট্রেলিয়ায় এখনও মনিটর-পদ্ধতি বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। বিষয়টি উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই। আমাদের দেশে মনিটর-পদ্ধতির গঙ্গাপ্রাপ্তি আগেই হয়ে গেছে—কিন্তু আমাদেরই দেশ থেকে বিলেত ঘুরে অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়ে মনিটর-পদ্ধতি সেখানে বেশ বহাল তবিয়তেই আছে এবং আমরা ধরে নিতে পারি ইতিমধ্যে তার শ্রীবৃদ্ধিসাধনও অবশ্যই হয়েছে। অবশ্য এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে কোন কথা যে শোনা যায় না তা নয়—কিন্তু এখনও এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ অষ্ট্রেলিয়ার সর্ব্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়।

একটি বিশেষ অনুসন্ধান-কাজের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। নিউ সাউথ ওয়েল্‌স-এর বিদ্যালয় পরিদর্শক J. M. Braithwaite এবং সিড্‌নীর শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক C. R. McRae—এঁরা দুজনে মিলে মনিটর-পদ্ধতি সম্বন্ধে এক অনুসন্ধান-কার্য্য সম্পাদিত করেছিলেন। তাঁদের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল প্রধানতঃ দুটি—

১। এই পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষক সমাজের মতামত কি?

২। এই পদ্ধতির ফলে শিক্ষার্থিদের উপর ভাল অথবা খারাপ—কিরূপ প্রভাব পড়ে?

অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেল যে নিউ সাউথ ওয়েল্‌স-এ মনিটররা প্রত্যক্ষভাবে শ্রেণীপাঠনার ব্যাপারে যুক্ত থাকে না। তারা সাধারণতঃ বই দেওয়া, স্কুল সাজান, কালি দেওয়া, খেলার বন্দোবস্ত করা ইত্যাদি বিষয়ের ভার পায়। তবে এখানেও ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন শিক্ষক মনিটর-পদ্ধতির ব্যাপক প্রবর্ত্তনের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু ভিক্টোরিয়াতে দল বেঁধে শিক্ষকরা একবাক্যে মনিটর-পদ্ধতি সমর্থন করেছিলেন। স্কুলের কাজ চালাতে গিয়ে মনিটরদের যদিও সময় দিতে হয় এবং এতে এদের সামান্য ক্ষতি হতে পারে কিন্তু তবুও শিক্ষকবৃন্দ মনে করেন যে এই পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষার্থিদেরও এতে কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই, কারণ শৈশব থেকে দায়িত্বপালনের সুযোগ পেয়ে শিক্ষার্থিদের এই ব্যবস্থার ফলে সামগ্রিক বিকাশ-লাভের পথ প্রশস্ত হয়। শিক্ষকবৃন্দের মতামত থেকে যে তিনটি সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই—

১। মনিটরদের সাহায্য ছাড়া এক-শিক্ষক স্কুল চালান সম্পূর্ণ অসম্ভব।

২। এক-শিক্ষক স্কুলের সুচারু সংগঠনব্যবস্থায় মনিটরদের সাহায্য একটি অপরিহার্য্য অবদান।

৩। যে সব স্কুলে অনেকগুলো ক্লাশ রয়েছে সেখানে মনিটরদের ব্যবহার করতেই হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি সম্বন্ধে যে সব মতামত পাওয়া গিয়েছিল তাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভিক্টোরিয়ার শিক্ষকবৃন্দ বলেছিলেন যে মনিটর-পদ্ধতির কাজ যাঁরা ভালভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেছেন তাঁরা কখনও এর সারবত্তা সম্বন্ধে আশ্বস্ত না হয়ে পারেন না। এই পদ্ধতির ফলে ছোট শিশুদের তত্ত্বাবধান করতে কোন অসুবিধা হয় না। বড় ছেলেমেয়েদের দায়িত্ববোধ বাড়ে, একটি শিক্ষাব্যবস্থায় তারাও যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে এ বিষয়ে তারা সচেতন হয়; আর সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে এর ফলে স্কুলে পারস্পরিক সহযোগিতার একটি মধুর সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একটি মতামতের অংশ এখানে উদ্ধৃত হল—

'From the view-point of life service, of being valuable members of a corporate society, the monitorial system lays foundations, as secure as they are essential, on which altruism may safely flourish. From junior to supplementary departments, first as being ministered to and then as ministering the child feels, gropes his way along. He acquires the virtue of obedience, that will later enable him to command, pleasantly, persuasively, productively. He leaves school realising that he has contributed to the process of educating a generation.'

কাজেই যে-কোন দিক থেকেই বিচার করা যাক না কেন, এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় মনিটর-পদ্ধতির উপযোগিতা

অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য মনিটর-নির্ব্বাচন, কর্ম্ম-বণ্টন, ন্যস্ত দায়িত্বের পরিদর্শন ইত্যাদি বিষয়ে সযত্ন অনুসন্ধানের অবকাশ রয়েছে এবং এই প্রণালীবদ্ধ অনুসন্ধানের উপরই এই পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করছে।

সুইডেন হচ্ছে আর একটি দেশ যেখানে এক-শিক্ষক বিদ্যালয় অনেক রয়েছে এবং সেখানে কি নীতিতে কাজ হয় তাও আমাদের জানা দরকার। সুইডেনের জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পল্লী অঞ্চলে বাস করে এবং এর ফলে সেখানেও এক-শিক্ষক বিদ্যালয় না রেখে উপায় নেই। ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষাব পর সুইডেন কাজের সুবিধাব জন্য বর্ত্তমানে স্কুলগুলোকে কয়েকটি দলে ভাগ কবে দিয়েছে। দলগুলো মোটামুটি এই রকমেব—

সুইডেন

১। ক দল—যে স্কুলে প্রত্যেকটি ক্লাশের জন্য মাত্র একজন করে শিক্ষক আছে সেই স্কুল এই দলভুক্ত হবে।

২। খ-১ দল—যেখানে ছয়টি ক্লাশের জন্য মাত্র তিনজন শিক্ষক আছে সেই স্কুল এই দলভুক্ত হবে। এই সব শিক্ষকদের বাসস্থান হয় স্কুলের ভিতরে নতুবা খুব কাছে করতে হবে।

৩। খ-২ দল—এই শ্রেণীর স্কুলে মাত্র একজন শিক্ষক থাকবে। কিন্তু স্কুলে ভর্ত্তির কাজ প্রতি দু বছরে একবার হবে। এর ফলে শিক্ষকের উপর ক্রমবর্দ্ধমান ছাত্রসংখ্যার চাপ পড়বে না।

৪। খ-৩ দল—এই শ্রেণীর স্কুলেও মাত্র একজন শিক্ষক থাকবে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তির কাজ এক বছর পর পর হবে। এর ফলে শিক্ষককে এক বছর পড়াতে হচ্ছে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণীতে; পরের

বছর পড়াতে হচ্ছে দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে। কোন শিক্ষার্থী প্রমোশান না পেলেও এতে শ্রেণী-পাঠনার কোন ব্যাঘাত হয় না।

৫। গ-১ দল—এখানেও একজন শিক্ষক থাকবে। কিন্তু স্কুল সকালে বিকালে ছুবেলায় হবে। ছোট শিশুরা বিকালের স্কুল করবে আর বড়রা সকালের। শ্রেণীকক্ষে স্থান সঙ্কুলানের জন্য এই বন্দোবস্ত করতে হয়।

৬। গ-২ দল—এসব স্কুলেও একজন শিক্ষক থাকবে। কিন্তু প্রত্যেকটি ক্লাশকে সপ্তাহের প্রত্যেক দিন স্কুলে আসতে হবে না। কয়েকটি ক্লাশ হয়তো আসবে সোম, বুধ ও শুক্রবারে; আবার অন্য কয়টি আসবে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবারে।

৭। ঘ-১ দল—এই দলের স্কুলগুলোর লেখাপড়ার বন্দোবস্ত আবার একটু বিচিত্র ধরণের। এই বন্দোবস্তে এমন ঠিক হয় যে ছুটি নির্দ্দিষ্ট ক্লাশ হয়তো বছরের প্রথম ছু মাস নিয়মিত স্কুলে পড়ে গেল। তারপর আবার তারা আসবে বছরের শেষ ছু মাসে। মাঝখানে আর তারা নিয়মিত স্কুলে আসবে না—বাড়ীতেই লেখাপড়া করবে; কেবল প্রতি শনিবারে স্কুলে এসে শিক্ষকের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য নিয়ে যাবে। বাকী অন্য ক্লাশগুলো নিয়মিত স্কুলেই পড়ে যাবে।

সুইডেন যে কত বৈচিত্র্যপূর্ণ বন্দোবস্ত করে এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রচেষ্টাকে সফল করার চেষ্টা করছে উপরের সব পরিকল্পনা

থেকে তা বোঝা যায়। সাফল্য লাভ করতে আমাদের দেশেও যে অনুরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে একথা না বললেও চলে।

এসব দেশ ছাড়া আরও একাধিক দেশে এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের স্কুল রয়েছে এবং এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজীল্যাণ্ড। চীনের ভৌগোলিক অবস্থান এবং জনবসতির অবস্থা দেখে মনে হয় সেখানেও এক-শিক্ষক স্কুল থাকা স্বাভাবিক। তবে চীনের এক-শিক্ষক বিদ্যালয় সম্বন্ধে আমরা কোন মুদ্রিত তথ্য পাই না। ভারতবর্ষে এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের দুর্দ্দশার প্রধান কারণ হল এই যে এখানকার গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই ইংরেজের কাছ থেকে ধার-করা এবং স্বভাবতঃই ইংরেজী কায়দায় সাজান। বিলেতে এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের কোন সমস্যা নেই; কারণ দেশটি ছোট এবং শিল্পসমৃদ্ধ। ফলে সে দেশ থেকে আমদানী-করা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আমরা আর যাই পেয়ে থাকি না কেন—ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশের গ্রাম্য এলাকার শিক্ষাসমস্যা-সমাধানের কোন ইঙ্গিত খুঁজে পাব না। আমাদের পল্লী-শিক্ষার উপেক্ষিত অবস্থার এই বোধ হয় প্রধানতম কারণ। আজ যদি দেশব্যাপী সর্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন আমরা সত্যি সত্যিই করতে চাই তা হলে এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের শিক্ষাসমস্যাকে এড়িয়ে গিয়ে তা করা যাবে না। একটিকে বাদ দিয়ে আর একটি হতে পারে না।

এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের সুশাসন সমস্যা

এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের সুশাসন সমস্যার দুটি দিক আছে—(ক) সাংগঠনিক (খ) শিক্ষাগত।

সাংগঠনিক দিক—সাংগঠনিক সমস্যাবলীর আবার ছয়টি দিক আছে—

১। নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়সংখ্যা।

২। শিক্ষক নিযুক্তি ও বদলি।

৩। শিক্ষকেব ছুটি।

৪। বিশেষ শিক্ষণ ব্যবস্থা।

৫। নূতন ভর্ত্তির উপব বিধিনিষেধ আবোপ।

৬। পরিদর্শন।

নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়সংখ্যা—একটা কথা আমাদেব সর্ব্বদাই মনে বাখতে হবে যে সর্ব্বজনীন শিক্ষাপ্রসাবেব দিনে এক শিক্ষক বিদ্যালয়কে কোন অবস্থাতেই আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ কবা চলে না। ভাল-খাবাপ দুটি দিক থাকলেও যেখানে উপায নেই—বহু-শিক্ষকের স্কুল খোলা চলে না—কেবলমাত্র সেখানেই এই ধবণের স্কুল থাকতে পাবে, কাজেই এই ধবণেব স্কুল-সংখ্যা যত কম থাকে ততই মঙ্গল।

প্রচলিত ধাবণা এই যে এক শিক্ষক বিদ্যালয় সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চলেই বোধ হয় বিশেষভাবে প্রয়োজন। কথাটা আংশিক সত্য। শুধুমাত্র গ্রামাঞ্চল নয, কয়েকটি বিশেষ অবস্থায় সহব অঞ্চলেও এক-শিক্ষক স্কুলেব প্রয়োজন হয়। একটি প্রয়োজন ভাষাগত। যেমন কলকাতার কথা ধবা যেতে পাবে। কলকাতাব আঞ্চলিক ভাষা বাংলা। কিন্তু এই মহানগবীতে হিন্দী, উর্দু, উড়িয়া, অসমীয়া ইত্যাদি একাধিক ভাষাভাষী সম্প্রদায় বয়েছে যাদেব শিক্ষার্থিসংখ্যা এমন নয যে এদেব জন্য বড় বড় স্কুলেব প্রয়োজন যথেষ্ট বয়েছে। কিন্তু নিজেদেব আঞ্চলিক ভাষায় লেখাপড়াব জন্য এদেবও স্কুলেব প্রয়োজন আছে এবং ছোট ছোট এক-শিক্ষক স্কুলই সেই প্রয়োজন মেটাতে পারে। বাঙ্গালীর হয়তো অনুরূপ প্রয়োজন হবে পাটনায়, এলাহাবাদে ও বারাণসীতে। কর্ম্ম ও জীবিকাব সংস্থানের জন্য ভারতের বিভিন্ন

ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের লোক রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এই সব সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র শিক্ষার্থিগোষ্ঠীর জন্য সহর অঞ্চলেও এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন রয়েছে।

আর একটি প্রয়োজন হচ্ছে সহশিক্ষার অভাব। বাড়ীর প্রত্যেকটি ছেলের মত মেয়েদেরও যে স্কুলে পাঠান দরকার এই চেতনা আমাদের খুব বেশীদিন থেকে হয় নি। স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহেরই যেখানে অভাব সেখানে সহশিক্ষার সমস্যা তো আরও জটিল। কাজেই অনেক জায়গা আছে যেখানে কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য ছোট এক-শিক্ষক স্কুলের প্রয়োজন হয়। তবে এই প্রয়োজন সম্পূর্ণ সাময়িক বলেই আমরা আশা করব। দেশ ক্রমশঃই প্রগতির পক্ষে এগিয়ে যাচ্ছে—সংস্কারের ফলে সামাজিক সঙ্কীর্ণতা অবলুপ্ত হচ্ছে এবং আশা করা যায় খুব নিকট ভবিষ্যতে সহশিক্ষার পথে আর কোন বাধা থাকবে না। তখন কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য এক-শিক্ষক স্কুলের প্রয়োজনও আর থাকবে না।

সহর ও সমৃদ্ধ গ্রামাঞ্চলে এক-শিক্ষক বিদ্যালয়

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের অভাবের জন্যও অনেক ক্ষেত্রে এক-শিক্ষকের স্কুল প্রয়োজন হয়। একটি গ্রামের জনসংখ্যা হয়তো এমন যে সেখানে ১০০ ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়তে পারে। তা হলে সেখানে একাধিক শিক্ষকের একটি স্কুল খোলা যায়। কিন্তু কার্য্যতঃ সেখানে হয়তো ৩০।৪০ জন ছেলেমেয়ের বেশী কেউ স্কুলে এল না। ফলে বহু-শিক্ষক স্কুলের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সেখানে একটি এক-শিক্ষক স্কুল খুলতে হল। বাধ্যতামূলক সর্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের পর এ সমস্যাও দূর হবে বলে আমরা আশা করতে পারি।

স্বল্পজনসংখ্যাবিশিষ্ট গ্রামাঞ্চলে—যেখানে ৫০০ লোকের বাসও নেই—সেখানে এক-শিক্ষক বিদ্যালয় না রেখে উপায় নেই। এই

সব এলাকা থেকে ছোট ছোট স্কুল তুলে দিয়ে আমেরিকার অনুকরণে consolidated school অথবা বৃহত্তর কেন্দ্রীয় স্কুল খোলার সুপারিশ হার্টগ কমিটি (Hartog Committee) করেছিল। কমিটি বলেছিল যে কয়েকটি গ্রামের কেন্দ্রস্থলে একটি বড় কেন্দ্রীয় স্কুল থাকবে এবং চারপাশের ছেলেমেয়েরা পায়ে হেঁটে এই বড় স্কুলে পড়তে আসবে। কিন্তু এই পরিকল্পনা মোটেই কার্য্যকরী হয় নি। একমাত্র কারণ—পরিবহণের অসুবিধা। আমেরিকায় এই পরিকল্পনা (আংশিক-ভাবে) সফল হওয়ার কারণ হল এই যে সেখানকার কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় স্কুল খোলার আগে যানবাহনের সুবন্দোবস্ত করার জন্য সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে ছোট শিশুরা গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে পায়ে হেঁটে স্কুলে আসতে পারবে না ; কাজেই যানবাহনের সুবন্দোবস্ত না করে কেন্দ্রীয় স্কুল খোলার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ পরিবহণের কোন বন্দোবস্ত করলেন না—অথচ স্কুল খোলার সুপারিশ করলেন। তবুও পরিকল্পনাটি হয়তো সফল হতে পারত যদি গ্রামাঞ্চলের অভিভাবকবৃন্দ শিক্ষিত হতেন এবং শিক্ষার মূল্য বুঝতেন। কাজেই কোন দিক থেকেই শিশুদের স্কুলে পাঠাবার তাড়া ছিল না। ফলে পরিকল্পনাটি বিফল হয়।

গ্রামাঞ্চলে এক-শিক্ষক বিদ্যালয়

পাঞ্জাব প্রদেশে গৃহীত শাখা-বিদ্যালয় পরিকল্পনার মধ্যে এই বৃহত্তর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের নবতর সংস্করণ দেখতে পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থার ফলে একটি কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বহু-শিক্ষকের একটি বড় কেন্দ্রীয় স্কুল খুলতে হয়। আর তার চারদিকে ছোট ছোট শাখা-বিদ্যালয় ছড়িয়ে থাকে। এই সব শাখা-বিদ্যালয়ে মাত্র প্রথম দুটি শ্রেণী থাকে ; এবং একজন শিক্ষকই এই সব স্কুলে কাজ করেন। এই শাখা-বিদ্যালয়ের প্রথম দুটি শ্রেণীর পড়া শেষ করে

ছাত্রছাত্রীরা তৃতীয় শ্রেণী থেকে কেন্দ্রীয় স্কুলে পড়তে যায়। ধরে নেওয়া হয় এই ব্যবস্থায় কোন অসুবিধা হবে না, কারণ তৃতীয় শ্রেণীতে পড়বার সময় ছেলেমেয়েরা একটু বড় হবে এবং অনায়াসে কেন্দ্রীয় স্কুলে হেঁটে যেতে পারবে। আর শাখা-বিদ্যালয়েরও সুবিধা হল এই যে—যদিও সেখানে একজন শিক্ষককেই কাজ করতে হচ্ছে, কিন্তু কেবলমাত্র প্রথম দুটি শ্রেণী থাকার জন্য তাঁকেও বিশেষ কোন বেগ পেতে হচ্ছে না। এই পরিকল্পনার আর একটি বৈশিষ্ট্যও আছে। শাখা-বিদ্যালয়গুলো কোন স্বয়ং-সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান নয়—এরা কেন্দ্রীয় স্কুলেরই অংশবিশেষ। বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনা বিষয়ে এরা কেন্দ্রীয় স্কুলের শাসনাধীনে থাকে যার ফলে পরিদর্শনের কাজও ভালভাবে চলতে পারে।

কিন্তু এই পরিকল্পনাটিও শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হয় নি এবং ক্ষতিকর বলে পরিত্যক্ত হয়েছে। ক্ষতিকর এইজন্য যে এই ব্যবস্থায় বহুসংখ্যক অসম্পূর্ণ শাখা-স্কুল খুলতে হয়। দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে অনেক সময় ছাত্রছাত্রীরা এই সব স্কুলে প্রথম দুটি বছর পড়ে আর কেন্দ্রীয় স্কুলে পড়তে যায় নি। ফলে আবার যে তিমিরে সেই তিমিরে সবাই ডুবে গেছে। এতে অপচয় হয়েছে অত্যন্ত বেশী।

যেসব এলাকায় জনবসতি ৫০০ জনেরও কম, সেখানে শিক্ষা-প্রচারের সুবন্দোবস্ত করতে হলে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞগণ সাধারণতঃ তিনটি পথের নির্দ্দেশ দিয়ে থাকেন।

১। প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহের জন্য ব্যাপক সার্ভে করা। সুবিস্তৃত সার্ভে করার ফলে বিভিন্ন এলাকার প্রয়োজন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পাওয়া যায় ;

২। কোন্ এলাকায় এক-শিক্ষকের প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলতে হবে তা ঠিক করা ;

৩। আর, কয়েকটি সুনির্ব্বাচিত এলাকায় পাঁচ ক্লাশের কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা। এই বিদ্যালয়ে কমপক্ষে দু'জন শিক্ষক থাকবেন এবং এই স্কুল পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালিত হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে এই স্কুলগুলো চারপাশের গ্রাম থেকে তিন মাইলের বেশী দূরে না হয়। এই পদ্ধতিতে কাজ করলে এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

শিক্ষক নিযুক্তি ও বদলি—বহু-শিক্ষকের স্কুল অপেক্ষা এক-শিক্ষক স্কুলে কাজ করা যে অনেক বেশী দুরূহ ও আয়াসসাধ্য একথা আমরা সকলেই জানি। কাজেই শুধুমাত্র ট্রেনিংপ্রাপ্তই নয়, বিশেষভাবে উপযুক্ত, আদর্শবাদী ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদেরই এই সব স্কুলে পড়ান উচিত। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের দেশে কোথাও এই নীতি অনুসৃত হয় না। এক-শিক্ষক স্কুল সাধারণতঃ অখ্যাত ও দুর্গম অঞ্চলেই বেশী থাকে—এবং সে সব অঞ্চলে আধুনিক সভ্যতার সুযোগ-সুবিধাও অত্যন্ত দুর্লভ। কাজেই অধিকাংশ শিক্ষকই এসব এলাকায় কাজ করতে নিরুৎসাহ বোধ করেন। আর তা ছাড়া, সহর ও সমৃদ্ধ অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রয়োজন পূর্ণ করে এসব এলাকায় পাঠাবার মত উপযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা মোটেই অবশিষ্ট থাকে না। ফলে প্রয়োজন যেখানে সবচেয়ে বেশী সেখানেই অপূর্ণতা থেকে যায়। চাকুরী-জীবনের বিশেষ কোন সময়ে প্রত্যেক শিক্ষককেই অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য এসব এলাকায় এক-শিক্ষক স্কুলে কাজ করতে হবে—এমন কোন নীতি যদি অনুসৃত হয়, তা হলে সমস্যা কিছুটা সহজ হতে পারে। রেলওয়ে বিভাগে এই নিয়মে কাজ হয়। অনেক

সময় দেখতে পাওয়া যায় যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে হয়তো কোন শিক্ষককে এসব এলাকায় পাঠান হয়। এর ফল হয় খুব খারাপ। কারণ দায়িত্ববোধ যেখানে খুব বেশী প্রয়োজন সেখানেই পাঠান হয় অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের। এই ব্যবস্থাটিও বন্ধ করে দেওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষকের ছুটি—এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের ছুটির সমস্যাই হল সবচেয়ে বড় সমস্যা। শিক্ষক মহাশয় ছুটি নিলে স্কুল কে চালাবেন? ছুটি দু'রকমের হতে পারে—(ক) স্বল্প অথবা (খ) দীর্ঘ-মেয়াদী ছুটি। দীর্ঘদিনের ছুটির জন্য অস্থায়ী অন্য কোন লোক শিক্ষকের বদলিতে কাজ করতে পারেন। কিন্তু আকস্মিক ছুটির সময়ে প্রতিকার কি? মনিটর-পদ্ধতি আমাদের দেশ থেকে উঠে গেছে। মনিটর-পদ্ধতি থাকলে আমরা দেখতে পেতাম যে শিক্ষকের আকস্মিক ছুটির সময় স্কুল একেবারে বন্ধ করে দেবার প্রয়োজন হত না। কারণ মনিটররা দায়িত্বগ্রহণ ও শ্রেণীপাঠনায় অভ্যস্ত থাকার ফলে শিক্ষকের অনুপস্থিতিতেও স্কুল চালাতে সমর্থ হত। বিকল্প কোন বন্দোবস্ত না কবা হলে শিক্ষকের আকস্মিক অনুপস্থিতিতে মনিটর-পদ্ধতিই যে কেবল স্কুল চালাতে সক্ষম হতে পারে—একথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

বিকল্প বন্দোবস্তের একটি উদাহরণ বোম্বেতে দেখতে পাওয়া যায়। S. R. Tawde বলে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিদ্যালয়-পরিদর্শক পরীক্ষামূলক একটি পরিকল্পনা চালু করেছিলেন। এই পরিকল্পনায় চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে যতগুলো এক-শিক্ষক বিদ্যালয় আছে সবগুলোকে একটি বড় কেন্দ্রীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষকের শাসনাধীনে আনতে হয়। কোন স্কুলের শিক্ষকই এই কেন্দ্রীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষকের অনুমতি ব্যতীত স্কুলে অনুপস্থিত থাকতে পারবেন না—ছুটি নিতে হলে তাঁর কাছ থেকেই নিতে হবে। আকস্মিক ছুটি হলে প্রধান শিক্ষক কেন্দ্রীয় স্কুল থেকে একজন সহকারী শিক্ষককে

শূন্যস্থান পূরণের জন্য পাঠাতে পারেন, কারণ তাঁর স্কুলটি বড় এবং সেখানে একাধিক শিক্ষক আছেন। আবার দীর্ঘদিনের ছুটি হলে প্রধান শিক্ষক আগে থেকেই বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে একজন অস্থায়ী শিক্ষকের বন্দোবস্ত করতে পারেন। এই অবস্থায় স্কুল বন্ধ হয়ে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। আর শাখা-বিদ্যালয়গুলো কেন্দ্রীয় স্কুলের কাছাকাছি থাকে বলে যোগাযোগ করতেও কোন অসুবিধা হয় না।

এই বন্দোবস্তের আর একটি সুবিধা হল এই যে এতে এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের পরিদর্শনের কাজও ভালভাবে চলতে পারে এবং কেন্দ্রীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষকই এই পরিদর্শনের কাজ করতে পারেন।

বিশেষ শিক্ষণ-ব্যবস্থা—বলা বাহুল্য এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক তৈরী করতে হলে বিশেষ শিক্ষণ-ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমাদের দেশে শিক্ষণ-ব্যবস্থার এই দিকটায় এখনও অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। বিষয়টি নিয়ে এখনও ব্যাপক কোন গবেষণা হয় নি। ফলে এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ে পড়াতে গেলে শিক্ষকবৃন্দ চোখে অন্ধকার দেখেন। বিষয়টি জটিল সন্দেহ নেই এবং জটিল বলেই বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রবীণ বিশেষজ্ঞদের সমস্যাটিকে গ্রহণ করা উচিত। আমাদের সুবিধা হল এই যে আমরা এই বিষয়ে নূতন কিছু করতে যাচ্ছি না। দেশ-বিদেশের অনেক পথিকৃৎ আমাদের সামনে রয়েছেন ; তাঁদের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা, রচনা ও অনুসৃত কর্ম্মসূচী আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে।

এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের সমস্যা সম্পূর্ণভাবে পল্লীঅঞ্চলের সমস্যা ; অথচ আমাদের শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলো প্রায় সবই সহর-অঞ্চলে অবস্থিত। দুটির পটভূমিকাই আলাদা—একটির সঙ্গে আর-একটির নাড়ীর যোগ নেই। বর্ত্তমানে আমাদের দেশের শিক্ষকবৃন্দ ট্রেনিংপর্ব্বে এক-শিক্ষক বিদ্যালয় সম্বন্ধে সামান্য তাত্ত্বিক জ্ঞানলাভ করা ছাড়া

ব্যবহারিকভাবে শ্রেণী-সংগঠন ও কার্য্যসম্পাদনের কোন প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত পান না। আর, যতদিন পর্য্যন্ত ট্রেনিং কলেজ থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পরীক্ষামূলক কোন এক-শিক্ষক বিদ্যালয় খোলা না হচ্ছে, ততদিন এই অসম্পূর্ণতা দূর হবে না। কাজেই আমাদের মনে হয়, প্রয়োজনবোধে বিশেষ সব এলাকায় ট্রেনিং কলেজের শাসনাধীনে পরীক্ষামূলক এক-শিক্ষক বিদ্যালয় খোলা দরকার যেখানে বিশেষজ্ঞদের পরিচালনাধীনে শিক্ষণরত শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণীপাঠনা অভ্যাস করতে পারেন। বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক এই সম্বন্ধে নানাবিধ পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ কবাও বিশেষ প্রয়োজন।

ভর্ত্তির উপর বিধিনিষেধ—এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ে নিম্নশ্রেণীর দিকে ভর্ত্তির ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং ভর্ত্তিব আইন-কানুনও সতর্কভাবে মেনে চলা উচিত। বছরের যে-কোন সময় এলে যদি ভর্ত্তি করে নেওয়া যায় তা হলে একই ক্লাশে যোগ্যতার তারতম্য হিসাবে একাধিক দল-উপদল গড়ে উঠবে এবং সেক্ষেত্রে একাধিক ক্লাশ নিয়ে কর্ম্মব্যস্ত একজন শিক্ষকের পক্ষে আবার একই শ্রেণীর মধ্যে দলীয় প্রয়োজনে পাঠদান করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হবে। কাজেই বছরের একটা নির্দ্দিষ্ট সময়েই ভর্ত্তির কাজ শেষ করা বিধেয় এবং লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে এক-একটি ক্লাশে যোগ্যতার দিক থেকে মোটামুটি একটি সমতা রক্ষিত হয়।

পরিদর্শন—এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের জন্য বিশেষ পরিদর্শনেরও বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান বলে যে খাতা-পত্র, টেবিল-টুলের তদারক করার চেয়ে কর্ম্মরত শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা ও শ্রেষ্ঠতর কর্ম্মপথের সন্ধান দেওয়াই পরিদর্শন-কাজের মুখ্য উদ্দেশ্য। আর এক-শিক্ষক স্কুলের শিক্ষকদের যে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে এ বিষয়ে উপদেশ ও অকুণ্ঠ সহযোগিতার প্রয়োজন খুবই বেশী এতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই পরিদর্শকের এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের

সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলা উচিত। কিন্তু পরিদর্শককে একটি মাত্র স্কুল নিয়ে বসে থাকলে চলে না ; কাজেই প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করা সর্ব্বক্ষেত্রেই যে তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে এমন কোন কথা নেই। এই অবস্থায় আমরা আবার কেন্দ্রীয় স্কুলের উল্লেখ করতে পারি। স্বল্প ব্যবধানের কেন্দ্রীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক অনায়াসে সব সময়ের জন্য তাঁর শাসনাধীন এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যেমন যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে পারবেন, পরিদর্শক হয়তো তাঁর বিস্তৃততর কর্ম্মসীমা নিয়ে তেমনটি পারবেন না। কাজেই সুনির্ব্বাচিত একটি কেন্দ্রীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষকের উপর তাঁর চারপাশের এক-শিক্ষক বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শনভার ন্যস্ত করলে সুফল পাবার আশা আছে।

শিক্ষাগত দিক—শিক্ষাগত দিকেরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা রয়েছে এবং সেগুলো হচ্ছে এই—

১। শ্রেণীসংযুক্তি (combination of grades)
২। যুগ্ম শ্রেণীপাঠনা (plural class-teaching)
৩। মনিটর-পদ্ধতি
৪। সময়সূচীর সমস্যা
৫। সময়ান্তর প্রণালী (shift system)
৬। পাঠক্রম নির্ম্মাণ

শ্রেণীসংযুক্তি—এই পদ্ধতির বহুল প্রচলন আমেরিকায় দেখতে পাওয়া যায়। এই পদ্ধতির ফলে স্কুলে আটটি ক্লাশ থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে পড়াবার সময় অল্পসংখ্যক ক্লাশের বন্দোবস্ত করা চলে। যেমন অষ্টম ও সপ্তম শ্রেণী মিলিয়ে একটি, ষষ্ঠ ও পঞ্চম শ্রেণী মিলিয়ে একটি এবং চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণী মিলিয়ে একটি—আসলে ছয়টি ক্লাশের পরিবর্তে তিনটি স্তরের (grades) বন্দোবস্ত করা চলে। আর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী আলাদা থাকতে পারে। আমাদের দেশে আট

পাঠক্রম নির্ম্মাণ—উপরে আমরা এ পর্য্যন্ত যে আলোচনা করেছি তা থেকে এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে গতানুগতিক বহু-শিক্ষকের স্কুলের জন্য যে পাঠক্রম ও পাঠ্যতালিকা নির্ম্মিত হয়, এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ে সেই পাঠক্রম পুরোপুরি অনুসৃত হতে পারে না। কাজেই এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের জন্য বিশেষভাবে পাঠক্রম নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। শ্রেণীসংযুক্তি অথবা যুগ্ম শ্রেণীপাঠনার নীতি যদি আমরা গ্রহণ করি, তা হলে পাঠ্যতালিকাকেও পুনর্সংগঠিত করা প্রয়োজন। পাঠ্যতালিকার মূল বিষয়বস্তু একই থাকবে; কিন্তু এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজনের আলোকে তার পুনর্বিন্যাস করতে হবে। এই পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞগণই গ্রহণ করতে পারেন এবং স্বভাবতঃই এই দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপর এসে পড়বে।

এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের আরও সমস্যা রয়েছে—যেমন, বাড়ীর কাজ, নীরব পঠন, অভিভাবক-শিক্ষক সম্মেলন, শিক্ষা-পদ্ধতি ইত্যাদি। বিশদভাবে এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার অবকাশ আমাদের এখানে নেই। বহুদিনের অনাদর ও উপেক্ষার ফলে আমাদের পল্লীঅঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থা আশানুরূপ বিকাশলাভ করতে পারে নি। এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের সমস্যাকে বাদ দিয়ে পল্লীঅঞ্চলের শিক্ষা-সমস্যার সমাধান কখনও সম্ভব নয়। এখানে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আংশিক আলোচনা করা হল মাত্র। বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক ও অভিভাবকগণ সকলে মিলে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে মনোনিবেশ করলে অচিরেই পল্লীঅঞ্চলের শিক্ষা-সমস্যার সমাধান হতে পারে। আর এই সমাধান না হলে জনজাগরণের সম্ভাবনা কোথায়?

গ্রন্থ-নির্দ্দেশ

১। অনাথনাথ বসু — আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা

২। অনিলমোহন গুপ্ত — বুনিয়াদী শিক্ষার কথা (প্রথম খণ্ড)

৩। „ — বুনিয়াদী শিক্ষার কথা (দ্বিতীয় খণ্ড)

৪। „ — বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি

৫। „ — বুনিয়াদী শিক্ষায় সংগঠন

৬। ক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ — শিক্ষার ভাবধারা

৭। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার — শিক্ষণ ব্যবহারিকা

৮। প্রতিভা গুপ্ত — সমাজ ও শিশুশিক্ষা

৯। বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য — বুনিয়াদী শিক্ষা

১০। বিজয়কুমার ও সাধনা — বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি

১১। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী — শিক্ষা

১২। মোহিতলাল মজুমদার — বাংলার নবযুগ

১৩। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় — শিক্ষাতত্ত্ব

১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — শিক্ষা

১৫। রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত — শিক্ষা

১৬। হুমায়ুন কবির — শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

১৭। সেনগুপ্ত ও সেনগুপ্ত — আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি

18. Avinashilingam, T. S. — *Understanding Basic Education*

19. Dewey, John ... *Experience and Education*

20. Dewey, John & Evelyn — *Schools of Tomorrow*

21. Fleming, C. M. .. *Cumulative Records*

22. Gandhi, M. K. . *Autobiography*

23. ,, ... *Hind Swaraj*

24. . ... *Cent Percent Swadeshi*

25. ,, ... *Basic Education*

26. Hindusthani Talimi Sangh ... *Educational Reconstruction*

27. Hindusthani Talimi Sangh ... *Basic National Education*

28. " ... *One Step Forward*

29. " *Two Years of Work*

30. " . *Seven Years of Work*

31. " ... *The Story of Twelve Years*

32. " ... *Report of the Sixth All-India Basic Education Conference, 1950*

33. " *Report of the Seventh All-India Basic Education Conference, 1951*

34. International Bureau of Education, UNESCO Geneva *The Teaching of Handicrafts in Secondary Schools*

35. Kabir, Humayun ... *Student Unrest—Causes and Cure*

36. Kripalani, J. B. *The Latest Fad—Basic Education*

37. M. S. Patel *The Educational Philosophy of Mahatma Gandhi*

38. Micheels, W. J. & Karnes, M. R. ... *Measuring Educational Achievement*

39. Ministry of Education Govt. of India .. *Post-War Educational Development in India*

40. " .. *Syllabus for Basic Schools*

41. " ... *The Concept of Basic Education*

42. " ... *Report of the Secondary Education Commission*

43. " ... *Handbook for Teachers of Basic Schools*

44. Ministry of Education
Govt. of India — *Proceedings of the State Education Ministers' Conference (Sept., 1957)*

45. Monroe, Paul — *A Brief Course in the History of Education*

46. Montessori, Maria ... *The Secret of Childhood*

47. Naik, J. P. ... *The Single-Teacher School*

48. Nurullah, Syed &
Naik, J. P. ... *A History of Education in India*

49. Nunn, Sir Percy ... *Education—Its Data and First Principles*

50. Planning Commission
Govt. of India ... *Second Five-Year Plan*

51. Rawat, P. L. ... *History of Indian Education (Ancient and Modern)*

52. Raymont, T. ... *Modern Education—Its Aims and Methods*

53. Ryburn, W. M. — *The Organisation of Schools*

54. Saiyidain, K. G. — *Inaugural Address at the National Conference on Reading in New Delhi in May, 1957*

55. Sitaramayya,
B. Pattabhi ... *Basic Education—The Need of the Day*

56. Wofford, K. V. ... *Modern Education in the Small Rural School*